RABINDRA SAHITYA

MA [Bengali]

Fourth Semester

BNGL - 1001C

[Bengali Edition]

Directorate of Distance Education

TRIPURA UNIVERSITY

Reviewer

Dr. Satyapriya Mukhopadhyaya

Associate Professor, Department of Bengali, Srikrishna College, Bagula, Nadia

Author

Dr. Soma Bhadra Ray, Professor, Department of Bengali, Mahadevananda Mahavidyalaya

Copyright © Reserved, 2017

Books are developed, printed and published on behalf of **Directorate of Distance Education, Tripura University** by Vikas Publishing House Pvt. Ltd.

All rights reserved. No part of this publication which is material, protected by this copyright notice may not be reproduced or transmitted or utilized or stored in any form of by any means now known or hereinafter invented, electronic, digital or mechanical, including photocopying, scanning, recording or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the DDE, Tripura University & Publisher.

Information contained in this book has been published by VIKAS® Publishing House Pvt. Ltd. and has been obtained by its Authors from sources believed to be reliable and are correct to the best of their knowledge. However, the Publisher and its Authors shall in no event be liable for any errors, omissions or damages arising out of use of this information and specifically disclaim any implied warranties or merchantability or fitness for any particular use.

Vikas® is the registered trademark of Vikas® Publishing House Pvt. Ltd.

VIKAS® PUBLISHING HOUSE PVT. LTD.
E-28, Sector-8, Noida - 201301 (UP)
Phone: 0120-4078900 • Fax: 0120-4078999
Regd. Office: 7361, Ravindra Mansion, Ram Nagar, New Delhi – 110 055
• Website: www.vikaspublishing.com • Email: helpline@vikaspublishing.com

সিলেবাস বই - ম্যাপিং টেবিল

সিলেবাস	বই - ম্যাপিং
প্রথম একক	**(পৃষ্ঠা 1-71)**
(ক) কবিতা : বলাকা, পূরবী, মহুয়া, পুনশ্চ, শ্যামলী, প্রান্তিক, নবজাতক	
(খ) কাব্যসঙ্গীত : গীতাঞ্জলী, গীতিমাল্য	
দ্বিতীয় একক	**(পৃষ্ঠা 73 - 109)**
নাটক - রক্তকরবী	
তৃতীয় একক	**(পৃষ্ঠা 111 - 155)**
উপন্যাস - যোগাযোগ	
চতুর্থ একক	**(পৃষ্ঠা 157 - 211)**
ছোটো গল্প : বোষ্টমী, নিশীথে, নষ্টনীড়, স্ত্রীরপত্র, ল্যাবরেটরী, সে, ধ্বংস	

সূচীপত্র

প্রথম একক **(পৃষ্ঠা 1-71)**

(ক)

বলাকা : ৩৯ সংখ্যক কবিতা

পূরবী : তপোভঙ্গ

মহুয়া : সবলা

পুনশ্চ : চিররূপের বাণী

শ্যামলী : হঠাৎ দেখা

প্রান্তিক : নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস

নবজাতক : বুদ্ধভক্তি (যুদ্ধের দামামা)

(খ) কাব্যসঙ্গীত

গীতাঞ্জলী, গীতিমাল্য

কত অজানারে জানাইলে তুমি (৩নং)

জানি জানি কোন আদি কাল হতে (২১ নং)

মেঘের পরে মেঘ জমেছে, আঁধার করে আসে (১৬ নং)

হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে (১০৬ নং)

আকাশে দুই হাতে প্রেম বিলায় ও কে? (১০৮ নং)

দ্বিতীয় একক **(পৃষ্ঠা 73 - 109)**

নাটক : রক্তকরবী

তৃতীয় একক **(পৃষ্ঠা 111 - 155)**

উপন্যাস : যোগাযোগ

টিপ্পনী

টিপ্পনী

চতুর্থ একক (পৃষ্ঠা 157 - 211)

ছোটোগল্প :

বোষ্টমী

নিশীথে

নষ্টনীড়

স্ত্রীর পত্র

সে (৬ নং)

ধ্বংস

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের এক বহুমুখী ও বিচিত্রচারী প্রতিভা। বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় তিনি অপরিহার্য। কবিতা, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ - সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রেই সোনার ফসল ফলিয়েছেন তিনি। তিনি ছিলেন একাধারে শিক্ষাবিদ, চিন্তক, রাষ্ট্রবিদ, সাহিত্য-সমালোচক ও দার্শনিক। রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পান ১৯১৩ সালে। তার পরই আসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তীব্র অভিঘাত। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় জন্ম নেওয়া রবীন্দ্রনাথ পরাধীনতার প্রতি যেমন বিরূপ ছিলেন পাশ্চাত্যের এই আগ্রাসী মনোভাবের কড়া সমালোচক ও ছিলেন। তাঁর বহু রচনায় যুদ্ধবিরোধী মনোভঙ্গিটি জোরালো ভাষায় ফুটে উঠেছে। তিনি মানুষের আত্মমর্যাদা ও সুস্থ জীবনচেতনাকে গুরুত্ব দিয়েছেন সমস্ত লেখায়। বলাকা, পূরবী, মহুয়া, নবজাতক, প্রান্তিক প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ তাঁর অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষরবাহী। রক্তকরবী নাটক এক হীরক খন্ডের মত। আলোর ছটায় তার নানা বিচ্ছুরণ। নাট্যকারের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায় এ নাটকে। রাষ্ট্র ও মানুষের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের জটিল রূপটি এ নাটকে উঠে এসেছে নানা মাত্রিকতায়। 'যোগাযোগ' ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের এক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। ব্যক্তিচরিত্রের 'আঁতের কথা' টেনে আনার যে প্রয়াস 'চোখের বালি'তে শুরু হয়েছিল তা এ আখ্যানেও জারি আছে। মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ও চরিত্রের গূঢ় মানসকূট এ কাহিনির পরতে পরতে। ছোটগল্প রচনায় রবীন্দ্রনাথ অনন্য। তাঁর ছোটগল্পে জীবনের খন্ড ও নিটোল ছবি ফুটেছে। নিশীথে, বোষ্টমী, নষ্টনীড়, স্ত্রীরপত্র, ল্যাবরেটরী প্রভৃতি গল্প পৃথিবীর যে কোন ভাষার ছোটগল্পের সমমর্যাদার দাবিদার।

রবীন্দ্রনাথের নানা কবিতা, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প - এসব বর্ণময় সম্ভারে সজ্জিত এই পাঠক্রম।বাংলা সাহিত্যের স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের উপযোগী এই পাঠক্রম তাদের মনন ও চিন্তাকে সমৃদ্ধ করবে। এই গ্রন্থ ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজন সিদ্ধ করলে আমার পরিশ্রম সার্থক হবে। আশা রাখি এই গ্রন্থ তাদের রবীন্দ্র প্রতিভার নানা দিককে চিনে নিতে সাহায্য করবে। তারা নতুনতর কোন ভাবনার রসদ খুঁজে পাক এই গ্রন্থ থেকে লেখক হিসাবে এটুকুই চাওয়া।

প্রথম একক

(ক) কবিতা

বলাকা : (১৯১৬)

টিপ্পনী

বলাকা প্রকাশিত হয় ১৩২৩ বঙ্গাব্দে । এর কবিতাগুলি দুই বৎসর ধরে লিখিত হয়েছিল। প্রথম চৌত্রিশটি ১৩২১ এ এবং শেষের ১১ টি ১৩২২ এর কার্তিক থেকে বৈশাখের মধ্যে রচিত। এই পয়তাল্লিশটি কবিতার দশটি সমশ্লোকে ও একটি সনেট আকারে লিখিত। বাকি চৌত্রিশটি বিষম শ্লোকে রচিত। এই শ্লোক পদ্ধতি বাংলা সাহিত্যে বলাকার ছন্দ নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে। রচনাকালের দিক থেকে গীতাঞ্জলির পর্বের শেষ কাব্য 'গীতালি' ও বলাকা পর্বের প্রথম কাব্য 'বলাকা' সমসাময়িক কিন্তু এই দুই কাব্যে ভাব ভাষা ও ছন্দগত কতই না পার্থক্য। ভাবের দিক থেকেও ব্যবধান অনেকখানি। বলাকা ছন্দের নূতনত্ব শুধু ছন্দ নিয়ে পরীক্ষার ফল নয়, নতুন প্রাণের জন্য প্রয়োজন হয়েছিল নতুন কলেবরের। কাব্যের আঙ্গিক বদল সব সময়ে হার্দ্য পরবর্তনের তাগিদেই যে ঘটে তা নয় - এমন কি রবীন্দ্রকাব্যেও না। উদাহরণত, পুনশ্চর গদ্যকবিতা ভাবের বিচারে খুব অভিনব নয় । শেষ পর্ব নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রকাব্যের এক নূতন পর্ব, কিন্তু সে নূতনত্বের স্বাক্ষর পরিশেষ এর নিয়মানুগ ছন্দেই সুস্পষ্ট, গদ্য কবিতায় তা নূতনতর হয়ে ওঠে নি। রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় অবশ্য ছিল সুদূরপ্রসারী - "অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেকদূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব এই আমার বিশ্বাস এবং সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলি লিখেছি।" শেষ দশকের কবিতায় কাব্যে অধিকারকে তিনি অনেক দূর প্রসারিত করেছিলেন নিশ্চয়ই, তবে তা ছন্দ ভাঙার অপেক্ষা রাখে নি ।বলাকা কাব্যে কিন্তু নতুন কালের করাঘাতে ছন্দের মুক্তি ও ভাবের উন্মোচন একই সঙ্গে ঘটে।

গীতাঞ্জলিতে কাল আর গীতিধর্ম হারিয়ে এক নিস্তরঙ্গ নিঃশব্দ অকুল সরোবরে পরিণত হয়েছিল। বলাকা তে পশ্চিমী গতিবেগের যৌবনোচিত চাঞ্চল্য দেখা যায় এবং দেখা যায় সাম্প্রতিক কালের বিক্ষোভ। আমরা অবিরাম শব্দ শুনি পাড় ভেঙে চলা স্রোতস্বিনীর। ৮ সংখ্যক কবিতায় কবি স্বয়ং এই উপমা ব্যবহার করেছেন ; নাম কবিতাটিতে কালের উদ্দামতা আরো মনোগ্রাহী চিত্রকল্পে অভিব্যক্ত।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
1

গীতাঞ্জলির কবি ছিলেন সমাজ থেকে বেশ একটু দূরে, আপন পরান সখার সঙ্গে একান্তে আসীন, বা এক তরীতে কুলহারা কিন্তু প্রশান্ত - কানে কানে গান

টিপ্পনী

শোনানো যায় এতটা প্রশান্ত। বলাকা-র কবি সারা পৃথিবীর দুঃখ ও পাপের ভারে নিপীড়িত। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রকাশ্য ধ্বংসলীলা আরম্ভ হবার কিছু পূর্বেই মানবজাতির কোনো অজ্ঞাত মহাবিনাশ আসন্ন জেনে তাঁর মন কীরকম ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। যখন যুদ্ধ বাধল 'মৃত্যুর গর্জন' কবির কানে এসে পৌঁছল, তখন তা শুধু বেদনাদগ্ধই করল না তাঁকে, কর্মে উদ্বুদ্ধ করল। এই কর্মীপুরুষকে আমরা আগের কোনো কোনো কাব্যেও দেখেছি। বিশেষত নৈবেদ্য -এ। কিন্তু এতখানি সমাজসচেতন, অমঙ্গলপীড়িত, দেশ বিদেশের দুঃখ ও পাপ বিষয়ে ভারগ্রস্ত কর্মীপুরুষের অস্তিত্ব ইতিপূর্বে অনুদ্‌ঘাটিত ছিল। গীতাঞ্জলীতে যিনি সহজ মনে বলতে পেরেছিলেন -

কথার পাকে কাজের ঘোরে
তলিয়ে রাখে কে আর মোরে
তাঁর স্মরণের বরণমালা
গাঁথি বসে গোপন কোণে -

বলাকায় এসে তাঁর মনে পড়ল বিধাতা তাঁর উপর কেবল বাঁশি বাজাবার দায়িত্ব অর্পণ করেন নি। অকস্মাৎ যেন ভাবের ঘোর কেটে গেল, মাটির দিকে চেয়ে দেখলেন - তোমার শঙ্খ ধুলায় পড়ে আছে। পূর্ববর্তী ভক্তিপর্বের তদগত আত্মনিমজ্জিত ভাবটিকে লক্ষ করেই বোধ হয় বললেন -

চলেছিলেম পূজার ঘরে
সাজিয়ে ফুলের অর্ঘ্য।
খুঁজি সারাদিনের পরে
কোথায় শান্তি স্বর্গ।
এবার আমার হৃদয়ক্ষত
ভেবেছিলেম হবে গত,
ধুয়ে মলিন চিহ্ন যত
হব নিষ্কলঙ্ক।
পথে দেখি ধুলায় নত
তোমার মহাশঙ্খ।

অতএব শান্তি - স্বর্গ খোঁজা আর হল না, পূজার ঘরে কুলুপ লাগিয়ে বেরিয়ে

আসতে হল আঘাত সংঘাত মুখর জনসমাজে। এই কবিতার গদ্যব্যাখ্যায় বলেছে -

> "সে সময়ে পূজাকেই একমাত্র কর্তব্য বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু অন্তরে একটা দাবী এল, হঠাৎ মনে হল মানুষকে আহ্বান করবার শঙ্খ তো বাজাতে হবে, বিশ্ববিধাতার নামে মানুষকে ছোটো গন্ডি থেকে বড়ো রাস্তায় তো ডাকতে হবে।"

'এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো / বেদনায় যে বান ডেকেছে' কিংবা 'এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে / পরাও রণসজ্জা' যখন রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন (৫ই ও ১২ ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২১) তখন সর্বনাশা মহাযুদ্ধ এসে পৌঁছয় নি, তবে বিপুল সমারোহে ও বিরাট দম্ভে আটঘাট বাঁধা হচ্ছিল ভিয়েনায়, বার্লিনে, পিটার্সবার্গে, প্যারিসে, লন্ডনে; প্রস্তুতিপর্ব প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। যুদ্ধের খবর পেয়ে লিখলেন বলাকার ৫ সংখ্যক কবিতা। লক্ষণীয় যে এত বড় সর্বনাশের খবর পেয়ে যে কথাটা প্রথমে তাঁর মনে এল সেটা এই নয় যে সর্বশক্তিমান মঙ্গলময়ের বিধানে এমন দুঃসহ দুঃখ কোটি কোটি মানুষের সইতে হবে কেন ? মনে এল -

মত্ত সাগর দিল পাড়ি গহন রাত্রিকালে

ঐ যে আমার নেয়ে।

ঝড় বয়েছে, ঝড়ের হাওয়া লাগিয়ে দিয়ে পালে

আসছে তরী বেয়ে।

মহাযুদ্ধের বিভৎসতা কবির চিত্তে নতুন চেতনার উদ্রেক করল, বিশ্ববিধান ও বিধানকর্তা সম্বন্ধে তাঁর এত দিনকার কুসুমাস্তীর্ন বিশ্বাস ভূমি ধীরে ধীরে প্রশ্ন কন্টকিত হয়ে উঠল। তিনি বুঝতে পারলেন পুরানো সত্যের পুঁজি ফুরিয়ে এসেছে, গীতাঞ্জলির বন্দরে এতকাল তাঁর ভাবের তরী অত্যন্ত সুরক্ষিত ছিল সেখান থেকে নোঙর তুলতে হবে। এই বিষশ্বাস -ঝটিকার মাঝখানে তরী বেয়ে চলতে হবে তাঁকে।

বলাকাতে পাশ্চাত্য মনীষী বের্গসঁর চিন্তার প্রভাব অবশ্যই কিছু পড়েছে। বের্গসঁর দার্শনিক চিন্তার প্রভাব বিশ শতকের প্রথমার্ধে শুধু ফরাসী চিন্তাজগতেই নয় সমগ্র বিশ্বেই ছড়িয়ে পড়েছিল।বিজ্ঞানবাদের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ সমালোচনার সাহায্যে সত্যকার দার্শনিক জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । তাঁর সৃজনশীল ক্রমবিবর্তনবাদ (Creative Evolution) বিশ্বব্যাপী জীবনী শক্তির আত্মপ্রকাশের নিম্নতম স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত সৃষ্টির রহস্য উদঘাটনে সচেষ্ট হয়েছে । বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাত্মক চিন্তা পদ্ধতির সঙ্গে দার্শনিক বোধের সম্বন্বয় সাধন করে বের্গসঁ যে অভিনব সৃজনশীল অভিব্যক্তিবাদের দর্শন গড়ে তুলেছিলেন তাতে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

পরিবর্তনকেই একমাত্র সত্য বলে স্বীকার করা হয়েছে।

অর্থাৎ সৃজনশীল ক্রমবিবর্তন পরিণামহীন । রবীন্দ্রনাথ তথা ভারতীয় ভাববাদী দার্শনিকের ধারণার সঙ্গে বের্গসঁর ধারণার এইখানেই পার্থক্য। বিচ্ছিন্নভাবে 'বলাকা'র কোনো কোনো পঙ্‌ক্তি বা দু একটি কবিতার বক্তব্যের সঙ্গে বের্গসঁর সৃজনশীল ক্রমবিবর্তনবাদের মিল লক্ষ্য করা যেতে পারে যেমন, 'অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা', 'আমি যে অজানার যাত্রী' কিংবা 'চঞ্চলা' কবিতা; কিন্তু 'বলাকার' কবিতাগুলি যেহেতু সমষ্টিগত তাৎপর্য নিয়েই আমাদের কাছে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে এবং রবীন্দ্র প্রতিভার মহত্ত্ব সেহেতু তার সমগ্রতায়, বিক্ষিপ্ত রচনা কি স্মরণীয় পঙক্তিতে তার যথার্থ পরিচয় নয়, তাই 'বলাকার' কবিতাগুলি সমগ্রভাবে বিচার করলে কবি স্বভাবের সে বৈশিষ্ট্য - জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কবির ধারণা - ঐকান্তিক বোধ ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের কথা আমাদের সহজেই মনে উদিত হবে, তার সঙ্গে বের্গসঁর অকারণ অবারণ এবং পরিণামহীন চলার পার্থক্যটি দৃষ্টি এড়াবে না। ভারতীয় দর্শনেও গতির কথা আছে কিন্তু স্থিতিকে কেন্দ্র করেই তার যাত্রা এবং স্থিতির অভিমুখেই তার চলা।

বলাকা (৩৯ সংখ্যক) কাব্য -

যেদিন উদিলে তুমি, বিশ্বকবি দুরসিন্ধুপারে
ইংলন্ডের দিকপ্রান্ত পেয়েছিল সেদিন তোমারে
আপন বক্ষের কাছে, ভেবেছিলে বুঝি তারি তুমি
কেবল আপন ধন, উজ্জ্বল ললাট তব চুমি
রেখেছিল কিছুকাল অরণ্যশাখার বাহুজালে,
ঢেকেছিল কিছুকাল কুয়াশা অঞ্চল অন্তরালে
বনপুষ্প বিকশিত তৃণঘন শিশির উজ্জ্বল
পরীদের খেলার প্রাঙ্গণে। দ্বীপের নিকুঞ্জতলে
তখনো ওঠে নি জেগে কবি সূর্য বন্দনাসঙ্গীতে
তারপরে ধীরে ধীরে অনন্তের নিঃশব্দ ইঙ্গিতে
দিগন্তের কোলছাড়ি শতাব্দীর প্রহরে প্রহরে
উঠিয়াছে দীপ্তজ্যোতি মধ্যাহ্নের গগনের পরে

নিয়েছ আসন তব সকল দিকের কেন্দ্র দেশে

বিশ্বচিত্ত উদ্ভাসিয়া।

এই কবিতাটি একটি ষোড়শপদী শ্রদ্ধার্ঘমূলক আনুষ্ঠানিক কবিতা। হয়ত বা বলাকা কাব্যে একটু খাপছাড়া ভাবেই যুক্ত হয়েছে তবু এটি উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে শেক্সপীয়রের প্রতি সম্মান দেখানে হয়েছে এই কবিতায়।

শেক্সপীয়রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় কিশোর বয়সে তাতে প্রেরণার চেয়ে তাড়না ছিল বেশি - গৃহশিক্ষকের তাড়নায় 'ম্যাকবেথ' নাটকের অনুবাদ আরম্ভ করেন। ভাষাশিক্ষার এই সাবেক পদ্ধতিতে শেক্সপীয়র নিজেই ল্যাটিন ভাষা শিখেছিলেন, যেণ শিখেছিলেন সে যুগের আর সবাই - অনুবাদ, পুনরানুবাদ, ভাবসম্প্রসারণ, অনুকরণ, অনুসরন। এই অনুবাদ নিছক ইংরেজি থেকে বাংলা নয়, বাংলা ছন্দে অনুবাদ। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ১২ বা আরো কম - কাজেই শেক্সপীয়র ভাল লাগার কথা নয়। তা সত্ত্বেও দেখা যায় ১৮৮০ সালে নাটকটির অনুবাদের কিয়দংশ ছাপানো হয়েছে।

পূর্ণেন্দু পত্রী তাঁর ছোট কিন্তু তথ্যসমৃদ্ধ বই 'রবীন্দ্রনাথের শেক্সপীয়র' এ বলেছেন যে - "রবীন্দ্রনাথ যখন বয়েসে বালক, তখনই বাংলা সাহিত্য শেক্সপীয়রে আচ্ছন্ন।" বাংলা নাটক ও শেক্সপীয়রের নাট্যের অনুবাদ সমান তালে চলছিল। রবীন্দ্রনাথ যে এই প্রভাব থেকে আদপেই মুক্ত থাকতে পারে না, সে কথাই পূর্ণেন্দু পত্রী বলেন। শুধু তাই নয় একথাও বলেন যে, 'রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনায় শেক্সপীয়রের উল্লেখ অজস্র ও অবারিত।" এই মন্তব্যের সমর্থনে লেখক অনেক উদাহরন দিয়েছেন।

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রশান্ত পাল বলেন "ম্যাকবেথ নাটকের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় রচিত রবীন্দ্রনাথের অভিলাষ কবিতাটি (প্রথম প্রকাশ : 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ৮ম কল্প, ৪র্থ ভাগ : ৩৭৫ সংখ্যা)" উচ্চাভিলাষ কেমন করে মানব চিত্তবৃত্তির সামঞ্জস্য নষ্ট করে দিয়ে তাকে বিষাদময় পরিণতির পথে টেনে নিয়ে যায় - ম্যাকবেথ নাটকের এই ভাববস্তু অবলম্বণ করে একটি গীতিকবিতা রচনায় তিনি প্রবৃত্ত হয়েছেন। অভিলাষ কবিতার ২৪, ২৫, ২৬ ও ৩১ সংখ্যক স্তবক পরপর পাঠ করলে ম্যাকবেথ নাটকের কথা ও ভাববস্তু সংক্ষিপ্ত আকারে আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে ধরা দেয়।" তবে একথাও ঠিক যে নাটকের ভাববস্তু গীতিকবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় কিনা সেকথা তর্কসাপেক্ষ। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে এইরূপ চেষ্টা পরিত্যাগ করেন। তবে শেক্সপীয়রের ঋণ অবচেতনে ছিল একথা অস্বীকার করা যায় না।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

আলোচ্য কবিতায় রবীন্দ্রনাথ শেক্সপীয়রের প্রতি সম্মান দেখিয়েছেন -

"তাই হেরো যুগান্তের শেষে

ভারত সমুদ্রতীরে কম্পমান শাখাপুঞ্জে আজি

নারিকেল কুঞ্জবনে জয়ধ্বনি উঠিতেছে বাজি।"

রবীন্দ্রনাথ হয়তো বলতে চাইছেন এই ক্রান্তীয় ব-দ্বীপে এভন নদীর চারণ কবির স্বীকৃতি মিলেছে বিপরীতে সংস্কৃতির দেয়াল ভেঙে। কবিতাটিতে প্রশস্তি করা হয়েছে - সেদিক থেকে এটি একটি প্রশস্তি কাব্য। এখানে লক্ষনীয় 'বিশ্বকবি' অভিধা, যা তাঁর নিজের নামের আগেই কৃতজ্ঞ দেশবাসী বসাবে। শেক্সপীয়রকে 'বিশ্বকবি' বলার উদ্দেশ্য এই যে তিনি শুধু ইংলন্ডের নয় সারা বিশ্বের কবি -

নিয়েছ আসন তব সকল দিকে কেন্দ্র দেশে / বিশ্বচিত্ত উদ্ভাসিয়া।

এই কথাগুলির মধ্যে বেন জনসনেরবিখ্যত শ্রদ্ধার্ঘ্যের প্রতিধ্বনি শোনা যায় - He was not of an age, but for all time," ইংরাজি পাঠাভ্যাস কালে রবীন্দ্রাথ জনসনের এই বিখ্যাত প্রশস্তির কথা শেনেননি এটা হতে পারে না। বস্তুত নন্দনতত্ত্বে শেক্সপীয়রের প্রতিভাকে শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিতে তিনি কার্পণ্য করেন নি।

বলাকার এই ৩৯ সংখ্যক কবিতাটি সবুজপত্র পত্রিকায় পৌষ ১৩২২ এ প্রকাশিত হয়েছিল। শেক্সপীয়রের মৃত্যুর তিনশততম স্মৃতিবার্ষিক উপলক্ষে রচিত হয় এবং কবিকৃত ইংরেজি অনুবাদ সহ প্রকাশিত হয় - A book of tomage Shakespeare, 1916 গ্রন্থে (পৃ ৩২০-২০) প্রকাশিত হয়। কবির ইংরেজি কোনো কবিতাগ্রন্থে এটা সংকলিত হয় নি। অনুবাদটি নিম্নরূপ -

When by the far away sea your fiery disk appeared from behind te unseen. O poet, O sun. England's horizon felt you near her breast and took you to be her own.

She kissed your forehead, caught you in the arms of her forest branches, hid you behind her mist mantle and watched you in the green sward where fairies love to play among meadow flowers.

A few carly birds sang your hymn of praise while the rest of the woodland choir were asleep .

Then at the slient beckoning of the Eternal you rose higher

and highen till you reached the mid sky, making all questers of heaven your own.

Therefore, at this moment, after the end of centauries the plam groves by the Indian sea raise their tremulous branches to the sky murmuring your praise.

টিপ্পনী

পূরবী (১৯২৫) :

'বলাকা'র পর 'পূরবী'ই রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য গীতিকাব্য। এই কাব্যের কবিকৃত বিস্তারিত একটা পটভূমিকা পাওয়া যায় 'পূরবী'র 'পথিক' অংশের সমকালীন রচনা 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়রি'তে। 'পূরবী'র বেশিরভাগ কবিতাই পথিক কবির দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রাকালে; দক্ষিণ আমেরিকায় ও সেখান থেকে ফেরার পথে লেখা। জাহাজে কবির হাতে সুদীর্ঘ অবসর তাই কবিমন অবাধে কাব্যসৃষ্টি করেছে এবং সেই কাব্যের ভাষা রচনা করে ডায়েরীর পাতা ভরিয়েছে।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ২৬ শে সেপ্টেম্বর 'সাবিত্রী' কবিতাটি রচিত' ঐ দিনটার ডায়েরির পাতায় লেখা আছে -

> "সূর্যের আলোর ধারা তো আমাদের নাড়ীতে নাড়ীতে বইছে। আমাদের প্রাণমন, আমাদের রূপরস, সবই উৎসরূপ রয়েছে ওই মহাজ্যোতিষ্কের মধ্যে। সৌরজগতের সমস্ত ভাবীকাল একদিন তো পরিকীর্ণ হয়েছিল ওরই বহ্নিবাষ্পের মধ্যে। আমার দেহের কোষে কোষে ওই তেজই তো শরীরী, আমার ভাবনার তরঙ্গেতরঙ্গে ওই আলোই প্রবহমান।
>
> আমাদের কবি প্রার্থনা করেছেন : 'তমসো মা জ্যোতির্গময়' অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে নিয়ে যাও। ... তাঁদের ধ্যানমন্ত্রে সূর্যকে তারা বলেছেন ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ' আমাদের চিত্তে তিনি ধী শক্তির ধারাগুলি প্রেরণ করেছেন। ঈশোপনিষদে বলেছেন, 'হে পূষণ, তোমার ঢাকা খুলে ফেলো, সত্যের মুখ দেখি; আমাদের মধ্যে যিনি সেই পুরুষ তোমার মধ্যে।"

বাংলার অন্ধকার সূর্যের আলোকবঞ্চিত কবির চিত্তে যে ছায়াচ্ছন্ন বিষাদ বিরাজিত ছিল, তা ভারতীয় ঋষিকবিদের ব্যাকুলতারই অনুরূপ। সাবিত্রী কবিতার জন্মলগ্নে কবিচিত্তের ঐ আকূতিই কবির দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দিয়েছে। কবি উপলব্ধি করেছেন আবিলতামুক্ত আত্মার সত্যস্বরূপটি আবিষ্কার করাই মানুষের ধর্ম।

টিপ্পনী

জগৎ প্রসবিতা সবিতার সঙ্গে কবি আপনার অন্তরের নিগূঢ় যোগসুত্রটি খুঁজে পেয়েছেন। তিনি বুঝেছেন সূর্যের মধ্যে যে গুহাতীত সত্য কবির নিজের মধ্যেও সেই সত্যই লুকিয়ে আছে।

পূরবী কাব্য রবীন্দ্রনাথের সমস্ত প্রেমকাব্য বিরহের শূন্যতা মন্থনজাত স্বপ্নের ভুবন - সমালোচকের এমন্তব্য সম্পূর্ণ সত্য। আর এই ভুবনে যার সঙ্গে কবির ভাব সম্মেলনের নিত্যলীলা চলছে তিনি কবিশ্রেয়সী তাঁর রসলীলা সহচরী - তাঁর মানসসুন্দরী। ইনিই বিচিত্রবেশে কবিকে বার বার দেখা দিয়েছেন - কবির কাব্যপ্রেরণা যখনই স্থিথিত হবার উপক্রম করেছে তখনই তিনি সৃষ্টির আদি উৎস সূর্যের মধ্যবর্তিনী জ্যোতি সমুদ্রের সঙ্গে কবিপ্রাণকে যুক্ত করে দিয়ে তাকে নবতর সৃষ্টিকর্মে উদ্বুদ্ধ করেছেন - 'চিত্রা' পর্বে এঁকেই আমরা জীবনদেবতা বলেছি - কবির অরূপ উপলব্ধির বিস্তৃত অধ্যায়ে 'গীতাঞ্জলি' পর্বে কবিকে বিশ্বদেবতার চরণ প্রান্তে উপস্থিত করে দিয়ে ইনি কিছুকাল তাঁরই আড়ালে ছিলেন। 'বলাকা' পর্বে পৌষের পাতাঝরা তপোবনে' যৌবনের প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কবি তাপসের 'তপোভঙ্গ' হল - কবির সাথে কবি উমা তাঁর পূর্ব জীবনের লীলাসহচরীর পুনর্মিলন ঘটাল।

পূরবীর মধ্যে গ্রথিত'তপোভঙ্গ' কবিতাটি বিশ্বের সৃষ্টি ও ধ্বংসের, ব্যক্তির সুখ ও দুঃখের অন্তরালবর্তী আনন্দময় একের লীলা উপলব্ধি বিষয়ক। 'পাগল' প্রবন্ধে, গীতাঞ্জলী - গীতিমাল্যে, ফাল্গুনী ও বসন্ত ঋতুনাট্যে কবিপূর্বেই এই লীলা রহস্য বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছেন। 'পূর্ণ থেকে রিক্ত এবং রিক্তের থেকে পূর্ণ এরই মধ্যে ওর আনাগোনা। বাঁধন পরা, বাঁধন খোলা এও যেমন এক খেলা, ও ও তেমনি এক খেলা।' বস্তুত এ ধারণা বৈজ্ঞানিক সত্যের সহায়তায় পাওয়া কবির অরূপানুভূতির সঙ্গে যুক্ত মৌলিক ধারণা এবং উৎসর্গ - গীতাঞ্জলি থেকে নানাভাবে এই ধারণাটিই সর্বত্র প্রকাশিত হয়েছে। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, ঠিক এর পরেই কবি যে নটরাজের চিত্র কল্পনা করেছেন এই কবিতাটিতে তার সূচনা রয়েছে। কবিতাটি রূপে ও রসে বস্তুত ফাল্গুনী ও নটরাজ ঋতুরঙ্গ পর্যায়ের। কিন্তু যেহেতু এই গীতরসহীন অক্ষর মাত্রিক ছন্দের কবিতাটিতে কেবল নটরাজের লীলার উপলব্ধিই বর্ণিত হয়নি, কবির আত্মবিবৃতি ও বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে, সেইজন্যই সম্ভবত এটিকে পূরবী কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কবিতাটির প্রারম্ভে কবি ব্যক্তিগত বিষাদের প্রশ্নই তুললেন -

যৌবনবেদনারসে উচ্ছল আমার দিনগুলি,
হে কালের অধীশ্বর, অন্যমনে গিয়েছ কি ভুলি,
হে ভোলা সন্ন্যাসী ?

কিন্তু সুখ ও দুঃখ এই আপাতদৃশ্য বিরোধের মধ্যে ঐক্যরূপ সত্যে প্রতিষ্ঠিত কবি দুঃখেদর চিরস্থায়ীত্বে অবিশ্বাস করলেন -

নহে নহে, আছে তারা; নিয়েছ তাদের সংহরিয়া

নিগূঢ় ধ্যানের রাত্রে, নিঃশব্দের মাঝে সম্বরিয়া

রাখ সংগোপনে।

এ হল মহেশ্বর তপস্যার রূপ। নটরাজের বামপদক্ষেপের নৃত্য। এখন তিনি যোগী, রুদ্র, ভয়ঙ্কর। বহিঃপ্রকৃতির শীতাতপের শুষ্কতা, ধূসরতা, দাহ, বজ্রপাত, প্লাবন এবং মানবসমাজের ক্ষতি, মৃত্যু, দুর্ভিক্ষ, বিচ্ছেদ সমাজ বিপ্লব প্রভৃতি হল তার প্রকাশের বিশ্বগত মূর্তি। অন্যদিকে থেকে দেখলে বসন্ত, শ্যামলিমা, সৌন্দর্য, মিলন, প্রেম, কল্যান ও তাঁর আর এক মূর্তি। নটরাজ এর মতই ধ্বংস ও সৃষ্টি, মৃত্যু ও জীবনকে তিনি নৃত্যচ্ছন্দে আবর্তিত করছেন। সৃষ্টির মধ্যে অভিব্যক্ত এই দুই রূপের মাধ্যমে একক সত্তার উপলব্ধি কবির স্বকীয়, তা সব সময়েই কাব্যিক, এবং অন্যকর্তৃক অপ্রভাবিত। এইখানেই রবীন্দ্র কবিমানসের অপূর্বতা, তাঁর কল্পনাশক্তি ও প্রতিভার অনন্য দান। স্বত - উপলব্ধ এই রসতত্ত্বটি 'উৎসর্গ' এর সময় থেকে আরম্ভ করে কী করে জীবনবোধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁর একটি সত্য উপলব্ধিতে পরিণত হয়েছে তা বিস্ময়ের সঙ্গেই লক্ষ্য করবার বিষয়। এখানে কবি আর মাত্র রোমান্টিক ভাববিলাসী নন, উচ্চতম স্বপ্নদ্রসষ্টা ভারতীয় ভাব রসিকদের সঙ্গে একাত্ম। পার্থক্য বোধ হয় এই যে, কবি তুরীয়তা ও বৈরাগ্যের পথবর্তী নন, অভিব্যক্তি ধারায় প্রকাশিত মায়াসর্বস্ব। কবি তার স্বপ্নের সত্যতা সম্পর্কে কতদূর নিঃসংশয় তা নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় -

জানি, জানি, এ তপস্যা দীর্ঘরাত্রি করিছে সন্ধান

চঞ্চলের নৃত্যস্রোতে আপন উন্মত্ত অবসান

দুরন্ত উল্লাসে

কবি এই মিথ্যা দুঃখমূর্ত্তির মধ্যেকার ছলনা ধরে ফেলেছেন। কবি তাই বলেছেন -

হে শুষ্ক বল্কলধারী বৈরাগী, ছলনা জানি সব

সুন্দরের হাতে চাও আনন্দে একান্ত পরাভব

ছদ্মরণবেশে।

বারে বারে পঞ্চশরে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

অগ্নিতেজে দগ্ধ করে

দ্বিগুণ উজ্জ্বল করি বারে বারে বাঁচাইবে শেষে।

সত্য উপলব্ধি সম্পর্কে কবির এই সন্দেহাতীত মানসিক অবস্থার পরিচয় এখানে সর্বত্রই পাওয়া যায়। সন্দেহাতীত এই কারণে যে আধুনিক নভোবিজ্ঞান জন্মমৃত্যুর দ্বৈত সত্যের বিশ্বাস্য পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু ছলনা কেন ? কেন মানুষের এই দুঃখভোগ ? তার উত্তরে কবি বলছেন লীলা। বলছেন লীলারসের নিবিড় উপলব্ধিতে মুক্তির আনন্দলাভ করার জন্যই এই আয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণ হয়ত বলতেন, নইলে রসের পোস্টাই হয় না যে।' স্বরূপে বিভিন্ন ; তবু কথা হয়ত একই। নিসর্গের মধ্যবর্তী এই লীলার কোন্ দিক কবির শেষ আস্বাদন ও ধারনের যোগ্য হবে ? বাইরের আপাত দুঃখের মূর্তি অথবা সুখের চঞ্চলতা। অথবা এ দুয়ের অতীত অন্তরের আনন্দময় সত্য-স্বরূপ ? কবি বলেছেন -

তপোভঙ্গ দূত আমি মহেন্দ্রের, হে রুদ্র সন্ন্যাসী -

স্বর্গের চক্রান্ত আমি। আমি কবি যুগে যুগে আসি

তব তপোবনে।

কবি যে এঁকে অন্তরে অনুধাবন করেছেন তাই এমন ভাষায় বলতে পারেন -

ভগ্ন তপস্যার পরে মিলনের বিচিত্র সে ছবি

দেখি আমি যুগে যুগে, বীণাতন্ত্রে বাজাই ভৈরবী -

আমি সেই কবি।"

তাই কবি তাঁর রসবোধের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রুদ্র সুন্দররূপ সত্তার উপাসক।

কবি এই সত্য দর্শনকে বাঙ্ময় করতে গিয়ে যে ভঙ্গির আশ্রয় করেছেন তাও অসামান্য এবং তাঁর পরিণত প্রতিভার উপযুক্তই হয়েছে। অক্ষরমাত্রিক ছন্দে দীর্ঘ পর্বের আশ্রয়ে ভাবোপযোগী ধ্বনিময় বিদ্যুৎবহ্নিবিকাশ পর্যন্ত সমান দক্ষতার সঙ্গে কবি ফুটিয়ে তুলেছেন। শব্দার্থের এই অদ্ভুত মিলন কাব্যে ক্বচিৎ দেখা যায়। কবিতাটিতে কবির বিশিষ্ট উপলব্ধিকে প্রকাশ করার ক্ষমতা দিয়েছে উমা-মহেশ্বরের রূপচিত্র, যা কুমারসম্ভব কাব্য থেকে কবি আহরণ করেছেন এবং এর রূপকে আবেষ্ঠন করে আছে সংস্কৃতের মাধুর্য ও গাম্ভীর্যময় বাগভঙ্গি - 'ন খরো ন চ ভূয়সা মৃদ্যঃ'।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
10

রবীন্দ্রকাব্যের নানান ক্ষেত্রে রূপসৃষ্টিতে, বিশেষত বাণীরূপে সংস্কৃতের ঐতিহ্য বহন একটি লক্ষনীয় ঘটনা। এই প্রভাবের বিষয়ে 'সমগ্র গুণগুম্ভিতা' বৈদর্ভী রীতির নিয়ন্তা কালিদাসও আছেন, কোমলকান্ত - বানী - বিলাসী জয়দেবও আছেন।

এদের সঙ্গে একটি তৃতীয় শক্তি - বাংলা লোকসংগীতের চাতুর্যহীন প্রসাদগুণসম্পন্ন ভাষা মিলিত হয়ে তবেই রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় স্টাইলের সৃষ্টি করেছে। বিষয় ও উপলব্ধি অনুসারে উপরিউক্ত ভাষাভঙ্গিগুলির প্রকাশের অল্পবিস্তর তারতম্য এবং একতরের প্রাধান্য ঘটেছে মাত্র। অবশ্য তৎসমশব্দ এবং অনুপ্রাসযুক্ত শব্দ ব্যবহারের অর্থ এই নয় যে তিনি বাঙলা ভাষায় বিশিষ্ট রীতি (বাক্য - বাক্যাংশ - পদবিন্যাস) বাদ দিয়ে সংস্কৃত বাকরীতিই গ্রহণ করেছেন। বাংলা রীতির স্বকীয়তা রক্ষণ এবং এর শক্তিকে আশ্চর্য রূপে বাড়িয়ে তোলা রবীন্দ্রনাথেরই সুমহৎ কীর্তি।

টিপ্পনী

তপোভঙ্গ :

পূরবী কাব্যের 'তপোভঙ্গ' কবিতায় কালিদাসের কুমারসম্ভবের মর্মবানী চিত্রাঙ্কিত। 'কল্পনা' কাব্যের 'বৈশাখ' কবিতার পরিপরক এই রচনাটিতে রবীন্দ্রনাথের বাণীশিল্পের এক বর্ণাঢ্য সমুজ্জল প্রকাশ। আসলে পঞ্চশরের সঙ্গে কবিরও সহযোগিতা ছিল বলেই পরিণামে সুন্দরের জয় হয়েছিল। এ ব্যাপার সংসারে বারবার ঘটছে -

বারে বারে তারি তূণ সম্মোহনে ভরি দিব বলে
আমি কবি সংগীতের ইন্দ্রজাল দিয়ে আসি চলে
মৃত্তিকার কোলে।

তপোভঙ্গ কবিতা রচনা ১৩৩০, প্রকাশ প্রবাসী ফাল্গুন ১৩৩০। একথা ভাবলে ভুল হবে যে রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ছিলেন বলে পৌত্তলিকতার অনুষাঙ্গ বর্জন করেছিলেন। কারণ তপোভঙ্গ কবিতায় পৌত্তলিকের দেবতা মহাদেবকে তিনি স্মরণীয়ভাবে গ্রহণ ও ব্যবহার করেছিলে। ভারতভূমিতে যে সব দেবতা ও অবতারের মূর্তি রচিত ও প্রচলিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে সন্দেহ নেই রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন শিব, হয়তো তার পরেই বুদ্ধ। দেবতাপ্রাপ্ত রাধাকৃষ্ণকে তিনি যে এড়িয়ে গিয়েছিলেন তার কারণ খুঁজতে হবে তাঁর ধর্মবিশ্বাসে নয়, কবিমানসে।

কবি আশাবাদী এবং জন্মান্তরে বিশ্বাসী। তাই তিনি আশা করেন জীবনে যে আহ্বান শুনতে পেলেন না মরণের মধ্য দিয়ে অধিষ্ঠাত্রী দেবীর আহ্বান কবির জীবনে শেষ পরিপূর্ণতা নিয়ে আসবে এই বিশ্বাসের বাণী দিয়েই 'আহ্বান' কবিতার পরিসমাপ্তি। 'পূরবী' কবিতা ও 'যাত্রী'র ডায়েরীর নিবিড় ঐক্য আছে। আহ্বান পরবর্তী কয়েকটি কবিতা - ছবি, লিপি, ক্ষণিকা, খেলা ও পূরবীর নাম কবিতার কবিকৃত গদ্যরূপ আমরা পাই যথাক্রমে যাত্রীর ২রা, ৩রা, ৫ই অক্টোবর ১৯২৪ এর ডায়েরির।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
11

পূরবী কাব্যখানি কবি উৎসর্গ করেছেন 'বিজয়াকে এই মহীয়সী নারী -

ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে উপলক্ষ করেই পূরবীর 'অতিথি' কবিতাটি লেখা। আর্জেন্টিনা পৌঁছে অসুস্থ কবি সেখানকার বিখ্যাত কবি ও লেখিকা ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সাহচর্য লাভ করেছিলেন। শারীরিক অসুস্থতায় কবির দেহমনে যখন দুর্বলতা দেখা দিয়েছে তখনই মাধুর্য সুধায় সেবাযত্নে কবির প্রবাসের দিনগুলি পরিপূর্ণ করে দিয়েছিলেন এই 'বিদেশিনী' নারী।

টিপ্পনী

মহুয়া (১৯২৯) :

বাজে পূরবীর ছন্দে রবির

শেষ রাগিণীর বীন।

এই বলে 'পূরবী'তে কবি তাঁর কবি জীবনের পরিসমাপ্তির আভাস দিয়ে যে আক্ষেপ করেছেন তা যে কতদূর অমূলক তার পরিচয় আমরা পাই 'মহুয়া' কাব্য গ্রন্থটিতে। সাতষট্টি বৎসর বয়সে কবি লিখলেন অপূর্ব এই প্রেম কাব্যখানি। এই কাব্য রচনার অবশ্য একটু ইতিহাস আছে কবি নিজেই তা এক পত্রে এইভাবে বিবৃত করেছেন -

> ইতিহাসটা হয়তো তোমাদের মনে থাকতে পারে - আমাদের দেশে নববধূর যৌতুক উপযুক্ত বই দেবার জন্য বন্ধুবর্গের বিস্তর চিন্তা ও সন্ধান করতে হয়। একদা স্থির করা গেল আমারই পুরাতন কাব্যগুলোর থেকে প্রণয়াত্মক কবিতা সঞ্চয় করে বরণডালা নামে সেটাকে সচিত্র ছাপানো যাবে। তার সঙ্গে দুটো একটা নতুন কবিতা চালানো যেতে পারে। কর্মসচিব (প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ) তার সমস্ত মুনাফা বিশ্বভারতীর খাতায় জমা করবেন বলে শাসালেন। প্রতিষ্ঠাতা আচার্য (স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ) চিন্তা করে দেখলেন মূলত এটা তাঁরই দান (রবীন্দ্র - রচনাবলীর কপি রাইট কবি বিশ্বভারতীকে দান করেন) হলেও বস্তুত এদানে তার বদান্যতার স্থান রইল না - খাজনা আদায়ের মত এরপরে আইনসঙ্গত দাবী এসে চাপল। তখন আমি ... আশ্বাস দিয়ে বললেন - মাভৈঃ, এ বইয়ের সব কবিতাই হবে অপূর্ব। তখন ছিলেন চৌরঙ্গীতে, সময় ছিল প্রচুর - কলম ছুটল চার পা তুলে।"

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
12

এইভাবে বিশ্বভারতীর কর্মসচিবের প্রতি জেদ করে কবিতা লিখতে বসে 'মহুয়া' সৃষ্টি হলেও এই কাব্যগ্রন্থের লেখাগুলি যে ফরমায়েসি লেখা নয় সেকথাও কবি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন ; কবি বলেছেন -

"মহুয়া কবিতা যখন লিখতে প্রবৃত্ত হলুম তখন তার প্রবর্তনা ছিল কর্মসচিবের প্রতি জেদ করে বিবাহে উপহারযোগ্য কবিতা লেখা , কিন্তু যে-মুহূর্তে লিখতে বসা যায় সেই মুহূর্তে অন্য সমস্ত ভুলে লেখা আপন প্রকৃতিতে ভর করেই চলতে থাকে। ওড়বার ফরমাশ গোড়ায় ছিল বলেই পাখি ফরমাশি ডানা আমদানি করে একথা .... অশ্রদ্ধেয়।"

টিপ্পনী

আসলে কবির নিজের কবিতা রচনার শক্তির প্রতি এতে অশ্রদ্ধা জানানো হয়। কাব্যগ্রন্থ রচনার বহিরঙ্গ প্রেরণা গৌণ, আসল প্রেরণা অন্তরঙ্গ। সেই আন্তরিক প্রেরণা বশেই 'মহুয়া' কবিতাগুলির সৃষ্টি, বাইরের ফরমাশ বা তাগিদ সেখানে নিতান্ত উপলক্ষ - এটাই কবির বক্তব্য।

'মহুয়া'র কবিতাকে কবি নিজে আকস্মিক রচনা বলেছেন । এই আকস্মিকতার স্বরূপটি বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। কবি নিজেই তা এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন -

এ কবিতাকে ঠিক আমার হালের কবিতা বলে শ্রেণীবদ্ধ করা চলে না । ভেবে দেখতে গেলে এটা কোনো কাল বিশেষের নয়, এটা আকস্মিক ।ম আমার সত্যিকারের আধুনিক কবিতার সঙ্গে যদি এদের এক পঙ্‌তিতে বসাও তাহলে তাদের বর্ণভেদ অত্যন্ত পরিস্ফূট হয়ে উঠবে। এখানকার কবিতাগুলি প্রায়ই তরুলতা এবং ঋতুবৈচিত্র্য নিয়ে। অর্থাৎ এরা বানপ্রস্থের উপযোগী ; 'ক্ষণিকা'য় যে বানপ্রস্থের উল্লেখ ছিল সেটার কথা বলচিনে। এদের যদি এক কোঠায় ফেল, তাহলে বাসর ঘরের ভিতে অশ্বত্থ গাছ রোপনের মতো হবে।"

কবি হয়তো তাঁর সময়কার রচনা বনবাণী, নবীন, নটরাজ ঋতুরঙ্গ র কথা মনে করেই পত্রে এইরকম মন্তব্য করেছেন। কবির অন্য এক পত্রেও অনুরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন -

"মনের যে ঋতুতে মহুয়া লেখা সে আকস্মিক ঋতুই, তবে ফরমাশের ধাক্কায় আকস্মিক নয়, স্বভাবতই আকস্মিক।"

মহুয়া গ্রন্থের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন -

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
13

"লেখার বিষয়টা ছিল সংকল্প করা প্রধানত প্রজাপতির উদ্দেশে আর তারই দালালি করেন যে দেবতা তাঁকে মনে রাখতে হয়েছিল।"

রবীন্দ্রনাথের নিজের আঁকা প্রচ্ছদপট মহুয়া কাব্যের লোভনীয়তা

বাড়িয়েছিল। কাব্যটির নাম প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন -

কবিতার অনির্দিষ্ট সংজ্ঞা প্রায়ই দেওয়া চলে না। আমি ইচ্ছে করেই মহুয়া নামটি দিয়েছে, নাম পাছে ভাষারূপে কর্তৃত্ব করে এই ভয়ে। অথচ কবিতাগুলির সঙ্গে মহুয়া নামের একটুখানি সংগতি আছে ..... মহুয়া বসন্তেরই অনুভব, আর ওর রসের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে উন্মাদনা।

টিপ্পনী

মহুয়া হয়ত রবীন্দ্রনাথের বৃহত্তম কবিতাগ্রন্থ। কবিতার সংখ্যা চুরাশি। দুটি ১৩৩৩ সালে, ছয়টি ১৩৩৬ সালে, তিনটি ১৩৩৪ সালে, বাকি সব ১৩৩৫ সালে লেখা। কতকগুলি কবিতা প্রেমভাবিত। এগুলি 'শেষের কবিতা' উপন্যাস রচনাকালে এবং সে উপন্যাস কাহিনীর ভাবপ্রেরণা বশে রচিত। প্রবাসী পত্রিকায় যখন শেষের কবিতা যখন ধারাবাহিকভাবে বাহির হয় তখন এগুলির অধিকাংশই তাতো সন্নিবিষ্ঠ হয়।

সবলা :

মহুয়া কাব্যগ্রন্থের সবলা কবিতাটি ২৩ আগস্ট ১৯২৮ এ লিখিত। বীরাঙ্গনা কাব্যে মধুসূদন জীবন্ত করে তুলেছিলেন পৌরাণিক জগতের কিছু নারীকে, রবীন্দ্রনাথের 'বিদায় অভিশাপ' নাট্যকাব্যে সেইভাবেই সংরক্ত হয়ে উঠেছে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী। প্রেমে আহত নারী তার প্রেমের অপমানে কীভাবে বিক্ষত হতে পারে, তা তিনি দেখিয়েছেন এই স্বল্পায়তন কথোপকথনে। কল্যানী মেয়ের কথা কবিতা ও গল্পে রবীন্দ্রনাথ অনেক বলেছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে পুরুষের একচেটিয়া শোষণেরমধ্যে তাদের অন্তরে যে উষ্মা জন্ম নেয়, সেই ক্ষোভ ও উষ্মার কথাও বলেছেন। কখনো তা শুধুই ক্ষোভ, বিদ্রোহ নয়, কখনো তা অস্ফুট সোচ্চার নয় - বিভিন্ন ধরনের প্রতিবাদই তার নায়িকাদের মধ্যে আমরা দেখতে পাই। এই ধরনের কিছু নারীকে দেখতে মেজবউকেই আমরা যেন খুঁজে পাই, যার -

রাঁধার পরে খাওয়া আবার খাওয়ার পরে রাঁধা

বাইশ বছর এক চাকাতেই বাঁধা।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
14

পলাতক কাব্যগ্রন্থ ফাঁকি, 'মায়ের সম্মান' প্রভৃতি কবিতায় আরো কিছু নারী আমরা দেখি কিন্তু মুক্তি কবিতায় যে অস্ফুট প্রতিবাদ আমরা দেখেছি তা স্পষ্ট হল 'নিষ্কৃতি' কবিতায় - কথায়, আচরনে। নারীর বন্ধনমোচনের প্রচেষ্টা সেখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নারীব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করার বাসনা, কেবল পুরুষদের নর্ম সহচর আর দাম্পত্য - সঙ্গিনী হয়ে জীবনকে অপচয়িত না করার বলিষ্ঠ উচ্চারণ আমরা দেখতে পাই 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থে। 'নির্ভর' কবিতার নায়িকা বলেছে -

আমরা দুজনা স্বর্গ খেলনা

গড়িব না ধরণীতে

মুগ্ধ ললিত অশ্রুগলিত গীতে।

নারী হতে চেয়েছে পুরুষের সহধর্মিনী, সহগামিনী -

পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি,

ছিন্ন পালের কাছি,

মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব

তুমি আছ, আমি আছি।

এটা যদি পুরুষের সহযোগী হবার জন্য নারীর প্রতিজ্ঞা হয়, তবে 'সবলা কবিতায় আমরা পাই বিধাতার বিরুদ্ধে নারীর বিদ্রোহ । নারীর পরিচয় শুধু বাসরকক্ষের অঙ্কশায়িনী হিসাবে নয়, তাই এখানেও নারীর শপথ এইরকম -

যাব না বাসর কক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিনী -

আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী।

শুধু এই শপথেই কবিতা শেষ হয় নি, বরং এর শুরুতেই আছে নারীর স্পর্ধিত উচ্চারণ -

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার

কেন নাই দিবে অধিকার

হে বিধাতা ?

পথপ্রান্তে কেন রব জাগি

ক্লান্ত ধৈর্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি

দৈবাগত দিনে।"

মহুয়া কাব্যে এসে পথিক কবির যাত্রা - বোধের স্পর্শ পুনরায় পাওয়া গেল। এবারে কিন্তু কবি প্রেমকে যাত্রী মানুষের সঙ্গী করেছেন, তাকে 'পথের ধূলা'র মধ্যে কালোচিত ভাবে পেয়েছেন । মহুয়া কাব্যে এই প্রেমের আবির্ভাব অবশ্যই 'আকস্মিক । কারণ জীবনাশ্রিত অরূপদর্শি বা নটরাজ -লীলাদর্শী কবির পরিণত প্রতিভায় বাস্তব প্রণয়ের সলাজ রক্তিমা বা নিজ ব্যক্তিকতার স্পর্শযুক্ত সাধারণ

টিপ্পনী

টিপ্পনী

প্রেমবর্ণনার প্রত্যয় কোথায় ? একদিক থেকে দেখতে গেল উত্তম কবিতামাত্রেই নূতন ওও আকস্মিক। মহুয়ার নব জাগরিত প্রেমবোধ বলাকার মতই রবীন্দ্র-প্রতিভার চঞ্চলতার অন্যতম উদাহরণ, কিন্তু রাবীন্দ্রকতার মধ্যেই সার্থক। তাঁর প্রধান সমস্ত রচনা তাঁর প্রতিভার ঐক্যসূত্রে সমঞ্জসীভূত বলে জীবনসমীক্ষায়ময় কাব্যার্থযোগে এত গভীরভাবে আনন্দদায়ক। কাব্যের মধ্যে বারবার একটি বিশিষ্ট কবি - বাণীকে লাভ করার পরম বৈচিত্রীও রবীন্দ্র রসিকদের আনন্দের অন্যতম কারণ। কিন্তু মূলতঃ তা হওয়া সত্ত্বেও মহুয়ার দৃষ্টিকোণ যে পৃথক একথা অবশ্যস্বীকার্য। যে ভীরু বালিকা একদিন 'জ্বলন্ত প্রদীপখানি ভাসাইয়া জলে, শঙ্কিত কম্পিত বক্ষে চাহি একমনা' একটি আলোকোজ্জল মিলনরাত্রির জন্য উৎসুক থাকত, অথবা একক প্রণয়ীকে নিয়ে বেণুমতীতীরে ভূস্বর্গ রচনার স্বপ্ন দেখত সে আজ প্রবল আত্মমর্যাদাবোধে বলতে পারে -

যাব না বাসর কক্ষে বাজায়ে কিঙ্কিনী

আমার প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী।

পুনশ্চ (১৯৩২ খ্রী) :

এই কাব্যের প্রায় সব রচনাই গদ্য কবিতা। এখানে অতীত ও বর্তমান এক সমভূমি হয়ে দেখা দিয়েছে। গদ্য কবিতার মূল লক্ষণ বিষমমাত্রিক যতি, অসম ছন্দঃস্পন্দ এবং গদ্যোচিত বাচনভঙ্গি সবই এই কবিতাগুলিতে আছে। এই কাব্যখানির নামকরণে কবির ভবিষ্যৎ দৃষ্টির আশ্চর্য পরিচয় পাওয়া যায়। 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থে পূর্ববর্তী কাব্য রচনার পালাটি শুরু করলেন তা শেষ পর্ব হলেও সামান্য পর্ব নয় - রচনার প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্যে, ভাবের গভীরতায় ও প্রকাশের উৎকর্ষে আধুনিক কাব্যপাঠককে বিস্মিত ও হতবুদ্ধি করে দেওয়ার মত উপকরণ এইপর্বে আছে। উত্তর - সত্তর কবির পক্ষে বয়সের ভার শারীরিক ক্ষয়ক্ষতি ও রোগযন্ত্রনাকে উপেক্ষা করে শেষ পর্বে মাত্র দশ বছরে বিশখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা কি করে সম্ভব হল সে রহস্য সত্যই দুর্জ্ঞেয় তবে সম্ভব যে হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় কবি নিজেই তাঁর গদ্য ছন্দ চর্চার সংক্ষিপ্ত একটি ইতিহাস দিয়ে গদ্যরীতি অবলম্বনের উদ্দেশ্য ও এই রীতিকে কাব্যরচনার সিদ্ধিলাভের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কবি লিখিত গদ্যরীতি চর্চার ইতিহাসটুকু এই রকম -

> "গীতাঞ্জলির গানগুলি ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করেছিলেন। এই অনুবাদ কাব্য শ্রেণীতে গণ্য হয়েছে। সেই অবধি আমার মনে এই প্রশ্ন ছিল যে, পদ্য, ছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে ইংরেজিরই

মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কি না। .... আমি নিজেই পরীক্ষা করেছি 'লিপিকার' অল্প কয়েকটি লেখায় সেগুলি আছে। ছাপবার সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খন্ডিত করা হয় নি - বোধ করি ভীরুতাই তার কারণ।

তারপরে আমার অনুরোধক্রমে একবার অবনীন্দ্রনাথ এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। আমার মত এই যে, তাঁর লেখালেখির কাব্যের সীমার মধ্যে এসেছিল, কেবল ভাষাবাহুল্যের জন্য তাতে পরিমাণ রক্ষা হয় নি। আর একবার আমি সেই চেষ্টায় প্রবত্ত হয়েছি।"

টিপ্পনী

বাংলা ছন্দের মুক্তি সাধনের ক্ষেত্রে মহাকবি মধুসূদনের পর রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টাই সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য, মাঝখানে রাজকৃষ্ণ রায়, বঙ্কিমচন্দ্র বা গিরিশচন্দ্রর নাম স্মরণ করা যেতে পারে। কিন্তু কবিতার ছন্দোমুক্তির ইতিহাসে তাঁদের দান তেমন কিছু স্মরনীয় নয়। সেই রকম কৃতিত্বের অধিকারী দুই কবি মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ। 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থেও ছন্দের বন্ধন মোচনের আকাঙ্ক্ষা কিছুটা সার্থকতা পেয়েছে। পরবর্তীকালে 'লিপিকায়' ছন্দোমুক্তি সাধনায় আর একধাপ অগ্রসর হয়ে 'পুনশ্চ' এর গদ্য কবিতায় চরম মুক্তি সাধনায় কবি অগ্রসর হতে পেরেছিলেন।

পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থের ভূমিকাতেই কবি গদ্য ছন্দ প্রবর্তনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। গদ্যছন্দের স্বরূপ, পদ্যছন্দের সঙ্গে এর মৌল পার্থক্যের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা অবশ্য প্রবন্ধ ও পত্রাকারে অন্যস্ত বিন্যস্ত হয়েছে। ভূমিকায় মন্তব্যের সঙ্গে তা একত্র আলোচনা করলে গদ্য রীতির কবিতা সম্পর্কে কবির পূর্ণাঙ্গ বক্তব্য মেলে।

কবির মতে - "পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে ইংরেজিরই মতো বাংলা গদ্যে কবিতায় রস দেওয়া যাব কিনা " এইটি পরীক্ষা করে দেখবার জন্যই তিনি গদ্যকবিতা রচনায় হাত দিয়েছিলেন। কবির এই অভিমত সমর্থনযোগ্য বলেই মনে হয়। অনেক সময় দেখা যায় শক্তিশালী কবি কবিতার স্বরূপ সন্ধানে কৌতূহলী হয়ে কবিতার সঙ্গে ছন্দের যে নিত্য সম্পর্ক তাকে কিছুটা বিশ্লিষ্ট করে পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকারকে বাদ দিয়েই কাব্যরস পরিবেশনের চেষ্টা করেন। ইংরেজ কবি ওয়ার্ডওয়ার্থ এক সময় এই চেষ্টা করেছিলেন। শুধু ওয়ার্ডওয়ার্থ নন, উনিশ শতকের প্রথমদিকে কোলরীজ, শেলী, কীটস প্রমুখ রোমান্টিক কবিগণও আঠারো শতকের 'পোয়েটিক ডিকশন' থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতে - 'The language of a large portion of every good poem must necessarily in no respect differ from that of good prose" (Poetry

টিপ্পনী

and poetic Diction wordsworth, English critical Essays xix, century p. 8 (1956)

রবীন্দ্রনাথও যে তাঁর পরিণত বয়সে কাব্যের রসকে রূপের বন্ধন থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করবেন তাতে বিস্ময়ের কি আছে ? তবে লক্ষ্মণীয় এই যে গদ্যকবিতায় গদ্য কবিতার 'সুস্পষ্ট ঝংকার' না থাকলেও অস্পষ্ট ঝংকার, ছন্দের অন্তঃপ্রবাহ থাকতে বাধা নেই, হয়তো তা থাকা উচিত বলেই কবি বিবেচনা করেছেন, তাই 'সুস্পষ্ঠ' কথার উপর জোর দিয়েছেন। গদ্য কবিতা সম্পর্কে কবির বলা বক্তব্য এই যে - "গদ্য কাব্যে অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশ রীতিতে যে একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠন প্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে ।" (ভূমিকা পুনশ্চ, রবীন্দ্ররচনাবলী ১৬শ খন্ড পৃ. ৩)

অর্থাৎ শুধু ছন্দের বন্ধন ভাঙাই গদ্য কবিতার ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়, গদ্য কবিতার যে এটা পোষাকি রূপ রয়েছে, ভাষা, প্রকাশরীতিতে যে একটি সলজ্জ অবগুণ্ঠন আছে তাও দূর করতে হবে। ভাষা বাহুল্য তো নয়ই, এমনকি ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে গদ্য কবিতায় কবিকর্মের যে অলিখিত বিধি বলবৎ আছে তাকেও ভাঙতে হবে । কবি নিজেই সে চেষ্টা করেছেন । 'পুনশ্চ' এর ভূমিকায় কবির নিজস্ব স্বীকৃতিতেই তার প্রমাণ আছে । কবি লিখেছেন "পদ্যের বিশেষ ভাষারীতি ত্যাগ করার চেষ্টা করেছি। যেমন তরে, সনে, মোর প্রভৃতি যে সকল শব্দ গদ্যে ব্যবহার হয় না সেগুলিকে এই সকল কবিতায় স্থান দিইনি।"

শুধু গদ্যে অব্যবহৃত শব্দকে বাদ দেওয়াই নয়, কবি পদ্য কবিতায় স্বল্প ব্যবহৃত 'কখনও' 'জন্যে' এবং 'হঠাৎ' 'অতএব', মধ্যে প্রভতি শব্দকে গদ্যকবিতায় বহুল ব্যবহার করেছেন, কারণ গদ্য কবিতায় এই জাতীয় শব্দ গদ্য ভঙ্গীর পক্ষপাতী বলে বিষয়ের সঙ্গে সহজেই হাত মেলাতে পারে, বক্তব্য বিষয়ের যে নিরাবরণ নিরাভরণ পৌরুষ তাকে স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশ করে।

দেশী বিদেশী সংস্কৃত প্রাকৃত শব্দ ব্যবহারেও কবি গদ্য কবিতাতেও যথেচ্ছ স্বাধীনতার সুযোগ নিয়েছেন। উপমা অলঙ্কারাদি ব্যবহারেও কবি এই সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠন প্রথা কিভাবে দূর করেছেন রবীন্দ্র রচিত গদ্য কবিতা থেকে তার কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে -

পেঁপে গাছ গুলোর যেন আতঙ্ক লেগেছে
উত্তরের মাঠে নিমগাছে বেধেছে বিদ্রোহ
তালগাছগুলোর মাথায় বিস্তর বকুলি ('সুন্দর' 'পুনশ্চ')

এছাড়া সমাস বা সন্ধির পরিবর্তে দেশী - বিদেশী গ্রাম্য নানা শব্দের সংমিশ্রণে যৌগিক শব্দগঠনের দ্বারাও কবি ঐ গুন্ঠন প্রথা লঙ্ঘন করে গিয়েছেন - যেমন রোদ - পোহানো ভাবনাগুলো (দেখো' 'পুনশ্চ'), মাথায় ভিজে চাদর জড়ানো গা - খোলা মোটা মানুষটি (পুকুর ধারে 'পুনশ্চ)।

কিন্তু গদ্য কবিতার 'পদ্য ছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার ত্যাগ করে 'অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধন' ভেঙে, ভাষা ও প্রকাশরীতিতে সসজ্জ সলজ্জ অবগুন্ঠন প্রথা দূর করে গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক করার দিকে যথেষ্ট নজর দিলেও কবি বুঝেছিলেন গদ্য কবিতা রচনায় সাফল্য নির্ভর করে না কেবলমাত্র শব্দ ছন্দ চিত্রকল্পের অভিনবত্বের উপর, গদ্যেও কবিতার রস দেওয়ার দিকেই কবিকে নজর রাখতে হয় তাই গদ্যকেও কাব্যের প্রবর্তনায় শিল্পিত করার উপরেই যে গদ্য কবিতার রচনার সার্থকতা সে কথাটিও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন কবি - "গদ্যকে কাব্যের প্রবর্তনায় শিল্পিত করা যায়, তখন সেই কাব্যের গতিতে এমন কিছু প্রকাশ পায় যা গদ্যের প্রাত্যহিক ব্যবহারের অতীত। গদ্য বলেই এর ভেতরে অতি - মাধুর্য, অতিলালিত্যের মাদকতা থাকতে পারে না। কোমলে কঠিনে মিলে একটা সংযত রীতির আপনা আপনি উদ্ভব হয়।" (গদ্যকাব্য ভাষণ, ছন্দ পৃ. ২২৫, ১৯৬২)

কবির এই মন্তব্যকে তাঁরই অন্যান্য উক্তির সাহায্যে যদি একটু বিশ্লেষণ করা যায় তবে গদ্য - কবিতার স্বরূপ সম্পর্কে তাঁর ধারণাটি সুস্পষ্ট হবে। 'কাব্য ও ছন্দ' প্রবন্ধে কবি বলেছেন - "ছন্দটাই যে ঐকান্তিকভাবে কাব্য তা নয় ল কাব্যের মূল কথাটা আছে রসে; ছন্দটা এই সের পরিচয় দেয় আনুষঙ্গিক হয়ে।" (কাব্য ও ছন্দ, সাহিত্যের স্বরূপ, রবীন্দ্র রচনাবলী (২৭ খন্ড পৃ. ২৬৬) এই প্রবন্ধেই কবি আরও বলেছেন -

> "গদ্যের হোক, পদ্যই হোক রস রচনা মাত্রেই একটা স্বাভাবিক ছন্দ থাকে। পদ্যে সেটা সুপ্রত্যক্ষ, গদ্যে সেটা অন্তর্নিহিত। সেই নিগূঢ় ছন্দটিকে পীড়ন করলেই কাব্যকে আহত করা হয়। পদ্য ছন্দবোধের চর্চা বাঁধা নিয়মের পথে চলতে পারে কিন্তু গদ্যছন্দের পরিমাণবোধ মনের মধ্যে যদি সহজে না থাকে তবে অলংকারশাস্ত্রের সাহায্যে এর দুর্গমতা পার হওয়া যায় না।"

চিররূপের বাণী :

পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থের গদ্যকবিতাগুলি প্রায় সবই আখ্যানধর্মী সেগুলির তুলনা চলে 'লিপিকা'র সঙ্গে। তবে 'লিপিকার' গল্পিকায় যেমন তির্যক দৃষ্টির খোঁচা আছে এগুলিতে তেমন নয়। ইমোশনের আর্দ্রতাও এখানে নাই। কবিচিত্তকে আকর্ষণ

টিপ্পনী

টিপ্পনী

করিয়াছে মানুষ। শৈশবস্মৃতিও বিষয়বস্তুর যোগান দিয়েছে। 'ছেলেটা', শেষ চিঠি', 'ক্যামেলিয়া', 'সাধারণ মেয়ে', 'খ্যাতি', 'বাঁশি', 'উন্নতি' ইত্যাদি কবিতাগুলি নিপুন নিটোল হৃদয়ভেদী রচনা। 'পুনশ্চ' ঐ রোমান্টিক মনোভাবের এবং তুচ্ছ নিসর্গবস্তু বা সাধারণ মানুষ নিয়ে লেখা কবিতা ছাড়া কবির ভাবাদর্শের প্রকাশক কয়েকটি কবিতাও এতে রয়েছে। যেমন 'বিচ্ছেদ' অথবা 'বিশ্বশোক' অথবা 'চিররূপের বাণী'। চিররূপের বাণী আমাদের আলোচ্য। এই কবিতায় ভাববাদী রবীন্দ্রনাথ বস্তু বা জড় বা স্থূলের নশ্বরতা এবং ভাব বা চেতনা বা সূক্ষ্মের চিরন্ততা প্রতিপন্ন করেছেন। সূক্ষ্ম যদিও স্থূলের মধ্যেই আবদ্ধ, যেমন সৌন্দর্য নৈসর্গিক বস্তুর মধ্যে, অথবা রূপ দেহের মধ্যে, তবু দেহের সঙ্গে অধিকারের সংগ্রামের রূপের জয় হচ্ছে, কণ্ঠের সঙ্গে সংগ্রামে জয়ী হচ্ছে বাণী। রূপের সঙ্গে বাণীর মিলন হচ্ছে কাব্যকল্পলোকে। কবিতার শেষে তাই কবি বলেছেন -

শোনা গেল আকাশ থেকে ;

ভয় নেই।

বায়ুসমুদ্রে ঘুরে ঘুরে চলে অশ্রুতবাণীর চক্রুলহরী,

কিছুই হারায় না।

আশীর্বাদ এই আমার, সার্থক হবে মনের সাধনা;

জীর্ণকণ্ঠ মিশবে মাটিতে, চিরজীবী কণ্ঠস্বর বহন করবে বাঈ

মাটির দানব মাটির রথে যাকে হরণ করে চলেছিল

মনের রথ সেই নিরুদ্দেশ বাণীকে আনল ফিরিয়ে কণ্ঠহীন গানে।

জয়ধ্বনি উঠল মর্তলোকে।

দেহমুক্ত রূপের সঙ্গে যুগলমিলন হল দেহমুক্ত বাণীর

প্রাণতরঙ্গিনীর তীরে, দেহনিকেতনের প্রাঙ্গণে।

'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে কবির নিরাসক্ত নিসর্গপ্রীতি ও জীবনপ্রীতি যেমন পেয়েছি, বাস্তব ও অনাদৃতের প্রতি অনুরাগও পেয়েছি এবং লক্ষ্য করেছি বিদায়কালে উদাসীন মহাকালের লীলার সঙ্গে কবির নিজ জীবনকে মিলিয়ে নেওয়ার আগ্রহ।

চিররূপের বাণী কবিতার ছন্দ :

মনে রাখতে হবে মিল বা অন্ত্যানুপ্রাসের অবিদ্যমানতাই সে ছন্দকে গদ্যধর্মী

করেছে তা নয়, কারণ, মধুসূদন প্রবর্তিত অমিত্রছন্দও গদ্য ছন্দ হত। যতিস্থাপনের বা পর্বের বিশৃঙ্খলার মধ্যে সামঞ্জস্যের যে সুরটি গদ্যচ্ছন্দের প্রাণ তা কবির অনুভুতিতে প্রথমে পরীক্ষামূলকতার কালে ধরা দেয়নি। কারণ গোড়ার দিকে রচিত কয়েকটি কবিতায় মধ্যে দেখা যায় যে যুগ্মমাত্রার এবং বিশেষভাবে ছয় আট মাত্রার পর যতিস্থাপনের ও ছেদস্থাপনের উপরেই কবির ঝোঁক বেশি। কিন্তু প্রকৃত গদ্যছন্দে ছেদ ও যতির স্থাপনে কবিকে নিজের এতদিনের অভ্যস্ত রীতিও শীঘ্র উল্লঙ্ঘন করতে হয়েছে। এখন কবি ৪, ৬, ৮ এর সঙ্গে ৫, ৭, ৯, ১১ এমনকি ১৩ পর্যন্ত মাত্রাকে মুখোমুখি স্থাপন করে যেন এক নূতন মন্ত্রে নকুল ও অহিকে একসঙ্গে খেলিয়েছেন। লক্ষ্য করতে হবে অমিত্রাছন্দের মত কবি ছেদকে সহসা কখনো পর্বের মধ্যে স্থাপন করে বৈচিত্র্য আনয়নের চেষ্টা করেন নি, সচরাচর যতিপাতের সঙ্গেই ছেদ টেনেছেন, অথবা এমন বলাই অধিকতর সংগত যে, ছেদের ক্ষেত্রে যতিকে ছেদের বশবর্তী রেখেছেন। যেমন হয়ে থাকে সাধারণ গদ্যে। এই দিক থেকে ইংরেজি Free Verse এর Cadence বা এক একটি অর্থবিভাগের শেষের স্বরবিরতির সঙ্গে গদ্যচ্ছন্দের তুলনা হতে পারে। এখানেও ছেদযুক্ত অর্থবিভাগের অনুসারে বিন্যস্ত রীদমই ছন্দের নিয়ামক। দেখা যায় আমরা সাধারণ গদ্যের উচ্চারণে সম-বিষম মাত্রাভেদ না করে যেমন যতি দিয়ে থাকি, সেই ভঙ্গিকেই কবি কলাকৌশলের দ্বারা বিশেষত্ব দিয়েছেন। প্রত্যাশিত স্বল্পমাত্রার পর্বকে একটু বিলম্বিত করেও কবি তাঁর রসোদ্দেশ্য সাধন করেছেন। কিন্তু মনে হয় দুটি উপযতিযুক্ত ১৩ মাত্রার পর্বই সবচেয়ে বড় পর্ব হিসাবে গদ্যচ্ছন্দে ব্যবহৃত হয়েছে। এইভাবে গদ্য প্রয়োজনীয়তামুক্ত হয়ে রূপরসাত্মক যথার্থ কাব্যের অঙ্গীভুত হয়েছে। গদ্যচ্ছন্দের পাঠে যতি ঠিক কোথায় পড়বে এ বিষয়ে কবি পাঠকের রুচির উপরেও হয়ত বা যৎকিঞ্চিৎ অধিকার অর্পণ করেছেন। অনিয়মিত বিভিন্ন পর্বের চলনে অভ্যন্তরীন নিয়মের সুর কেমন সুন্দর ধ্বনিত হয়েছে তা অপেক্ষাকৃত কলাকৌশলপূর্ণ চিররূপের বাণী কবিতায় দেখা যায় -

এতকাল আমার লীলা এই দেহে	১৩
এর অণুতে অণুতে আমার নৃত্য	১৩
নাড়িতে নাড়িতে ঝংকার	৯
মুহূর্তেই কি উৎসব দেবে ভেঙে	১২
দীর্ণ হয়ে যাবে বাঁশি	৯
চূর্ণ হয়ে যাবে মৃদঙ্গ	১০
ডুবে যাবে এর দিনগুলি	১০

টিপ্পনী

কোন্‌মন্ত্রে কবি এই বিশৃঙ্খল পদক্ষেপকে ঐক্যবদ্ধ করলেন, সাধারণ গদ্যকে কাব্যের গদ্যচ্ছন্দে উত্তীর্ণ করে দিলেন, যার জন্য এই শিল্পী কবির সম্পর্কে বলা যায় - এ গদ্য, কিন্তু ঠিক গদ্য নয়। কবির অনুভূতিই গদ্যকে কাব্য করে তুলেছে, একে নিয়মিত করে শিল্পগুণে গদ্যচ্ছন্দ গদ্যই, সুরধর্মী গদ্য।

টিপ্পনী

শ্যামলী (১৯৩৬) :

উৎসর্গ ছাযা 'শ্যামলী'তে (ভাদ্র (১৩৪৩) কুড়িটি মাত্র কবিতা আছে। কবিতা গুলি ১৩৪৩ সালে জ্যৈষ্ঠ হইতে ভাদ্র মাসের মধ্যে লেখা। 'কনি', হঠাৎ দেখা', অমৃত' দুর্বোধ ও বঞ্চিত এই পাঁচটিকে গদ্যকবিতায় ছোটগল্প বলা যেতে পারে। 'শেষ পহরে' সম্ভাষণ, ও 'অকাল ঘুম' এই তিনটি গল্পিকা। বাকি কবিতাগুলিতে পুরোনো স্মৃতি অথবা বর্তমানে পারিপার্শ্বিক উপলক্ষ্য করে কবি গভীর ভাবনাকে ছবির পর ছবি এঁকে দেখিয়েছেন।

১৯৩৫ সালের ৭ই এপ্রিল উত্তরায়ন, শান্তিনিকেতন থেকে ইন্দিরা দেবীকে লেখা এক পত্রের উপসংহারে কবি জানিয়েছেন -

> "একটা মাটির ঘর বানাতে লেগেছি। জন্মদিনের মধ্যে সেটা শেষ হবে বলে কথা আচে। সেই সময়ে ঐ ঘরে প্রবেশ করব, তারপরে শেষ পর্যন্ত আর বাসা বদল করব না এই আমার অভিপ্রায়।"

এই মাটির ঘর সম্পর্কে 'শেষসপ্তকে'র চুয়াল্লিশ সংখ্যক কবিতায় কবি লিখেছেন -

আমার শেষ বলেআকার ঘরখানি
বানিয়ে রেখে যাব মাটিতে
তার নাম দেব শ্যামলী।

'শ্যামলী'র অধিকাংশ কবিতা এই মাটির বাসা, কবির শেষ বেলাকার ঘরখানিতে বসে লেখা। ২৫শে বৈশাক ১৩৪২ শ্যামলী গৃহে প্রবেশ উপলক্ষে শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ করের উদ্দেশ্যে লেখা এক কবিতায় কবি ঐ ঘরের স্থপতিকে স্নেহশিষ জানিয়ে এই ঘরে বাসা বাঁধার কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলেছেন -

ধরণী বিদায় বেলা আজ মোরে ডাক দিল পিছু -
কহিল, "একটু থাম, তোরে আমি দিতে চাই কিছু,

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
22

আমার বক্ষের স্নেহ; রাখিব একান্ত কাছে ধরে

যে কদিন রয়েছিস হেথা, ঘিরিয়া রাখিব তোরে

স্পর্শ মোর করি মূর্তিমান,

ধরণীর এই আমন্ত্রণখানি সুরেন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসুর কীর্তিতে বাঁধা পড়েছে। শিল্পীকে উপলক্ষ করে কবি তাই জানালেন -

পঁচিশে বৈশাখ আমি একদিন না রহিব যবে

মোর আমন্ত্রনখানি তোমার কীর্তিতে বাঁধা রবে;

তোমার বাণীতে পাবে বাণী। সে বাণীতে রবে গাঁথা

ধরায়ে বেসেছি ভালো, ভূমিরে জেনেছি মোর মাতা।

'শ্যামলী' কবিতা সম্পর্কে কবির নিজের কোনও লেখাই পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থের সব কবিতাই (উৎসর্গ কবিতা বাদে) গদ্য ছন্দে লেখা এবং এই কাব্যগ্রন্থই রবীন্দ্রনাথের শেষ গদ্যছন্দে লেখা কবিতাপুস্তক, এরপর দু-একটি বিচ্ছিন্ন কবিতা ছাড়া কবি আর গদ্যছন্দের চর্চা করেন নি। 'পুনশ্চ', 'শেষ সপ্তক', 'পত্রপুট' এর সমজাতীয় ভাবধারা আশ্রয়ে একই রীতিতে এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি লেখা। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থাবলীর সঙ্গে এই কাব্যের কিছু পার্থক্য লক্ষ্য গোচর হবে। কতকগুলি কবিতা যেমন কনি, দুর্বোধ, পাত্রপাত্রী, অমৃত-কথিকাধর্মী রচনা, 'পলাতকা'র কথিকাজাতীয় রচনার মতো পূর্ণাঙ্গ কোন আখ্যান এদের বর্ণিতব্য নয়। এমন কি পূর্ণ চরিত্রচিত্রণও কবির উদ্দেশ্যে নয়।জীবনের এক একটি খন্ডাংশে বর্ণোজ্জ্বল চিত্রই কবি এই সব কবিতার ছোট গল্পকারের কলমে চিত্রিত করেছেন। তবুও এই কবিতাগুলির সাক্ষ্যে গদ্যকবিতা সম্পর্কে কবির সেই বিখ্যাত উক্তি - "আমি অনেক গদ্য কাব্য লিখেছি যার বিষয়বস্তু অপর কোনো রূপে প্রকাশ করতে পারতুম না' - তার প্রতিবাদ করা চলে। অন্ততঃ কথিকাধর্মী কবিতার ক্ষেত্র গদ্য কাব্যের আঙ্গিক যে অপরিহার্য ছিল না সে কথা বিনা দ্বিধায় বলা যায়। গদ্য ছন্দের প্রতি পক্ষপাতবশে এক সময় কবি তার উপর অহেতুক গুরুত্ব আরোপ করে যে সব কথা পত্রে প্রবন্ধে বলেছেন তার উপর কবির নিজেরই যে পূর্ণ আস্থা নেই তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'শ্যামলী'র পর গদ্যছন্দের প্রতি কবির আগ্রহ সম্পূর্ণ অন্তর্ধান হওয়ার ঘটনায় - এরপর কবি আবার মিল মিলিয়ে কবিতা লিখেছেন, তানপ্রধান ছন্দের জগতে ফিরে এসেছেন। 'শ্যামলী' পরবর্তী 'খাপছাড়া', 'ছড়ার ছবি' প্রভৃতিতেই তার নিদর্শন পাওয়া যায়।

'শ্যামলী'র 'আমি' কবিতাটি খুবই উল্লেখযোগ্য। যে দৈবী ভাবনায়

টিপ্পনী

টিপ্পনী

অনুপ্রাণিত হয়ে বৈদিক কবি বলেছিলেন - অহং রুদ্রের্ভিবসুভিশ্চরামি। সেই মতো কোনো ভাবনার বশেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন -

আমারি চেতনার রঙে পান্না হোলো সবুজ
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে
জ্বলে উঠল আলো
পূবে পশ্চিমে

কিছু বৈদিক কবির ভাবনায় যে ভাব অনপেক্ষিত অতএব অনুপস্থিত তাও রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

মানুষের যাবার দিনের চোখ
বিশ্ব থেকে নিকিয়ে নেবে রং
মানুষ যাবার দিনের মন
ছানিয়ে নেবে রস .....
তখন বিরাট বিশ্বভুবনে
দূরে দূরান্তে অনন্ত অসংখ্য লোকে লোকান্তরে
এ বাণী ধ্বনিতে হবে না কোনখানেই
'তুমি সুন্দর'
'আমি ভালোবাসি'।

কল্পনার স্বপ্ন কবিতায় কবি কালিদাসের কালে উজ্জয়িনীতে অভিসারে গিয়েছিলেন, ক্ষণিকার 'সেকাল' কবিতায় কালিদাসের নায়িকাদের বর্তমান কালের সাজবদলে দেখিয়েছিলেন, শ্যামলী 'স্বপ্ন' কবিতায় তিনশো বছর আগেকার বৈষ্ণব - কবির নায়িকাকে আধুনিকার মধ্যে প্রত্যক্ষ না করলেও অন্তরে চিনেছেন।

'বাঁশিওয়ালা' জীবন-বন্দিনী নারীর বন্দনা। বুক মোচড়ানো কবিতা। পরিশেষ-পুনশ্চর 'বাঁশি' কবিতার পরিপূরক।

হয়ত আমাকে দেখতে চেয়েছ তুমি
জানিনে, ঠিক জায়গাটি কোথায়

ঠিক সময় কখন্

চিনবে কেমন করে।...

ওগো বাঁশিওয়ালা

সে থাক্ তোমার বাঁশি সুরের দূরত্বে।

পত্রপুটে পাতাঝরানোর মৃত্যুর কথাটাই বেশি করে জেগেছে, আর শ্যামলীতে স্নিগ্ধ শ্যামকান্ত বাঙালী মেয়ের নিত্যকালের স্নিগ্ধ জীবনের - রূপটিই দৃষ্টি অধিকার করেছে, তাই কাব্যটির নাম 'শ্যামলী'। তাই তখন এই নামে মাটির ঘরে কবি বাসা বেঁধেছেন -

ওগো শ্যামলী

আজশ্রাবণে তোমার কালো কাজল চাহনি

চুপ করে থাকা বাঙালী মেয়েটির

ভিজে চোখের পাতায় মনের কথাটির মতো....

.....

তোমার ব্যথাবিহীন বিদায় দিনে

আমার ভাঙা ভিটের পরে গাইবে দোয়েল লেজ দুলিয়ে

এক সাহানই বাজে তোমার বাঁশিতে, ওগো শ্যামলী

যেদিন আসি, আবার যেদিন যাই চলে।

হঠাৎ দেখা :

'পত্রপুটের' তত্ত্ববিলাস থেকে 'শ্যামলীতে' এসে স্বভাবকাব্যের উদারতা অনুভব করা যায়, যদিও 'শ্যামলী'র সর্বত্রই 'নারিকেলবন- পবন- বীজিত- নিকুঞ্জ' দেখা যায় না। কারণ এখানকার আত্মরতিযুক্ত 'আমি' বা 'কালরাত্রে' কবিতায় আত্মমানস বিবৃতি ও তত্ত্বাবভাসের পরিচয় রয়েছে। আবার স্বপ্ন, বাঁশিওয়ালা, অকাল ঘুম, তেঁতুলের ফুল প্রভৃতি কয়েকটি কবিতায় কবির চিরকালের বিস্ময় বিমিশ্র অজানার অনুভূতি এবং আখ্যান বাহিত কয়েকটি কবিতায় ক্ষনিকের ও অপ্রত্যাশিতের আবেগও প্রকাশিত হয়েছে। 'চিরযাত্রী' কবিতাটির মধ্যে গতিধর্মী মানুষের মহিমা হয়েছে কীর্তিত, তবু 'শ্যামলী' কাব্যের আকর্ষণ ওর বিক্ষিপ্ত আত্মতত্ত্বে নয়, মানবিক মিলন - বিরহ - বেদনায়। সেদিক থেকে 'শ্যামলী' একালের

টিপ্পনী

টিপ্পনী

'বীথিকা', 'সানাই' এবং পূর্বকালের মানসী - কল্পনা-ক্ষণিকার কিছুটা সগোত্র। এর সম্ভাষণ, হারানো মন, অকাল ঘুম, শেষ পহরে এবং হঠাৎ দেখা - এই পাঁচটি কবিতায় কবির বার্ধক্য রচিত প্রণয়স্বপ্ন স্থান পেয়েছে। পূর্বেকার সঙ্গে পার্থক্য এই যে, এগুলি ভাবাবেগ বা সেন্টিমেন্ট থেকে প্রায় মুক্ত এবং ভঙ্গিমায় ও পরিবেশ গ্রন্থনে সহজ স্বতন্ত্র। এর মধ্যে 'সম্ভাষণ' কবিতার সঙ্গে বীথিকার 'নিমন্ত্রণ' কবিতার ভাবসাদৃশ্য লক্ষণীয়। সামান্যের মধ্যে যে অসামান্যতা রয়েছে বা আটপোরের মধ্যে রোমান্টিকতা। বাস্তবকে স্বীকার করেই কবি যেন তার প্রতি আগ্রহী হয়েছেন। নারীকে ঘিরে কবির যে রূপাসক্তি ও স্বপ্নচারী মনোভাব প্রসিদ্ধ, বয়সের পরিবেশকে মান্য করেও কবি কিন্তু তা থেকে বঞ্চিত হতে চান না। 'হঠাৎ দেখা' কবিতায় এই ধরনের সেন্টিমেন্টের আবৃত্তি আছে। বহুকাল বিচ্ছিন্ন প্রণয়নীর সঙ্গে সাক্ষাতে জিজ্ঞাসা করল -

বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়েই শুধোল

"আমাদের গেছে যে দিন

একেবারেই কি গেছে

কিছুই কি নেই বাকি।"

প্রণয়ী উত্তর করল -

একটুকু রইলুম চুপ করে ;

তারপর বললেম,

"রাতের সব তারাই আছে

দিনের আলোর গভীরে।"

তবু এর যুগোচিত স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয়েছে এই সেন্টিমেন্টের বাক্য উচ্চারণের পরেই - এর ঠিক পরবর্তী বাক্য -

"খটকা লাগল, কী জানি বানিয়ে বললেম না কি।"

- এই সংশয় বাক্যই কবিতাটিকে রোমান্স থেকে মুক্ত করে দিনের আলোর সহজে নিয়ে এসেছে। এখানেই কবিতাটির সার্থকতা।

প্রান্তিক (১৯৩৮) :

'কড়ি ও কোমলের' সূচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন -

> "যারা আমার কাব্য মন দিয়ে পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন - মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি আমার কাব্যের এমন একটি বিশেষ ধারা, নানা বাণীতে যার প্রকাশ। কড়ি ও কোমলেই তার প্রথম উদ্ভব।"

টিপ্পনী

মৃত্যু বিষয়ক ভাবনা কবি মাত্রেরই কাব্যের মূল ভাবগ্রন্থি। জীবনকে তিনি ভালোবাসেন মৃত্যুর চিন্তা থেকে তার মুক্তি নেই - মৃত্যু জীবনচিন্তারই পরিণতি বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রকাব্যেও মৃত্যু বিষয়ক উপলব্ধি একটি গুরুত্বপর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে তাতে আর আশ্চর্য কি ! 'কড়ি ও কোমল' কাব্যে অর্থাৎ কবি প্রতিভার উন্মেষক্ষণেই যখন জীবনের মমতা কবিকণ্ঠে সর্বাধিক গুরুত্বলাভ করেছে, তখন থেকেই মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি কবির কাব্যে আত্মপ্রকাশ করেছে দেখা যায়। অন্তঃপর বিভিন্ন স্তরের অনুভুতির মধ্য দিয়ে তা গভীরতা লাভ করে 'প্রান্তিকে' এসে মৃত্যুবিষয়ক কবির বক্তব্য পূর্ণ রূপ লাভ করেছে।

১৯৩৭ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যাকালে কবি অকস্মাৎ হতচৈতন্য হন। দুদিন সেইভাবে কাটার পর ডাক্তার নীলরতন সরকারের চিকিৎসায় সপ্তাহকাল মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেন। অকস্মাৎ ব্যাধির নির্দয় আঘাতের বজ্রালোকে মহান মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় লাভ করে কবির মৃত্যুর যে রহস্য ও মহিমা উপলব্ধি করলেন বলা যায় মত্যুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সেই পরম অভিজ্ঞতাই 'প্রান্তিক' কাব্যখানিতে অখন্ড এক ভাবমূর্তি লাভ করেছে।

মৃত্যুদূতের অকস্মাৎ আবির্ভাবে অবসন্ন চেতনায় গোধূলিবেলায় তোরণ থেকে অজানার যেটুকু আভাস পেয়েছেন বলে কবি অনুভব করেছেন তাই ভাষার মধ্যে ধরে দিতে চেষ্টা করেছেন 'প্রান্তিক' এর কবিতায়। মত্যুর নিদারুন অভিজ্ঞতা ও তাকে কাব্যে প্রকাশ করার মধ্যে কালের ব্যবধান খুব অল্প। কবির রোগমুক্তির দশ বারোদিন পর থেকেই 'প্রান্তিক' এর কবিতাগুলি রচনার সূচনা হয়। ফলে 'এখানে যেন অভিজ্ঞতার গভীর খনি হইতে উত্তোলিত মূর্তিটা দেখিতে পাই - এ যেন অভিজ্ঞতার কাঁচামাল, শিল্পকলা ইহার উপরে রাজকীয় মুদ্রা অঙ্কিত করিবার সুযোগ পায় নাই।" (রবীন্দ্র সরণী, অধ্যাপক শ্রী প্রমথনাথ বিশী, পৃ - ৩১৯ (১৩৬৯)। মৃত্যুর অভিজ্ঞতার অন্ধকার খনিগর্ভ থেকে সদ্য উত্তোলিত এই কবিতাগুলি সম্পর্কে কবির বিস্তারিত বক্তব্যের সাক্ষাৎ পাওয়া না গেলেও 'প্রান্তিক' এর কবিতা রচনার আটমাস পরে নববর্ষের (১৩৪৫) ভাষণে কবি তাঁর ঐ অভাবনীয় অনুভূতির বিশ্লেষণ করে যা

টিপ্পনী

বলেছেন তা এই কাব্যোপলব্ধির সহায়ক হবে বিবেচনার নিচে উদ্ধৃত হল -

> "কিছুকাল পূর্বে আমি মৃত্যুগুহা থেকে জীবনলোকে ফিরে এসেছি। যে মূলধন নিয়ে সংসারে এসেছিলাম, কর্ম পরিচালনার জন্য শরীর মনের যে শক্তির আবশ্যক তা যেন আজ পূর্ণ পরিমাণে নেই, অনেকটা তার লুপ্ত হয়েছে অতল স্পর্শে। আমার নিজের কাছে আমার প্রশ্ন এই, জীবনে এই যে রিক্ততার পর্ব নিয়ে এসেছি একি একটা নূতন পূর্ণতার ভূমিকা ? যে জীবনকে নানাদিক থেকে নানা অভিজ্ঞতায় বিচিত্র করে সার্থক করেছি, যাত্রার শেষ প্রান্তে সে আমাকে সহসা একান্ত শূন্যতার মধ্যে পৌঁছয়ে দিয়ে তার সমস্ত উপলব্ধিকে নিঃশেষে ব্যর্থ করে মিলিয়ে যাবে একথা ধারণা করা যায় না। আমার মনে হয় ক্রমে ক্রমে এই বোঝা ঘুচিয়ে দেবার রিক্ততাই সবচেয়ে আশ্বাসের বিষয়।
>
> জীবনে অনেক কর্ম করেছি, সুখ দুঃখ ভোগ অনেক হয়েছে ; এখন যদি ইন্দ্রিয়াশক্তি ক্লান্ত হয়ে থাকে তবে আসক্তির অধ্যাত্মলোক বাকি আছে ; আমাদের যে শক্তি ক্ষুধাতৃষ্ণার দিকে আসক্তির দিকে আমাদের গুহাবাসী জন্তুটিকে তাড়না করে তা যদি ম্লান হয় তবেই আশা করি অন্তরের দিক থেকে মনুষ্যত্বের সিংহদ্বার খোলা সহজ হবে। রিক্ততার পথ দিয়েই, পূর্ণতার মধ্যে পৌঁছানো যাবে। বোঁটার বাঁধন থেকে ফল খসে যাব, তাতে তাদের ভয় নেই, তাই শাখার আসক্তি তাদের পিছনের দিকে টানে না, নবজীবনের নবপর্যায়ে তাদের বন্ধন মোচন হয়। তেমনি দেহতন্ত্রে প্রাণের আসক্তি যদি শিথিল হয় তবে তাকে নবজীবনের ভূমিকা বলেই জানব।' [রবীন্দ্রজীবনী (৪র্থ খন্ড) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃ - ৯৮ (১৩৬৩)]

মৃত্যু সম্পর্কে কবির আধ্যাত্মিক প্রত্যয় রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-জীবনে মৃত্যুর পরোক্ষ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে, কবিকে ধৈর্য ধারণে কি পরিমাণ শক্তি দান করেছে তার পরিচয় পাঠক পেয়েছেন। দেখা গেল এবারে মৃত্যুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ক্ষেত্রে কবির সেই আধ্যাত্মিক বিশ্বাস বহুদূর কার্যকরী হয়েছে। আমরা দেখলাম মৃত্যু এখনও তাঁকে ভয় দেখাতে পারেনি। ভারতীয় দার্শনিক প্রত্যয়ে শক্তিমান কবি আত্মার অবিনশ্বরতায় আস্থাশীল থাকতে পেরেছেন। তাই কবি মানবজীবনে মৃত্যুর সার্থকতাকে প্রতিপন্ন করেছেন এইভাবে - "রিক্ততার পথ দিয়েই পূর্ণতার মধ্যে পৌঁছানো যাবে' এই আধ্যাত্মিক বিশ্বাসই 'প্রান্তিক' কাব্যের সবচেয়ে আশ্বাসের বিষয়

। মৃত্যুস্নানে শুচি হয়ে কবি আত্মা যেন দেহমুক্ত আত্মার জয়ের কথাই ঘোষণা করেছে 'প্রান্তিক' এর কবিতায় -

দেখিলাম অবসন্ন চেতনার গোধূলি বেলায়
দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোতবাহি
অন্তহীন তমিস্রায়। নক্ষত্র বেদীর তলে আসি
একা স্তব্ধ দাঁড়াইয়া, উর্দ্ধে চেয়ে কহি জোড় হাতে -
হে পূষণ্, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল,
এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ,
দেখি তারে যে - পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক,

টিপ্পনী

উপনিষদের বাণীতে বিশ্বাসী কবি প্রান্তিকের উপনিষদ তুল্য কবিতাকে আত্মার মহিমার কথাই বারবার উচ্চারণ করেছেন দেখা যায়, প্রান্তিকের ভাষা ও ভঙ্গিতে যেমন যেমন বলাকা পূরবী কালের, এমনকি তারও পুর্বেকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, তেমনি আত্মদর্শনেও ঐ কালের সত্যদিদৃক্ষা, অরুপানুভূতি এবং নবজীবনের পথে যাত্রার আগ্রহ সূচিত করে।

১৮ সংখ্যক কবিতা :

নাগিনীরা চারি দিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

'প্রান্তিক' কাব্যগ্রন্থে কবি স্বার্থবাসনাহীন মুক্ত জীবনের অভিলাষী হয়ে উঠেছেন। প্রান্তিকের শেষের দুটি কবিতা অর্থাৎ ১৭ সংখ্যক কবিতা - 'যেদিন চৈতন্য মোর মুক্তি পেল লুপ্তিগুহা হতে' - যেন পরবর্তী রচনার নান্দী। মানুষের জগতে কবি যেন সম্পূর্ণ জেগে উঠেছেন।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

এই কবিতাটি সম্পর্কে রবীন্দ্র রচনাবলীর গ্রন্থপরিচয় অংশে বলা হয়েছে -

টিপ্পনী

'১৮ সংখ্যক কবিতাটির প্রসঙ্গে রবীন্দ্রভবনে রচিত 'বর্ষামঙ্গল' পান্ডুলিপির নিম্নসংকলিত উপসংহারের অংশ তুলনীয় -

> "নটরাজ। পালার শেষে শান্তিবাচনিকের নিয়ম আছে। আজ বিষধর নাগিনীরা জগতের চারদিকে ফণা তুলে গর্জন করছে। আজ শান্তির কথা পরিহাসের মতো শোনাবে। তাই উপসংহারে ডাক দিয়ে যাই তাদের, অকল্যাণের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য যারা প্রস্তুত।" (রবীন্দ্ররচনাবলী, একাদশ খন্ড, বিশ্বভারতী, গ্রন্থপরিচয়, পৃ - ৬৭৩)

কবির উপনিষদের বিশ্বাসের পাশাপাশি একাব্যে কবির বাস্তব সচেতন রুদ্ররূপের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর দীপ্ত বাণী প্রান্তিক কাব্যের ১৮ সংখ্যক কবিতায় শোনা গেছে।

এই কবিতায় কবির সমাজসচেতন মনোভাবের পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। এতে তিনি কেবল সাধারণভাবে যুদ্ধবিরোধী নয়, ফ্যাসিজ্‌ম্‌ এর বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করে সংগ্রামের পক্ষপাতী। মানববিরোধী যান্ত্রিক রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের চক্রান্ত ও কৌশল, রাষ্ট্রনেতাদের কূট চারিত্র্য কবির তীব্রতম ঘৃণায় বিষয়ীভূত হয়েছে এই কবিতায়। ঔপনিবেশিক শোষণের ছবি আজ কবির সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাই তিনি শান্তি আর মানুষের ক্ষেত্র ছেড়ে চলে এসেছেন বাস্তবের মাটিতে।

নবজাতক (১৯৪০) :

কবির আশি বছরের জন্মোৎসবে ১৩৪৭ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয় 'নবজাতক' কাব্যগ্রন্থটি। এই কাব্যগ্রন্থে প্রকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত সুধীরচন্দ্র করের 'কবিকথা' গ্রন্থে পাওয়া যায়। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে লেখা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত অনেকগুলি কবিতা জমা হয়েছিল।

> - "সেই সমস্ত কবিতা দিয়ে একখানি নূতন কাব্য বের করাই স্থির হল। ভান্ডার শূন্য পড়লেই নূতন জোগানের তাগিদ আসত কবির মনে, দেখা দিত তার সৃষ্টির চালান, অনেক সময় সেই সঙ্গে নূতন ঢালও। জমানো সব বের করে দিতে গিয়ে, যত সব ভাবগম্ভীর বিশেষ ধারার কবিতার সঙ্গে চলে গেল সাময়িক ঘটনা বা ব্যক্তি বিশেষের সম্বন্ধে টুকরো টাকরা খুচরা কবিতাও। দুটো বইয়ের কবিতা নিয়ে দাঁড়াল একটা বই। হল সেটা স্তূপাকার এবং জবড়জঙ। কবির নির্দেশ। পাঠানো গেল তাই প্রেসে। নববর্ষে কিছু দেবার নিয়ম রক্ষা হবে বটে। কিন্তু কবির মন ভারাক্রান্ত জিনিসগুলোর

অসংগতির ভারে । ঘটনাচক্রে সেই দিনই এসে পড়েছেন অমিয়বাবু। কবির নির্ভরযোগ্য শ্রোতা ছিলেন তিনি। কবি কপিটা প্রেস থেকে আনিয়ে নিলেন - সেদিন এ পর্যন্তই।

পরদিন সকালে অফিসে আসতেই দেখা গেল আবহাওয়ার অদ্ভুত বদল। রাত্রে যেন কবির উপর দিয়ে এক ঝড় বয়ে গেছে - আসছে আরেক ঝড়। কথাবার্তা একরূপ বন্ধ। সব গুরুগম্ভীর থমথমে। কবিতার ফাইলটি এল ফেরত। ডাকিয়ে নিয়ে জানালেন সামরিক ঘটনা বা ব্যক্তিদের নিয়ে লেখা কবিতার আপাতত বিদায়। যা থাকল, দুটো কবিতার বই হবে তা দিয়ে। বাদ পড়া কবিতার স্থান পুরাতে হবে, এজন্য এখনই লিখতে বসতে হবে, কেউ যেন তাঁকে বিরক্ত না করে। বললেন - 'একটাতে সব ঠাসলে খুবই ক্ষতি হত, সেই পরিশোধের মতো ভালোগুলি পড়ত চাপা। অমিয়র কথাই ঠিক, দুটো বই হওয়াই ভালো। এরপরে যেমন ধ্যানে বসেন তেমনি করে বসলেন লিখতে। দুটো বইর সিদ্ধান্ত তো হল। কিন্তু সে পরিমাণে দুটোতেই কবিতার সংখ্যায় পড়ল কিছু কমতি। নূতন লিখে এর মধ্যে তা আর ছাপিয়ে ওঠা যাবে কিনা সে থাকল এক বিষম উদ্বেগ। কিন্তু সেই বৈশাখেই বের করলেন 'নবজাতক', আষাঢ়ে (প্রকৃত প্রস্তাবে আষাঢ়ে নয় শ্রাবণে) বেরল বাকি গুলো দিয়ে সানাই। দুই বইতেই নূতন কবিতাগুলি ভাগ হয়ে গেল।" কবিকথা, সুধীরচন্দ্র কর, পৃ - ৫৮ - ৫৯) (১ম সংস্করণ)

উপরের উদ্ধৃতিতে নবজাতক ও সানাই কাব্য দুখানির জন্মকথাই শুধু নয়। সেই সঙ্গে কাব্যসৃষ্টির কালে কবির ভাবান্তরের বর্ণনাও পাওয়া গেল।

নবজাতকের কবিতাসংখ্যা পঁয়ত্রিশ। একটি ১৯৩২, একটি ১৯৩৫, দুটি ১৯৩৭, দশটি ১৯৩৮, সাতটি ১৯৩৯, সাতটি ১৯৪০। সাতটির রচনাকাল উল্লিখিত নেই। রচনাকাল, বিষয় ও মেজাজ অনুসারে নবজাতকের কবিতাগুলি বৈচিত্র্যপূর্ণ। কবির দৃষ্টি সর্বত্র আত্মমুখীন নয়। ১৯৩৮ সালে লেখা পক্ষীমানব কবিতাটিতে বিজ্ঞান অনুশীলিত যন্ত্রসভ্যতার পরিণাম সম্বন্ধে যে আশঙ্কা প্রকাশিত তা যে ফলতে চলেছে তা বোঝা যায়।

'নবজাতক' গ্রন্থের সূচনায় কবি লিখেছেন -

"আমার কাব্যের ঋতু পরিবর্তন ঘটেছে বারে বারে। প্রায়ই সেটা ঘটে নিজের অলক্ষ্যে। কালে কালে ফুলের ফসল বদল হয়ে থাকে, তখন মৌমাছির মধু জোগান নূতন পথ নেয়। ফুল চোখে দেখবার

টিপ্পনী

টিপ্পনী

পূর্বেই মৌমাছি ফুলগন্ধের সূক্ষ্ম নির্দেশ পায়, সেটা পায় চারিদিকের হাওয়ায়। যারা ভোগ করে এই মধু তারা এই বিশিষ্টতার টের পাব স্বাদে। কোনো কোনো বনের মধু বিগলিত তার মাধুর্যে, তার রঙ হয় রাঙা, কোনো পাহাড়ি মধু দেখি ঘন, আর তাতে রঙের আবেদন নেই, সে শুভ্র ; আবার কোনো আরণ্য সঞ্চয়ে একটু তিক্ত স্বাদের আভাস থাকে।

কাব্যে এই যে হাওয়া বদল থেকে সৃষ্টি বদল এতো স্বাভাবিক ; এমনি স্বাভাবিক যে এর কাজ হতে থাকে অন্য মনে। কবির এ সম্বন্ধে খেয়ালে ধাকে না। বাইরে থেকে সমজদারের কাছে এর প্রবণতা ধরা পড়ে। সম্প্রতি সেই সমজদারের সাড়া পেয়েছিলুম। আমার এক শ্রেণীর কবিতার এই বিশিষ্টতা আমার স্নেহভাজন বন্ধু অমিয়চন্দ্রের দৃষ্টিতে পড়েছিল। ঠিক কিভাবে তিনি এদের বিশ্লেষণ করে পৃথক করেছিলেন তা আমি বলতে পারি নে। হয়তো দেখেছিলেন এরা বসন্তের ফুল নয় ; এরা হয়তো প্রৌঢ় ঋতুর ফসল, বাইরে থেকে মন ভোলাবার দিকে এদের ঔদাসীন্য। ভিতরের দিকের মননজাত অভিজ্ঞতা এদের পেয়ে বসেছে। তাই যদি না হবে তাহলে তো ব্যর্থ হবে পরিণত বয়সের প্রেরণা। কিন্তু এ আলোচনা আমার পক্ষে সংগত নয়। আমি তাই নবজাতক গ্রন্থের কাব্যগ্রন্থনের ভার অমিয়চন্দ্রের উপরেই দিয়েছিলুম। নিশ্চিন্ত ছিলুম, কারণ দেশ বিদেশের সাহিত্য ব্যাপক ক্ষেত্রে তাঁর সঞ্চরণ।"

'নবজাতকের' সূচনায় কবির যে বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গে কবি কথা বর্ণিত এই কাব্যের জন্মকথার সম্পূর্ণ সঙ্গতি আছে, ডঃ অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী নবজাতক কাব্যগ্রন্থন বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তার পরিচয় কবির কথাতেও পাওয়া যায়। তিনি এই কাব্যের মূল বৈশিষ্ট্যটি নিজের কাব্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সেই দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। - "এরা বাস্তবের ফুল হয় ..... মননজাত অভিজ্ঞতা এদের পেয়ে বসেছে।"

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
32

নবজাতকের সূচনায় কবিনিজের কাব্য সম্পর্কে একটা মূল্যবান মন্তব্য করেছেন - 'আমার কাব্যের ঋতু পরিবর্তন ঘটেছে বারে বারে।' কবির এই উক্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের শেষ পর্যায়ে ক্ষণে ক্ষণেই আমরা তার পরিচয় পেয়েছি। 'নবজাতকে' কবির যে নবজন্ম হয়েছে তার মূলে রবীন্দ্র কবি প্রতিভার অত্যাশ্চর্য নব নবোন্মেষশালিনী শক্তির পরিচয় যেমন আছে তেমনি আছে কবির চারিপাশের হাওয়া বদলের প্রভাব। কাব্যে এই হাওয়া বদল থেকে সৃষ্টি বদল

এটা খুবই স্বাভাবিক - কত স্বাভাবিক তার পরিচয় যে কোনও দেশের সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় স্পষ্ট হয়।

কালান্তরের ঘোষণা যখন চারিদিকের হাওয়ার স্পষ্ট, তখন রবীন্দ্রকাব্যে তার আভাস অবশ্যই দৃষ্টিগোচর হয়। এই যুগধর্মকে অঙ্গীকার করতে গিয়ে রবীন্দ্রকাব্য যে স্বধর্মচ্যুত হয়নি তার সম্পর্কে কবির নিজের উক্তি প্রামাণ্য জ্ঞানে এখানে উদ্ধৃত হল -

> "চারিদিকের সঙ্গে আমার মনের স্পর্শের যোগ খুব ঘনিষ্ঠ। যাই বলি না কেন বর্তমান যুগধর্মের প্রেরণাকে অতিক্রম করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার পথের বাঁকচুর সে ঘটিয়েছে সব সময়ে জানতে পারি না পারি। আমার বিশ্বাস আমার মধ্যে আধুনিক দেখা দিয়েছে পুরাতন বাসাতেই, আমি বাসা বদল করিনি - বোধ হচ্ছে না করবার কারণ এই যে আমার বাসার জায়গা ছিল যথেষ্ট। ..... ভিতরের দিক থেকে ভাবগ্রহণ করবার মানসিক আধার প্রশস্ত ; কিন্তু বাইরের দিকে যে দেহরূপ আছে তার স্বাভাবিক গঠন একটা চেহারার সীমানায় বাধা, সেই সীমার মধ্যে কিছু কিছু তার বাড়া -কমা, কিছু কিছু তার অদল বদল চলতে পারে - কিন্তু আগাগোড়া রূপ বদল দেখলেই বুঝি সেটা আদর্শকে গ্রহণ করা আদর্শকে নকল করা। এ জিনিসটাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি না।" (প্রবাসী, ১৩৪৫, চৈত্রসংখ্যা)

এই পত্রখানি কবি ২৩ / ২/ ১৯৩৯ তারিখে অমিয় চক্রবর্তিকে লিখেছেন। স্বধর্মে অবস্থান করেও যুগধর্মকে কবি কিভাবে অঙ্গীকার করছেন তারই ইঙ্গিত আছে এই পত্রে। পত্রটিতে নবজাতক রচনাকালীন কবিমনোভাবের ব্যাখ্যা লক্ষ্য করা যেতে পারে।

বুদ্ধভক্তি :

'বুদ্ধভক্তি' কবিতাটি পত্রপুট গ্রন্থ বিধৃত গদ্যছন্দে লিখিত কবির একটি রচনা 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'র পুনর্লিখিত ছন্দরূপ। এই কবিতার শিরোভাগে পদ্যে কবি যে সংক্ষিপ্ত সূচনা লিখে দিয়েছেন সূত্রাকারে কবিতার বক্তব্য তাতেই বলা হয়েছে - কবিতাই ঐ সূত্রেরই কাব্য ভাষ্য বলা চলে। সূত্রটি এই -

> "জাপানের কোনো কাগজে পড়েছি, জাপানে সৈনিক যুদ্ধের সাফল্য কামনা করে বুদ্ধ মন্দিরে পূজা দিতে গিয়েছিলেন। ওরা শক্তির বাণ মারছে চীনকে, ভক্তির বান বুদ্ধকে।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

কবিতাটিতে বুদ্ধভক্তির নামে জাপানীদের শঠতার প্রতি যে শানিত বিদ্রূপ করা হয়েছে গদ্যভূমিকায় কবির সেই মনোভাবটিও আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে ধরা পড়েছে। চীনের প্রতি জাপানের নিষ্ঠুর অত্যাচার কবি হৃদয়ে কি পরিমাণে বেদনা সৃষ্টি করেছিল তার পরিচয় আছে এই কবিতায়। সেই সঙ্গে মনুষ্যত্বের অমর্যাদার ফলে বর্তমানে সমাজ ও সভ্যতার শোচনীয় রূপ কবির লেখনীতে উজ্জ্বল রেখা উটে উঠেছে। কবি মনের উৎপীড়িত যন্ত্রণার প্রকাশ এ কবিতায় -

হত আহতের গনি সংখ্যা
তালে তালে মন্ত্রিত হবে জয়ডঙ্কা।
নারীর শিশুর যত কাটা ছেড়া অঙ্গ
জাগাবে অট্টহাসে পৈশাচী রঙ্গ,
মিথ্যায় কলুষিবে জনতার বিশ্বাস,
বিষ বাষ্পের বাণে রোধি দিবে নিশ্বাস -
মুষ্ঠি উচায়ে তাই চলে
বুদ্ধেরে নিতে নিজ দলে
তূরি ভেরি বেজে ওঠে রোষে গরোগরো,
ধরাতল কেঁপে ওঠে ত্রাসে থরোথরো।

'নবজাতক' কাব্যগ্রন্থ ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্র বৈশিষ্ট্য অতিক্রম না করেও ভাষায় ও ভঙ্গিতে, ক্বচিৎ বিষয়ে, শিল্পী কবির নূতনতর পরীক্ষামূলক তার পরিচয় বহন করছে। এই কবিতাগুলিতে কবি ছন্দের ক্ষেত্রে মিল বজায় রেখেও পর্বনির্মানে অধিকতর স্বাধীনতা অবলম্বন করতে চেয়েছেন, অথবা মাত্রাবৃত্তের পঙ্‌ক্তির সঙ্গে অক্ষরমাত্রিকের পঙ্‌ক্তি মেলাতে চেয়েছেন। বুদ্ধভক্তি কবিতয় আট ছয় মাত্রার উক্ত রীতি পর্বের ব্যবহারও অবশ্যই সার্থক হয়ে উঠেছে।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
34

বুদ্ধভক্তি কবিতায় কবির উষ্মা প্রকটিত। সাম্রাজ্যলোভী জাপানের চীন আক্রমণ রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ করেছিল। জাপানের প্রতি তাঁর প্রীতি ও শ্রদ্ধা দীর্ঘকালের। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে তিনি সে শ্রদ্ধা পোষণ করতে পারছেন না। নবজাতক কাব্যে তাই তিনি এমন অনেক বিষয়ের অবতারণা করেছেন যা সম্পর্কে আগে তিনি উদাসীন ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ পর্যায়ের কাব্যে এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন যা সত্য সত্যই রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় কিন্তু আধুনিক বাংলা কাব্যে অভিনব কবির মহত্তম বক্তব্য 'নবজাতক' গ্রন্থের নাম কবিতায় উচ্চারিত

হয়েছে - 'মানবের শিশু বারে বারে আনে চির আশ্বাসবাণী।' 'নবজাতক' মানবের দিব্য সম্ভাবনাময় আবির্ভাব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রজ্জ্বলন্ত বিশ্বাসের বাণীমূর্তি। এত পাপ, অমঙ্গল, হিংসা, হলাহল সত্ত্বেও মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ - এই মৃত্যুহীন বার্তাই কবি ঐ নবজাতকের কণ্ঠে শুনতে চান। কবি নিজেও যাবার সময় হলে জীবনের সব কথা সেরে শেষ বাক্যে জয়ধ্বনি দিয়ে ঘোষণা করেছেন -

অপূর্ব শক্তির এই বিকৃতির সহস্র লক্ষণ
দেখিয়াছি চারিদিকে সারাক্ষণ,
চিরন্তন মহিমারে তবু
উপহাস করি নাই কভু।

টিপ্পনী

সহায়ক গ্রন্থাবলী :

১। রবীন্দ্র সৃষ্টি সমীক্ষা - ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২। রবীন্দ্র সরণি - শ্রী প্রমথনাথ বিশী

৩। রবীন্দ্র জীবনী - শ্রী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

৪। রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা - ড. নীহাররঞ্জন রায়

৫। রবীন্দ্রনাথ - শ্রী সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

৬। রবীন্দ্র কবিতাশতক - জগদীশ ভট্টাচার্য্য

৭। রবীন্দ্রকাব্য পরিক্রমা - অজিতকুমার চক্রবর্তী

৮। রবিরশ্মি - চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৯। রবীন্দ্র কাব্যন প্রবাহ - প্রমথনাথ বিশী

১০। রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয় - ড. ক্ষুদিরাম দাস

প্রশ্নাবলী :

১। 'বলাকা' কাব্যের নামকরণের সার্থকতা আলোচনা কর।

২। 'বলাকা' কাব্যের ছন্দ সম্পর্কে আলোচনা কর।

৩। বের্গসঁর গতিবাদকে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে কাব্যে রূপান্তরিত করেছেন এবং তার সঙ্গে নিজের মৌলিক ভাবনার পরিচয় দিয়েছে বলাকা কাব্যগ্রন্থ অবলম্বনে

আলোচনা কর।

৪। গতিবাদ বলাকা কাব্যের মুলকথা - কয়েকটি কবিতা অবলম্বনে এই গতিবাদের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৫। 'বলা'র ৩৯ সংখ্যক কবিতার প্রেক্ষাপট বিচার করে কবিতাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

টিপ্পনী

৬। 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থের নামকরণের সার্থকতা আলোচনা কর।

৭। রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুলির মধ্যে পূরবীর স্থানটি পর্যালোচনা কর।

৮। 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থের ছন্দের অভিনবত্ব আলোচনা কর।

৯। 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের পরিণত কবি মনের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা বিশ্লেষণ কর।

১০। 'তপোভঙ্গ' কবিতার মূল বক্তব্য আলোচনা কর।

১১। 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থের নামকরণের সার্থকতা আলোচনা কর।

১২। মহুয়া কাব্যগ্রন্থের ছন্দ বিষয়ে আলোচনা কর।

১৩। 'সবলা; কবিতার ভাববস্তু বিশেষণ কর।

১৪। নারী প্রগতির যে ভাবনা 'সবলা' কবিতায় ফুটে উঠে তা আলোচনা কর।

১৫। মহুয়া কাব্যগ্রন্থের অন্যান্য কবিতার মধ্যে 'সবলা; কবিতাটি বিক্ষিপ্ত যুক্তি সহ বুঝিয়ে দাও।

১৬। রবীন্দ্রনাথের পুনশ্চ কাব্যেদর শিল্পপ্রকরণের অভিনবত্ব সম্পর্কে আলোচনা কর।

১৭। 'পুনশ্চ' গদ্য কবিতার প্রকরণ আলোচনা কর।

১৮। গদ্যকাব্যে 'যেভাবে ভাষার গান আর যেখানে ভাষার গৃহস্থালি' সেখানেই 'পুনশ্চ'র গদ্যকবিতার শিল্প সফলতা। পঠিত যথোপযুক্ত কবিতা অবলম্বনে আলোচনা কর।

১৯। 'চিররূপের বাণী' কবিতাটির নামকরণের সার্থকতা আলোচনা কর।

২০। 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের 'চিররূপের বাণী' কবিতার ভাববস্তু বিশ্লেষণ কর।

২১। 'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থ রচনাদর প্রেক্ষাপট আলোচনা কর।

২২। 'শ্যামলী' কাব্যের ছন্দের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

২৩। 'হঠাৎ দেখা' কবিতার নামকরণের সার্থকতা বিচার কর।

২৪ । 'হঠাৎ দেখা' কবিতার আখ্যানধর্মীতা কি কাব্যের মাধুর্য ক্ষুন্ন করেছে - আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও।

২৫। 'হঠাৎ দেখা' কবিতায় রোমান্টিকতা ও আধুনিকতার যে মেলবন্ধন ঘটেছে তা আলোচনা কর।

২৬। 'প্রান্তিক' কাব্যের প্রেক্ষাপট আলোচনা কর।

২৭। 'প্রান্তিক' কাব্যের নামকরণেদর মসার্থকতা বিচার কর।

২৮। কবির বাস্তবতাবোধ কিভাবে এ জকাব্যে ফুটে উঠেছে আলোচনা কর।

২৯। প্রান্তিক কাব্যের শেষ অর্থাৎ ১৮ সংখ্যক কবিতার বিষয়বস্তু বিবৃত কর।

৩০। 'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে নিশ্বাস' কবিতায় কবির মনোভাবটি আলোচনা কর।

৩১। 'নবজাতক' কাব্যের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ কর।

৩২। শেষ পর্যায়ের কাব্যগ্রন্থের মধ্যে নবজাতকেদর অবস্থান আলোচনা কর।

৩৩। নবজাতক কাব্যেদর নামকরণের সার্থকতা আলোচনা কর।

৩৪ । 'বুদ্ধভক্তি' কবিতার প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে কবির যুদ্ধবিরোধী মনোভাবের পরিচয়টি আলোচনা কর।

৩৫ । 'বুদ্ধভক্তি' কবিতায় কবির যে তির্যক দৃষ্টিভঙ্গিটি প্রকাশিত হয়েছে তা আলোচনা কর।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

(খ) কাব্যসঙ্গীত

গীতাঞ্জলী, গীতিমাল্য

গীতাঞ্জলি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন - "অল্প সময়ের ব্যবধানে যে সমস্ত গান পরে পরে রচিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে একটি ভাবের ঐক্য থাকা সম্ভবপর।" কবির এই উক্তি অনুসরণ করে গীতাঞ্জলি - গীতিমাল্য-গীতালি কে ভাবের ঐক্যে একই কাব্যগ্রন্থ বলে সমালোচকরা মনস্থ করেন। কবির গভীর ঈশ্বর প্রেমের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় বিধৃত হয়েছে এই তিনকাব্য গ্রন্থে। বৈষ্ণব পরিভাষা ব্যবহার করে বলা যেতে পারে গীতাঞ্জলিতে ঈশ্বরের উদ্দেষ্যে কবির অভিসার। ও তার সঙ্গে কবির মিলন, গীতিমাল্যে বিরহ, গীতালিতে ভাবসম্মিলন। ১৯০৮ থেকে ১৯১৪ এই ছয়সাত বছর ঈশ্বর প্রেমে মগ্ন হয়ে কবি তাঁর গানে যে কথা বলেছেন গদ্যে তার ব্যাখ্যা কমই করেছেন। এই তিনখানি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে গীতাঞ্জলি সম্পর্কেই তাঁর অল্পস্বল্প মন্তব্য পাওয়া যায়, তাও আবার ইংরেজি গীতাঞ্জলি ও তারই সূত্রে নোবেল পুরস্কার সম্পর্কে। এই কাব্য রচনার প্রেরণা সম্পর্কে কবিপ্রায় নীরব। এর কারণ হয় তো এই গীতাঞ্জলী পর্বের কাব্যে কবির যে বিশেষ উপলব্ধি যে নিগূঢ় অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে ব্যাখ্যা দিয়ে তা বোঝানো সম্ভব নয় - কাব্যের মধ্যেই আছে সেই উপলব্ধির পরিচয়। অবশ্য তত্ত্বাকারে এই উপলব্ধির কথা শান্তিনিকেতন উপদেশমালায় কবি কিছু বিবৃত করেছেন। শান্তিনিকেতন প্রবন্ধাবলীর সাহায্যে কবির সাধন জীবনের অনেক তত্ত্ব ও তথ্য জানা সম্ভব। গীতাঞ্জলি পর্বের কাব্যের কবির অনুভূতি সাধকোচিত - কবি ও সাধক এই পর্বে এক হয়ে গেছেন - কবি সাধক রবীন্দ্রনাথের অনুভূতির কথা সমালোচক কবি রবীন্দ্রনাথ অতি অল্পই বলাকাকাব্য পরিক্রমার গ্রন্থভূমিকা ক্ষিতিমোহন যেন জানাচ্ছেন - 'ইংরেজি গীতাঞ্জলি প্রকাশীত হলে যখন পাশ্চাত্য একদল ধর্ম ব্যবসায়ী বলতে প্রবৃত্ত হলেন, এইসব কথা খ্রীষ্ট ধর্মেরই প্রভাবে লেখা, তখন আমাদের দেশের বহু লোক, সেই কথা আরও জোরে প্রতিধ্বনিত করতে প্রবৃত্ত হলেন।" আর তখন কবিকে বাধ্য হয়ে 'কবীরের অনুবাদ করে দেখাতে হল এই জাতীয় চিন্তা করতে ইংরাজ আমলেই আসেনি। এই সব চিন্তা তারও পূর্বে এই দেশে ছিল, কবীরের মধ্যেও ছিল। কবীরের পূর্বেও ছিল।"

গীতাঞ্জলির রচনাগুলি গানও বটে, কবিতাও বটে। দুটি ছাড়া সবগুলি রচনাই সাধারণ গানের মত বহরে ছোট। তবে কোনটিই ঠিক গানের লেখা। বাকি প্রায় সবগুলিতেই ক্রমে ক্রমে সুর দেওয়া হয়েছিল ; একমন কি বড় কবিতা দুটিতেও। নৈবেদ্যের যে ভক্তিরসের পরিচয় পেয়েছিলাম ঠিক সে বস্তুটি ও গীতাঞ্জলিতে নেই। কবি বুঝেছেন যে তার অন্তরতম সাধনা স্বস্তির নয় আত্মোপলব্ধির আনন্দের। সংসারে

টিপ্পনী

তাঁর প্রধান কাজই আনন্দের ফুল তুলে তুলে বেছে মালা গাঁথা।

জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রন।....

তোমার যজ্ঞে দিয়েছ ভার

বাজাই আমি বাঁশি

গানে গানে গেঁথে বেড়াই

প্রাণের কান্না হাসি। (৪৫)

আনন্দের ফুল তো নয় স্ফুলিঙ্গ, চকিতে দেখা দিয়ে মিলায়, তবুও তাহা দুর্লভ নয় । যাঁর উদ্দেশে গীতাঞ্জলি তিনি "নিভৃত প্রাণেদর দেবতা', তিনি জীবনদেবতা এবং তিনিই অন্তর্যামী, তিনি চপূজ্য এবং তিনিই পূজারী।

নিভৃত প্রাণের দেবতা

যেখানে জাগেন একা

ভক্ত, সেথায় খোল দ্বার,

তখন জীবনের আলোতে

জীবন প্রদীপ জ্বালি

হে পূজারী, আজ নিভৃতে

সাজাব আমার থালি। (৫১)

অখন্ড প্রাণ-সত্ত্ব (জীবনদেবতা) খন্ড জীবন -সত্তার (অন্তর্যামী) দ্বারা ভঙ্গুর জীবজীবনে আনন্দ অনুভব করেন।

হে মোর দেবতা, ভরিয়া এদেহ প্রাণ

কি অমৃত তুমি করিবারে চাহ পান ? (১০২)

কবি উপলব্ধি করেছেন -

আমার মাঝে তোমার লীলা হবে

তাই তো আমি এসেছি এই ভাবে। (১৩১)

এই বোধ অন্তরে অনির্বচনীয় নবীনতা আনিয়া দিল। তার ফলে -

পুরাতন ভাষা মরে এল যবে মুখে

টিপ্পনী

নব গান হবে গুমরি উঠিল বুকে। (১২৫)

গীতাঞ্জলিতে এই নব গানেদর রাগিনী গুঞ্জরিত।

কয়েকটি গানে তত্ত্বদৃষ্টি প্রখর। এতে জীবনসাধনার যে মর্মকথাটি প্রকাশ পেয়েছে তাতে আমাদের দেশের পূর্বতন অধ্যাত্মচিন্তার অনুসরণ আছে। জীবনের সহজ অনুভূতির মধ্যেই যে পরম উপলব্ধির ঝলক তা বৈষ্ণব - বাউল - সহজিয়া - সুফি - মরমিয়া সাধনার সাধারণ মৌলিক তত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথের বাণীতে এই তত্ত্বের মীমাংসা।

রূপসাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপরতণ আশা করি

রূপের মধ্যে অরূপের সাধনা কবিরও। রূপরসের পেয়ালাতেই সে সাধনার পুষ্টি।

অরূপ, তোমার রূপের লীলায়
জাগেদর হৃদয়পুর
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
এমন সুমধুর।

গীতাঞ্জলিতে কবির আশঙ্কা -

জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ-ওগান-বাজে,
সে গান কবে গভীর রবে বাজিবে হিয়া মাঝে।
বাতাস হল আকাশ আলো
সবারে কবে বাসিব ভালো,
হৃদয়সভা জুড়িয়া তারা বসিবে নানা সাজে। (১৬)

কবিসত্তার জীবধর্মের আকুতি -

নম্রশিরে সুখের দিনে
তোমারি মুখ লইব চিনে
দুঃখের রাতে নিখিল ধরা
যেদিন করে বঞ্চনা
তোমারে যেন না করি সংশয়। (৪)

টিপ্পনী

টিপ্পনী

বহিঃপ্রকৃতির রূপও কবিচেতনাকে দুই টানে টানিয়াছে, নির্ভাবনেও সংজীবন। নির্ভাবনে দিবালোকে শরৎসৌন্দর্য অন্তরতমের নয়ন-ভুলানো রূপ মোহ বিস্তারে অন্তর বাহির ভরিয়ে তুলেছে -

কোথায় সোনার নুপূর বাজে
বুঝি আমার হিয়ার মাঝে
সকল ভাবে, সকল কাজে
পাষান - গলা সুধা ঢেলে -
নয়ন ভুলানো এলে। (১৩)

সংজীবনে গভীর নিশীথে নক্ষত্রাবলীর নির্মিমেষ নেত্রে, শ্রাবণের অবিশ্রান্ত বারিধারায় মানবসংসারের দুঃখসুখে এবং নিজের আশা নিরাশয়, অন্তরতমেরই বিরহের অবোধ বেদনা স্পন্দিত।

হেরি অহরহ তোমারি বিরহ
ভুবনে ভুবনে রাজে হে। (২৫)

গীতাঞ্জলী-গীতিমাল্য-গীতালির কোন কোন গানে অনেক আগেকার ব্যবহৃত রূপকের নূতন এবং ভাবোচিত রূপান্তর লক্ষিত হয়। সোনার তরী কবিতাটির সঙ্গে গীতাঞ্জলির ৭০ সংখ্যক গান তুলনা করলে একথা সহজে বোঝা যাবে। সোনার-তরী কান্ডারী ফসল বোঝাই করে নিয়েছিলেন কিন্তু কবিকে উপেক্ষা করেছিলেন, কেননা তখন সময় হয় নি। এখন সময় হয়েছে, কিন্তু কবি এখন নিজের বোঝা এনে জড় করতেই ব্যস্ত -

ঐ যে তরী দিল খুলে
তোর বোঝা কে নেবে তুলে।.....
ঘরের বোঝা টেনে টেনে
পারের ঘাটে রাখলি এননে
তাই যে তোরে বারে বারে
ফিরতে হল গেলি ভুলে।

গীতাঞ্জলির ভাবধারায় ভারতীয় পূর্বসূরীদের প্রভাবের কথা কবি নিজেই বলেছেন। গীতাঞ্জলির ইংরাজী অনুবাদের কথা কবির মুখে শোনা যেতে পারে। ৬ই

মে ১৯১৩ ইংলন্ড থেকে ইন্দিরা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি গীতাঞ্জলির জন্মবৃত্তান্ত জানাচ্ছেন -

> "গীতাঞ্জলির ইংরেজি তর্জমার কথা লিখেছিস। ওটা যে কেমন করে লিখলুম এবং কেমন করে লোকের এত ভাল লেগে গেল, সে কথা আমি আজ পর্যন্ত ভেবেই পেলুম না। ..... গেল বারে (মার্চ, ১৯১২) যখন জাহাজে চড়বার বিষম তাড়ায় যাত্রা বন্ধ হয়ে গেল, তখন শিলাইদহে বিশ্রাম করতে গেলুম। কিন্তু মস্তিস্ক ষোলো আনা সবল না থাকলে একেবারে বিশ্রাম করবার মত জোর পাওয়া যায় না, তাই অগত্যা মনটাকে শান্ত রাখবার জন্য একটা অনাবশ্যক কাজ হাতে নেওয়া গেল। ..... কোমর বেঁধে কিছু লেখবার মত বল আমার ছিল না। সেইজন্য ঐ গীতাঞ্জলির কবিতাগুলি নিয়ে একটি একটি করে ইংরেজিতে তর্জমা করতে বসে গেলুমম। .... একটি ছোট্ট খাতা ভরে এল। এইটি প্যাকেটবে করে নিয়ে জাহাজে চড়লুম (২৭মে, ১৯১২)। পকেটে করে নেবার মানে হচ্ছে এই যে, ভাবলুম সমুদ্রের মধ্যে মনটি যখনি উসখুস করে উঠিবে তখন ডেক চেয়ারে হেলান দিয়ে আবার একটি দুটি করে তর্জমা করতে বসব। ঘটলও তাই। এক খাতা ছাপিয়ে আর এক খাতায় পৌঁছন গেল। রোটেনস্টাইন (যাঁকে ইংরেজি গীতাঞ্জলির উৎসর্গ করা হয়েছে)। আমার কবিযশের আভাস পূর্বেই আর একজন ভারতবর্ষীদের (অজিত চক্রবর্তী অনূদিত রবীন্দ্র কবিতা কলকাতার বন্ধু মারফৎ সংগ্রহ করে) কাছে পেয়েছিলেন। তিনি যখন কথাপ্রসঙ্গে আমার কবিতার নমুনা পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, আমি কুন্ঠিত মনে তাঁর হাতে আমার খাতাটি সর্ম্পণ করলুম। তিনি যে অভিমত প্রকাশ করলেন সেটা আমি বিশ্বাস করতে পারলুম না। তখন তিনি য়েটসের কাছে আমার খাতা (আসলে খাতার তিনটি কপি করে তিনি stopford Brooke Bradley এবং Yeates কে) পাঠিয়ে দিলেন। তারপর কি হল সে ইতিহাস তোদের জানা আছে।"

গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ সম্পর্কে এই চিঠিকে এবং আরও কয়েকখানি চিঠিপত্রে কবির যে অভিমত প্রকাশিত হয়েছে তা রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ বিনয়ের প্রকাশক বলছে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্র মিত্র 'ইংরেজি গীতাঞ্জলি ও ডব্লু বি. য়েটস নামক এক দীর্ঘ প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। গীতাঞ্জলীর অনুবাদ যে রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃত অনুসারে দুর্বল মস্তিষ্কের সৃষ্টি নয় তার অজস্র প্রমাণ আছে - এই অনুবাদকর্মে কমবির

ইংরেজির বিশেষ দোষত্রুটি স্বয়ং য়েটসও বের করতে পারেন নি। তিনি বলেছেন - "এই অনুবাদের কোনো কথা বদল করে মার্জিত করিয়া তুলিতে পারা যায় যদি কেহ এমন কথা বললে তবে সে সাহিত্য কি তাহা জানে না। "রোদেনস্টাইনের উচ্চ প্রশংসার কথা কবি নিজেই উল্লেখ করেছেন। রোদেনস্টাইন বলেছিলেন -

টিপ্পনী

> "Here was poetry of a new order, which seened to me on a level with that of the great mystics."

তাঁর এই প্রশংসাসূচক উক্তি থেকে একটা সিদ্ধান্তে আমরা সহজেই আসতে পারি তা হলম - গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ সম্পর্কে কবি নিজেই কিছু অবমূল্যায়ন করেছেন ও এই গ্রন্থকে কেন্দ্র করে তাঁর খ্যাতির যে ইতিহাস কবি নিজে দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ নয় এবং ভ্রমপ্রসাদহীন নয়। কোনোও রকম বাহাদুরি কনরার দুরাশায় কবি হয়তো এই অনুবাদ কর্মে হাত দেন নি, কিন্তু পঞ্চাশৎ বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে দেশে বিশেষভাবে সম্বনর্ধিত হওয়াআর পর বিদেশেদর সাহিত্য সভায় নিজের আসন কোথায় এই তথ্যটুকু জানার একটা ইচ্ছা কবির মনে হয়েছিল কিনা কে নিশ্চয় করে বলতে পারে ? বিদেশী কিছূ রসজ ব্যাক্তির দ্বারা উৎসাহিত হয়ে বিদেশী সাহিত্যের বাজারে নিজের স্থানটি ওবুঝে নিতে চাইলেন তাই গীতাঞ্জলি প্রভৃতি কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থের কিছু কবিতার অনুবাদ কর্মে কবি আত্মনিয়োগ করেছেন একথা বললে খুব অযৌক্তিক হবে না। কবির নিজের একখানি পত্রেই এই অনুমাণের সমর্থন মিলবে। এই পত্রখানি নোবেল পুরস্কার পাওয়ার আগেই ভক্ত অজিত চক্রবর্তীকে লেখা। ১৩ই মার্চ ১৯১৩ সালে ইলিয়ন থেকে লেখা ঐ চিঠিতে কবি লিখেছেন -

> "আসলে আমার কবিতাগুলি তর্জমা করতেই আমার সবচেয়ে ভাল লাগে। একেবারে নেশার মত চেপে ধরে। যে সব কবিতা একবার লিখেছি তাকে আর এক ভাষায় আবার লেখার মধ্যে খুব একটা রস পাওয়া যায়। আমার মনে হয় এ যেন বিবাহের পর বৌভাতের মত - স্বামীর সঙ্গে তো বধূর মিলন হয়েই গেছে, কিন্তু মন্ডলীর তো যোগসাধন করতে হবে। তার হাতের অন্ন যখন সকলে প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করবে তখনই বর-বধূর মিলনটা বিশ্বের ব্যাপার হয়ে উঠবে। বাংলায় যখন প্রথম কবিতা লিখলুম তখন সেটা কেবলমাত্র কবির সঙ্গে কাব্যের মিলন ঘটেছিল। অর্থাৎ তখন আমার মনের সামনে আর কোনো অভিপ্রায় স্পষ্টত জাগ্রত ছিল না। এখন যখন এগুলি ইংরেজিতে তর্জমা করতে বসেছি তখন আমার বধূর হাতের অন্ন সকলের পাতে পরিবেশন করবার জন্য ভোজের নিমন্ত্রণ করা গেছে। সুতরাং এর আনন্দ অন্যরকম। এই যজ্ঞের আয়োজনের

উৎসাহে আমার মনকে ব্যাপৃত করে রেখেছে। বারবার ঘুরে ফিরে কাঠটি, কুঠচি, মাজচি, ঘষচি - একটা যেন ধুম পড়ে গেছে। এদেশে আমার এই লেখাগুলিকে কোনোমতেই কেউ অনুবাদ বলে স্বীকার করতে চান না। ..... ইংরাজির একটা স্বতন্ত্র সৌন্দর্য এবং গৌরব আছে সেইটিকে অধিকার করে নবজন্ম লাভ করতে পারলে তবেই এ লেখাগুলি সার্থক হতে পারবে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে লিখি বলেই আমি এই রচনায় নূতন আনন্দ পাই।"

টিপ্পনী

বাংলা গীতাঞ্জলি রচনাকালে কবির মনের সামনে কোনো অভিপ্রায় জাগ্রত না থাকতে পারে কিন্তু যখন এগুলি ইংরেজিতে তর্জমা করতে বসেন তখন নিশ্চয়ই তাঁর মনের সামনে কোনো না কোনো উদ্দেশ্য জাগ্রত হয়ে ওঠে - তাঁর কবিতা বিশ্বের দরবারে স্থান পাক, তাঁর কাব্যবধূর হাতের অন্ন জগত সভায় রসিকজনের পাতে পরিবেশিত হোক এই অভিপ্রায় কবিমনে জাগ্রত হওয়াটা স্বাভাবিক নয়। চিঠিতে তিনি লিখেছেন -

"দেশের গন্ডী আমার ঘুচে গেছে সকল দেশকেই আমার হৃদয়ের মধ্যে এক দেশ করে তুলে তবে আমি ছুটি পাব। আমার নামের সঙ্গে আমার কাজের যোগ আছে, পূর্ব দিগন্তে আমার প্রথম জীবনযাত্রা আরম্ভ হয়েছে পশ্চিম দিগন্তেই আমার জীবনযাত্রার অবসান হবে।"

এই যাঁর অন্তরের বিশ্বাস তাঁর নিজের কবিতার ইংরেজি অনুবাদ কোনো উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয় এমন কথা কোন ক্রমেই মনে করা চলে না। বিশেষ করে এই অনুবাদ কার্যে কবি নিজে কি পরিমাণে যত্নবান ছিলেন তার পরিচয় তিনি নিজেই দিয়েছেন। বাংলা কবিতার ইংরেজি তর্জমা কবি ঘুরে ফিরে কাটাকুটি করে, ঘষে মেজে উজ্জল করতে চেষ্টা করেছেন - তাঁর সচেতন শিল্পকর্মের সার্থক প্রয়োগে লেখাগুলি এতদূর উজ্জলতা লাভ করেছে যে তাকে অনুবাদকর্ম না বলে সৃষ্টিকর্মই বলা চলে। ইংরেজি ভাষায় স্বতন্ত্র সৌন্দর্য ও গৌরব কবি এতদূর পর্যন্ত আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন যে বাংলা কবিতাগুলিকে ইংরেজি ভাষায় নবজন্ম দান তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয় নি। এই জন্মান্তর আকস্মিক কোন ব্যাপার নয়, কিংম্বা কবি যেমন বলেছেন, অসুস্থ মস্তিষ্কের কর্মও নয়। গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ যে মুন্সিয়ানার পরিচয় আছে তাতে সন্দেহ হয় নিজে অসুস্থতার সময় ডাক্তারের পরামর্শমত মানসিক পরিশ্রমসাধ্য কাজ থেকে কতদূর বিরত ছিলেন। ডাক্তারের উপদেশ অপেক্ষা জীবনদেবতার নির্দেশ তাঁর জীবন অধিক গুরুত্বপূর্ণ তাতে বিন্নদুমাত্র সন্দেহ নেই। কবি নিজেও উইলিয়াম পিয়ারর্সনকে লেখা একটি চিঠিতে সে ইঙ্গিতটুকু রেখে গেছেন। তিনি লিখেছিলেন -

টিপ্পনী

"যতদিন আমার গীতাঞ্জলির খাতা পূর্ণ হয় নি ততদিন আমি বারবার চেষ্টা করেও দেশ ছেড়ে বেরোতে পারিনি। ... রুগ্ন শরীর নিয়ে শিলাইদহে গিয়ে চৈত্রমাসের বসন্ত বাতাসে জানি না কি মনে করে গীতাঞ্জলীর কবিতা ইংরেজিতে তর্জমা করতে বসলুম। আমের মুকুলে আমার বাগানের গাছ যেমন ভরে উঠতে লাগল আমার ছোট খাতাটিও তেমনি পূর্ণ হবে উঠল। য়ুরোপে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না এই কথাটি স্থির হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যখন যাব মনে করেছিলুম - তখন আমাকে যেতে দিলেন না - আর যখন যাব না মনে করে স্থির হয়ে বসেছিলুম তখন যাবার আয়োজন মুহূর্তে প্রস্তুত হয়ে গেল - কোনোদিক থেকে কোনো বাধা এল না। কেন এমন হল ? যাঁকে আমি গীতাঞ্জলি নিবেদন করেছিলুম তিনি সেই পূজা তাঁর পূর্বদিকের হাত দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন আবার সেই পূজা তিনি তাঁর পশ্চিমদিকের হাত দিয়ে গ্রহণ করবার জন্য হাত বাড়িয়েছিলেন। সেইজন্যই পূজার অর্ঘ্য হাতে করে আমাকে সমুদ্র পারে আসতে হল। এর থেকেই আমি জানতে পেরেছি আমার পশ্চিম দেশে ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছে। তিনি এবার তাঁর কবিকে তাঁর পশ্চিম বাতায়নের নীচে দাঁড়িয়ে গান গাইবার হুকুম করেছেন। তাঁর সূর্য যেমন আলোকের অঞ্জলি নিয়ে পূর্ব সমুদ্রতীরে বন্দনা আরম্ভ করে এবং পশ্চিম সমুদ্রতীরে বন্দনা সমাপন করে তাঁর কবিকে দিয়ে তেমনি তিনি পূর্বদিকের গানগুলিকে আজ পশ্চিমদিকে আহরণ করালেন - আমার সঙ্গীতের উদয়াস্ত আজ সমাধা হল।"

সুতরাং বাংলা গীতাঞ্জলির মত ইংরেজি গীতাঞ্জলিও কবির জীবনদেবতারই রচনা ; তাই কবিতাগুলির শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে কবি নিজেও স্থির - নিশ্চয়। অবশ্য কি বাংলা আর কি ইংরেজি গীতাঞ্জলি - উভয়ের শ্রেষ্ঠত্বের মূলে সাহিত্যিক কারণটিকেই কবি যথেষ্ট বলে বিবেচনা করেন নি। গীতাঞ্জলির উৎকর্ষের মূলে আর একটি ব্যাক্তিগত কারণকেও কবি বড় করে দেখাতে চেয়েছেন - কবির ধারণা এই কারণের গীতাঞ্জলি বিশুদ্ধ গীতিকবিতা হয়ে উঠে সকলের কাছে এত সমাদৃত হয়েছে। কবি অজিত চক্রবর্তীকে একটি চিঠিতে লিখেছেন -

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
46

"আমি কতবার মনে করেছি এবং তোমাদেরও বলেছি, বাংলা ভাষাতেও এগুলোও ঠিক সাহিত্যের মধ্যে গণ্য হবার যোগ্য নয় - এ কেবল মাত্র আমার নিজের মনের কথা, আমারি প্রয়োজনে লেখা - নিতান্তই নিরলঙ্কার এখন মনে হচ্ছে কেবলমাত্র নিজের জন্য লিখলেই সেটা যথার্থ সকলের জন্য লেখা হয় - এবং অলঙ্কারটা

বাদ দিলেই মূল্যটা বেড়ে ওঠে। দেখতে পাচ্ছি গীতাঞ্জলি তাঁকে দেওয়া হয়েছিল বলেই সকলকে দেওয়া হয়েছে।"

সাহিত্য সম্পর্কে কবি সমালোচকের এই উক্তির বিপরীত উক্তি তাঁর সাহিত্যবিচার মূলকম প্রবন্ধে দুর্লভ নয় কিন্তু নৈবদ্যের মত গীতাঞ্জলিকেও কবি বিশুদ্ধ সাহিত্য হিসাবে দেখেন নি, তাই এর সাহিত্যমূল্য বিচার না করে কবি এর মর্মকথারই অনুসন্ধান করেছেন। এই পত্রের উপসংহারে কবি এ কবিতাগুলি সম্পর্কে তার মতামত এইভাবে ব্যক্ত করেছেন -

"এই কবিতাগুলি আমি লিখব বলে লিখিনি - এ আমার জীবনের ভিতরকার জিনিষ - এ আমার সত্যকার আত্মনিবেদন - এর মধ্যে আমার জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখ সমস্ত সাধনা বিগলিত হয়ে আপনি আকার ধারণ করেছে।"

গীতাঞ্জলি এই কারণে শুধুমাত্র গীতিকবিতা না হয়ে গাণের অঞ্জলিতে পরিণত হয়েছে। কবি রবীন্দ্রনাথ এখানে নিছক কবি মাত্র না থেকে ভক্ত কবিসাধকে পরিণত হয়েছেন। আমাদের দেশের বৈষ্ণব ও শাক্ত কবি-সাধকদের মতো কিংবা বিদেশে সেন্টজন ও অন্যান্য খ্রীষ্ট্রিয় মরমিয়া কবি ও সাধকদের মতোই কবির আত্মনিবেদন এখানে গানের মধ্য দিয়েই বিগলিত হয়েছে। সম্পূর্ণ অহংলয় এমনকি কবি ব্যাক্তিত্বকে পর্যন্ত ঈশ্বরের পদে সমর্পণ করে নিরলঙ্কৃত ভাষায় কবি আপনার অন্তরের কথাগুলি বলেছেন। কবির সেই আত্মনিবেদনের শুধু এদেশেই নয় বিদেশেও ভক্তচিত্তকে সহজেই স্পর্শ করেছিল। Stapford Brooke এর এক পত্রে সেই স্বীকৃতি আছে। কবি নিজেই সেই পত্রখানি অজিত চক্রবর্তীকে পাঠিয়ে দিয়ে উক্ত পত্র সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন -

"আমি নানা লোকের কাছ থেকে প্রশংসা পাচ্ছি কিন্তু বৃদ্ধের এই চিঠিখানি আমি ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করেছি। এইরকম উৎসাহ বাণীতে নিজের ভিতরকার যেটা সবচেয়ে ভাল সেইটেকে জাগ্রত করে তোলে। নিজেকে সত্যভাবে এবং ঠিক জায়গায় শ্রদ্ধা করতে না পারলে নিজের মঙ্গল হয় না। ব্রুকের চিঠিখানি পড়ে আমার মনে এই কথাটি বাজতে লাগল যে, আমার জীবনে অন্ততঃ একটা জায়গায় সত্যের প্রকাশ হয়েছে - আমার কবিতা যদি ভদ্রলোকের জীবনের অবলম্বন হয়ে থাকে তবে সে ত ফাঁকি দিয়ে হতে পারে না। সে ত কেবল রচনা নৈপুণ্য নয় - আমার জীবনের কোনো একটা তার আমার ওস্তাত নিজের হাতে সুর মিলিয়ে বেঁধে দিয়েছেন নইলে এমন হবে কেন ? সেই সুরটিকে ত আর নাবাতে

টিপ্পনী

দিতে পারব না - সেইটির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে একে একে আমার সব তারগুলিকে খাঁটি করে বেঁধে নিতেই হবে - কোনো তারে ঢিল দিলে চলবে না।"

কবির ভক্ত অজিত চক্রবর্তীও গীতাঞ্জলির এই ভক্তিপূর্ণ সমালোচনার প্রশংসা করে পত্রোত্তরে কবিকে জানিয়েছিলেন -

টিপ্পনী

"যথার্থ ভক্ত যেমকন কাব্যকে জীবনের জিনিস করে নেন - তাঁরা যে জায়গা থেকে তার রসটি পান - এমন শুদ্ধ মাত্র লিটারেরি লোক পান না। কাব্য as কাব্য যতই তার দর থাকুক - সে যদি জীবনকে কোন জায়গায় আশ্রয় না দেয় শান্তি না দেয় তবে তার বাইরের চাকচিক্য দীর্ঘকাল মানুষের ভাল লাগতেই পারে না।"

বলা বাহুল্য কবি ও তাঁর ভক্ত উভয়েই এখানে গীতাঞ্জলির কাব্যরস অপেক্ষা ভক্তিরসের উপরেই বেশী জোর দিয়েছেন - একে যথার্থ অর্থে কাব্য সমালোচনা এমনকি কাব্য ব্যাখ্যাও বলা সঙ্গত হবে না। কাব্য সম্পর্কে সমালোচকের মূল্যায়নের মনোভাব নয়, এখানে ভাবুক ভক্তের অন্তরের গভীর আবেগটাই প্রাধান্য লাভ করেছে। নাহলে কবি রবীন্দ্রনাথের মতো বিচিত্রের দূত একমাত্র ভক্তিভাবের সুরে জীবনবীণার সকল তার বাঁধতে চাইবেন কেন গীতাঞ্জলির সুর - তা সে যত উঁচু সুর হোক না কেন সেই এক সুরে রবীন্দ্রকাব্য বীণা যে চিরকাল বাজেনি, বাজতে পারে না একথা আমাদের চেয়ে কবির বোধ করি বেশী করে জানা ছিল। তবু গীতাঞ্জলীর কাব্যরচনার প্রায় সমকালীন উক্ত কাব্য ব্যাখ্যায় ভক্ত কবি রবীন্দ্রনাথের মনে ভক্তিভাবনার প্রাবল্য ঘটেছিল একথা স্বীকার করতেই হবে। গীতাঞ্জলি ও ঈশ্বরভাবে পূর্ণ হলেও, কবির অনুভূতির সার্থক বাণীরূপ ওলাভ করেই এই গাণগুলি - কবিতা হিসাবে রসোত্তীর্ণ হয়েছে। ওসুতরাং ভক্তিকাব্য হিসাবে এর মূল্য থাকলেও ভক্তিকাব্য কাব্য হয়ে উঠেছে কোন গুণে কাব্য ব্যাখ্যা বা সমালোচনা কালে তাই দেখা প্রয়োজন। অবশ্য একথাও সত্য নিছক কাব্য হিসাবে গীতঞ্জলীর কাব্যমূল্য বিচার্য হতে পারে না। কাব্যরস ও ভক্তিরস এই উভয় দিক থেকেই তার কাব্যমূল্য বিচার করতে হবে তবেই একাব্যের পূর্ণ রসাস্বাদন সম্ভব হবে। গীতাঞ্জলির কবির অনুভূতির কিছু পরিমাণে শরিক হতে পারলে তবেই এর রসাস্বাদ সম্ভব হবে, না হলে এই কাব্যপাঠ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ব্রুকের মতো appreciation - এর শক্তি যে পাঠকের আছে তিনি এদের ভক্তিরসের দিকটি উপলব্ধি করবেন কিন্তু কাব্যরসের দিকটা পুরোপুরি তার উপলব্ধির পক্ষে অসুবিধা হতে পারে - কিন্তু যিনি ভক্তিরসের দিকটা উপপেক্ষা করে এর কাব্যরস বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করবেন তিনি আরও বেশী অসুবিধার সম্মুখীন হবেন। কবি নিজে এই কথাটি বুঝেছিলেন বলেই এই কাব্য

ব্যাখ্যার তেমন চেষ্ঠা করেন নি, না হলে গীতাঞ্জলির সমকালীন 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধমালায় গীতাঞ্জলির ভাবধারা অনেকখানিই ধরা পড়েছে একথা কবি নিজেও বুঝেছিলেন। আমেরিকার ইলিনয় থেকে লেখা ১০ই পৌষ ১৩১৯ (ডিসেম্বর ১৯১২) এর এক পত্রে কবি অজিত চক্রবর্তীকে জানিয়েছিলেন -

> "শান্তিনিকেতনের আইডিয়ালগুলো ইংরেজি ভাষায় এদেশের লোকের সামনে উপস্থিত করলে ভালো হয়। আমারও অনেকবার একথা মনে হয়েছিল যে কেবল কবিতায় আমাদের পুরো কথাটাত এরা পাবে না কিন্তু আমার কোনদিন মনে হয়নি যে ইংরেজি গদ্যে একথা আমি প্রকাশ করতে পারব।"

কবির এই বক্তব্যের মধ্যে গীতাঞ্জলির সঙ্গে শান্তিনিকেতনের আত্মীয়তার কথা সুস্পষ্ট হয়েছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী রবীন্দ্রসরণী গ্রন্থে জানিয়েছেন -

> "শান্তিনিকেতনের ধারাবহিক উপদেশাবলীর সহিত গীতাঞ্জলির ধারাবাহিক গানের লিখিত আলোচনা হইলে পরস্পরের সাহায্যে কবির সাধনজীবন সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব জানিতে পাওয়া যাইবে আশা করা যায়।"

সমালোচকের এই অনুমান সত্য। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে আমাদের সেরূপ বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই বলে প্রাসঙ্গিক দু-একটি দৃষ্টান্ত চয়নেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকৃত 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যানে'র কোনো কোনো বক্তব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালার কোনো কোনো প্রবন্ধের মিল আছে তাই নয়, গীতাঞ্জলির কোনো কোনো গানের ও গভীর মিল লক্ষ্য করা যায়। যেমন ব্রাহ্মধর্মের দ্বিতীয় ব্যাখ্যানে 'আনন্দরূপমমৃতং' শ্লেকের ব্যাখ্যায় মহর্ষি বলেছেন -

> ভূলোক দ্যুলোক আকাশে অন্তরীক্ষে, উষাকালে সন্ধ্যাকালে, শ্রদ্ধাবান একনিষ্ঠ ধীরেরা সেই স্বপ্রকাশ আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বরকে দৃষ্টি করেন। উষার উন্মীলনের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য উদিত হইয়া যখন অচেতন প্রাণীদিগকে সচেতন করে, রূপহীন বস্তু সকলকে রূপবান করে' তখন সেই জ্যোতিষ্মান সূর্যের মধ্যে সেই প্রকাশমান স্মরণীয় পুরুষকে তাঁহারা দেখিতে পান। উষার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্তরাকাশে তাঁহার আলোক প্রকাশ পায়। তিনি সূর্যের অন্তরাত্মা, আমাদের অন্তরাত্মা সকল ভূতের আত্মরাত্মা, তিমির মুক্ত

টিপ্পনী

টিপ্পনী

জগতের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রকাশ হয়। তরুণ সূর্যকিরণে সেই জ্যোতিষ জ্যোতিকে দেখিতে পাই। উষার সৌন্দর্যে সেই সৌন্দর্যের সৌন্দর্য আমাদের নিকট প্রকাশিত হন। আমাদের নিমীলিত নয়ন মুক্ত হইবামাত্র তাহার চক্ষু আমারদের উপরে স্থাপিত দেখি। ..... "স এবাধস্তাৎ স উপরিপাৎ স পশ্চাৎ সপুরস্তাৎ সদক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ।"

তিনি অধোতে তিনি উর্ধ্বেতে, তিনি পশ্চাতে তিনি সম্মুখে, তিনি দক্ষিণে, তিনি উত্তরে। ভূলোকও দ্যুলোকে তাঁহার এই মহিমা ; তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে সর্বত্র প্রকাশ পাইতেছেন ; আমাদের কঠিন হৃদয়ের কপাট বন্ধ করিয়া রাখি বলিয়া সেই জ্যোতির জ্যোতিকে দেখিতে পাই না।"

এই ব্যাখ্যানের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের উপদেশমালার 'সৌন্দর্য' প্রবন্ধটির তুলনা করা গীতাঞ্জলির ৬ সংখ্যক গানটি -

প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোক পুলকে
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোক ভূলোকে
তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া।
দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ
মুরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ;
জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া।

এর সঙ্গে উপরি উদ্ধৃত মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম ব্যাখ্যানের তুলনা করলেই দেখা যাবে মহর্ষির ধ্যান রবীন্দ্রনাথের গানের রূপ নিয়ে কি আশ্চর্য সার্থকতা মন্ডিত হয়েছে। শান্তিনিকেতন প্রবন্ধাবলীতে মহর্ষির প্রভাব আছে কিন্তু কবির ভক্তিরসাত্মক গানে ঐ প্রভাব আরও সুগভীর। 'শান্তিনিকেতন প্রবন্ধাবলীতে কবিমানসের যে পরিচয় পাই তার আরও সার্থক রূপ গীতাঞ্জলির গানে। গীতাঞ্জলির ধ্যে ভক্ত কবির যে মন প্রকাশিত হয়েছে, আর শান্তিনিকেতনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যে মন আত্মপ্রকাশ করেছে - এদের মধ্যে রয়েছে একটা অত্যন্ত সহজও আশ্চর্য মিল। এই মিল কতটা সচেতন প্রয়াসজাত আর কতটাই বা অসচেতনভাবে গড়ে উঠেছে তা বলা শক্ত। একই চিত্তধাতুর উপকরনে গড়ে উঠেছে বলে এই দুই গ্রন্থের মধ্যে একটা মৌলিক সাদৃশ্য থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। কবির স্বীকৃতি অনুসারে এই দুই গ্রন্থের অন্তরঙ্গ যোগ রয়েছে কাব্য ও প্রবন্ধের সৃষ্টি মূলে।

গীতাঞ্জলির সঙ্গে শান্তিনিকেতন প্রবন্ধের বক্তব্যের মিল অনুসন্ধান যে দুঃসাধ্য কার্য নয় তার প্রমাণস্বরূপ আরও কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে - দুঃখের মধ্য দিয়েই দুঃখের দেবতার মঙ্গলময় আবির্ভাব ঘটে আমাদের জীবনে। দুঃখের সার্থকতা বিষয়ে কবির এই সুচির পোষিত বিশ্বাসের সমর্থন আমরা যেমন পান গীতাঞ্জলির গানে, তেমনি পাই শান্তিনিকেতন প্রবন্ধে। গীতাঞ্জলির ১২৬ সংখ্যক গানে কবি লিখেছেন -

নিন্দা দুঃখে - অপমানে
যত আঘাত পাই
তবু জানি, কিছুই সেথা
হারাবার তো কিছু নাই ।

অনুরূপ বক্তব্যই শান্তিনিকেতনের দুঃখ প্রবন্ধের নিম্নোধৃত অংশে ব্যক্ত হয়েছে -

> "পৃথিবীর নিন্দা অবিচার দুঃখ কষ্টকে যারা অবাধে অসংকোচে গ্রহণ করতে পারে তারা কেবল বলিষ্ঠ হয় তা নয় তারা নির্মল হয়। অনাবৃত জীবনের উপর জগতের পূর্ণ সংঘাত লেগে তাদের কলুষ ক্ষয় হয়ে যেতে থাকে।"

গীতাঞ্জলির ২৪ সংখ্যক গানে আছে -

যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু,
এবার এ জীবনে
তবে তোমায় আমি পাইনি যেন
সে কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই।
শয়নে স্বপনে।

শান্তিনিকেতন উপদেশমালার এক প্রবন্ধে ব্যাকুল বেদনার সঙ্গে কবি এই প্রার্থনাই করেছেন -

> "যতদিন সেই প্রেমের টান না ধরে ততদিন শান্তিতে কাজ নেই - ততদিন অশান্তিকে যেন অনুভব করতে পারি। ততদিন যেন বেদনাকে নিয়ে রাত্রে শুতে যাই এবং বেদনাকে নিয়ে সকালবেলায়

টিপ্পনী

জেগে উঠি - চোখের জলে ভাসিয়ে দাও, স্থির থাকতে দিয়ো না।"

শান্তিনিকেতনের প্রেম, দ্বিধা, সামঞ্জস্য প্রভৃতি প্রবন্ধের বক্তব্যের সঙ্গে গীতাঞ্জলির বহু গানের ভাব সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যেতে পারে । রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন উপদেশমালায় যে আত্মসমর্পনের সংকল্প উচ্চারিত হয়েছে গীতাঞ্জলির গানে সুর দিয়ে ঈশ্বরের চরণ স্পর্শ করার, চোখের জলে সকল অহংকার ডুবিয়ে দিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেমের মিলনে মিলিত হওয়ার কথাই ব্যক্ত হয়েছে । সুতরাং গীতাঞ্জলির ও শান্তিনিকেতন পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

টিপ্পনী

বস্তুত গীতাঞ্জলি পর্বের সাহিত্য জিজ্ঞাসায় কাব্যজিজ্ঞাসা ও ধর্মজিজ্ঞাসা একত্রিত হয়ে আছে । গীতাঞ্জলির গানে কাব্যজিজ্ঞাসার উত্তর আংশিক মিলনেও সম্পূর্ণ উত্তর মিলবে শান্তিনিকেতনের আধ্যাত্মজিজ্ঞাসার অনুশীলনে । আবার মনে রাখতে হবে গীতাঞ্জলি বিশুদ্ধ গীত কবিতা - গানের স্বভাব এই কবিতাগুলিতে একটু অধিক মাত্রায় বিদ্যমান । সুর ও ছন্দবাহিত হয়ে বাংলা গীতাঞ্জলির গানগুলির প্রত্যেকটি আমাদের মনে যে একটি বিশেষ আবেগ জাগায় একটা বিশেষ ব্যাকুলতার সৃষ্টি করে তা বিশুদ্ধ গীতিকবিতাতেই সম্ভব। এই আবেগ যখন ভক্তির মতো নির্দিষ্ট একটি ভাবকে আমাদের মনে জাগ্রত করে তখন রবীন্দ্র কবি - প্রতিভার মধ্যে গীতিপ্রতিভা ও ভক্তিভাবের অপূর্ব সম্বন্বয় দেখে চমকে উঠতে হয়। স্ট্যাফোর্ড ব্রুক এর মতো যারা ভক্ত ও কবি তারা গীতাঞ্জলি পাঠে কেন এত বিচলিত হবেন তার কারণ বোঝা যায়।

গীতাঞ্জলি পর্বের কবিতায় ভক্তিভাবনার সঙ্গে গীতিকবিতার লিরিক সুরের এমন আশ্চর্য মিলন ঘটেছে যে তা কেবল অনুভব করাই সম্ভব ব্যাখ্যা করে বুঝতে গেলে সেই নিবিড় অনুভূতির গভীরতা নষ্ট হয় - গীতাঞ্জলি পর্বের গানগুলি হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করলে তবেই কবির অপূর্ব সৃষ্টির রস গ্রহণ সম্ভব। গানের ভিতর দিয়ে কবি নিজে যে অপূর্ব ভুবনখানি দেখতে পেয়েছেন এবং যে ভুবনেশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ করেছেন, তার কৃতিত্ব এই যে ভাষার মধ্যদিয়েই তিনি সেই ভুবন ও ভুবনেশ্বরকে পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন । ভক্তিকাব্য হিসাবে এই অপূর্ব গানগুলি পাঠ করলে ও আমরা ঐ অপূর্ব জগতের পরিচয় পেতে পারি। টীকা ভাষ্য করে ঐ জগৎ ও জগদীশ্বরকে উপলব্ধি করানো যায় না কবি হয়তো সেই কথা ভেবেই কি গীতাঞ্জলি কি গীতিমাল্য আর কি গীতালি - এই তিনখানি গ্রন্থের কবিতার ব্যাখ্যা করার চেষ্টা থেকে বিরত হয়েছেন তবে সময় বিশেষে কোন কোন গান বা কবিতা সম্পর্কে কবির এক আধটু মন্তব্য পাওয়া যায়। গীতিমাল্যের ৩১ সংখ্যক গানে আছে -

কে নিবি গো কিনে আমায়, কে নিবি গো কিনে ?

পসরা মোর হেঁকে হেঁকে বেড়াই রাতে দিনে।

এই গান সম্পর্কে কবি সন্তোষকুমার মজুমদারকে ইলিয়ন থেকে ২৪ শে পৌষ ১৩২৯ (৮ই জানুয়ারী ১৯১৩) তারিখে লেখা একখানি পত্রে লিখেছেন -

> "আজ সকালে খামকা একটা কবিতা লিখতে ইচ্ছা হল। ধাঁ করে লিখে ফেললুম। লেখা হয়ে গেলে তারপর চেতনা হল এটা আমারই জীবনের ইতিহাস - আমার জীবনদেবতা হাস্যমুখে সেইটা লিপিবদ্ধ করেছেন। জীবনে কি রকম লাভের ব্যবসাটা যে আমি কেঁদেছি তিনি বিষয়ী লোকের কাছে সেইটি প্রকাশ করে দিয়েছেন। তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ, অনেক ঘোরাঘুরির পর শেষকালে নিঃসম্বল খরিদ্দারদের কাছে বিনামূল্যে কি রকম বিক্রিটা হল।"

এই পত্রটিতে যে ঘোরাঘুরি কথা আছে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার আগে ইংরাজ রসিকসমাজে সাহিত্যিক হিসাবে স্বীকৃতিলাভের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ মার্কিন দেশে কবিকে যে ভ্রমণ ও ভুরি পরিমাণ বক্তৃতাদান করতে হয় তার কথাই বলা হয়েছে। ২৮ শে অক্টোবর ১৯১২ নিউইয়র্ক শহরে পদার্পণ করে কবি প্রথমে আধানা, সেই জায়গা থেকে ওশিকাগো, তারপর প্রচেষ্টার এবং বষ্ঠন হয়ে পুনরায় নিউইয়র্ক আসেন এবং দেশে দেশে বক্তৃতা করে বিশ্বভারতীর জন্য অর্থসংগ্রহ করতে থাকেন। প্রয়োজনের তাড়নায় কবিকে যা করতে হয় অন্তর থেকে কবি তার সমর্থন পাচ্ছিলেন তা তাই এই উঞ্ছবৃত্তির জন্য কবি যে বেদনা বোথ করছিলেন এই কবিতায় ও উক্ত পত্রে তারই পরিচয় আছে। সত্যি সত্যিই কবিতাটিতে কবির সমকালীন জীবনের ইতিহাস লেখা হয়েছে। কবি হয়ে বিষয়ী লোকের মত অর্থকারী কাজের বিষয় বোঝা মাথায় নিয়ে ছ মাস কাল আমেরিকায় কাটাতে হয়েছে। আমেরিকা ভ্রমণ শেষে কবি আবার যখন লন্ডনে ফিরে আসেন তখন ইংরেজি গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হয়েছে এবং ইংলন্ডের পত্রপত্রিকায় তা উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। খ্যাতি যখন সর্বত্র তখনও কবির মনে একটা অশান্তির ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়। সেই কথাই ৮ই ভাদ্র, ১৩২০ সালে Cheyme walk-এ রচিত গীতমাল্যের ৩৪ সংখ্যক গানে ব্যক্ত হয়েছে -

এ মণিহার আমায় নাহি সাজে

পরতে গেলে লাগে, এরে ছিড়তে গেলে বাজে।

এই গান রচনার সমকালেই লন্ডন থেকে কন্যা মীরা দেবীকে একটি পত্রে কবি যা লিখেছেন তা থেকে কবির এই মনোভাবের কারণ স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। কবি লিখেছেন -

টিপ্পনী

"এখানকার লোকসমাজের টানাটানিতে আমার মনের ভিতরটাতে অত্যন্ত ক্লান্তি এসেছে। আমাদের দেশের জনশূন্য নিভৃত কোনটির মধ্যে কিছুদিন উপচাপ বসে থাকতে পারি তাহলে হাড়গুলো জিরয়।"

১৯১৩-র আগষ্ঠে লেখা এই চিঠির মনোভাব অক্টোবরে দেশে এসে পাল্টে গেছে - 'দেশে ফিরে এসেই পুনর্মুষিকোভব হবার লক্ষ্মণ দেখা দিচ্ছে' বলে কবি আক্ষেপ করে ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে চিঠি লিখেছিলেন।

মনের যখন এই অবস্থা কবি তখন অসংখ্যন গান রচনার মধ্যে মনের শান্তি খুঁজছিলেন, মাত্র দেড়মাসে কবি 'গীতাঞ্জলি'র ৮৩টি গান রচনা করেন। 'শান্তিস্বর্গ' খুঁজে পাওয়ার জন্য এই সময় কবি বুদ্ধগয়া যান, হরিদ্বার পর্যন্ত যাওয়ার ইচ্ছাও তাঁর ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হয়নি, গয়া থেকে কবি গেলেন এলাহাবাদে। গয়ায় যাওয়ার সময় পথে, গয়াতে এবং এলাহাবাদে গীতালির বাকি গানগুলি রচিত হয়। গীতালি সত্যসত্যই কবির গানের পূর্ণ অঞ্জলি - দেবতা ও নরদেবতা এই দুইয়ের উদ্দেশ্যে। গীতালির শেষ কবিতায় কবি যেন সেই কথাটিই জানিয়ে গেলেন -

এই তীর্থ দেবতার ধচরণীর মন্দিচর প্রাঙ্গণে
যে পূজার পুষ্পাঞ্জলি সাজাইনু সযত্ন চরণে
সায়াহ্নের শেষ আয়োজন ; যে পূর্ণ প্রণামখানি
মোর সারা জীবনের অন্তরের অনির্বাণ বাণী -
সে আমার নিবেদন তোমাদের সবার সম্মুখে
হে মোর অতিথি যত।.....
রহিল পূজায় মোর তোমাদের সবারে প্রণাম।

কবি তাঁর সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রী পরিষদ আয়োজিত জন্মোৎসব সভার অভিনন্দন বার্তার প্রতিভাষণে যে উত্তর দেন তার পরিসমাপ্তিতে নিজের সাহিত্য সাধনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে গদ্যে যে কথাগুলি বলেন গীতালির এই শেষ গানে সেই কথার রেশটুকু যেন আমাদের কানে বাজে। কারণ এই অভিভাষণে যে তাঁর যথার্থ আত্মপরিকচয় দেওয়া হয়েছে তার প্রমাণ প্রবন্ধটি সমগ্রত পরে আত্মপরিচয় গ্রন্থভুক্ত হয়েছে। এই প্রবন্ধে কবি বলেছেন -

"আমি আবাল্য অভ্যস্থ ঐকান্তিক সাহিত্য সাধনার গন্ডীকে

অতিক্রম করে একদা সেই মহামানবের উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য আমার কর্মের অর্ঘ্য আমার ত্যাগের নৈবেদ্য আহরণ করেছি তাতে বাইরের থেকে যদি বাধা পেয়ে থাকি অন্তরের থেকে পেয়েছি প্রসাদ। আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে - এখানে সর্বদেশ সর্বজাতি ও সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা - তারই বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহংকার আমার ভেদবুদ্ধি ক্ষালন করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।

টিপ্পনী

এই প্রবন্ধের শেষে কবি গীতালির উপান্ত কবিতাটি উদ্ধৃত করেন। এই কবিতার পরিসমাপ্তিতে আছে -

জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা

ধূলায় তাদেদর যত হোক হোক অবহেলা

পূর্ণের পদ-পরশ তাদের পরে।

গীতাঞ্জলির পথে নানা গানেও কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যা বলতে চেয়েছেন গীতালির শেষ দুটি কবিতায় তারই যেন সারকথাটি বলা হয়েছে।

খজেয়া ও শারদোৎসবে যে অরূপ নিসর্গাশ্রিত বিস্ময় - ব্যাকুলতার মধ্যে কবির চোখে ধরা দিলেন, তিনি গীতাঞ্জলিতে নিসর্গ এবং মানুষ দুয়েরই মধ্যবর্তী হয়ে কবির হৃদয় জুড়ে বসেছেন দেখা যায়। শারোৎসবের পর গীতাঞ্জলির গানগুলির রচনায় সময় ঐ কাব্যিক লীলাময়ের প্রকাশ দৃঢ়ত্বে ও ধ্রুবত্বে উপণীত হয়েছে এবং কবির চিত্তর তাঁর সঙ্গে একটি হার্দ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু অরূপের আশ্রয় প্রকৃতির ভূমিকা তো অপসারিত হয়ই নাই, বরং উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। রচনাবলীতে মুদ্রিত গীতাঞ্জলির একশ সাতান্নটি গীতের মধ্যে (শারদোৎসবের কয়েকটি গান সমেত) অন্তত পঁচিশটিতে অরূপানুরাগের ভূমিকারূপে প্রকৃতির বিশেষ ভাবে আবির্ভাব হয়েছে দেখা যায়। যেমন, আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়, মেঘের পরে মেঘ জমেছে ইত্যাদি। এ সবের মধ্যে শারোদোৎসবে দৃষ্ট, অরূপের আকস্মিক আবির্ভাবে উচ্ছসিত চিত্তের পর্যাকুল অবস্থাও লক্ষিত হয়। এই মনোভাবের দিক থেকে গীতাঞ্জলির সঙ্গে গীতিমাল্য এবং গীতালির কিঞ্চিৎ পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। গীতিমাল্যে অরূপ উপলব্ধিতে সিদ্ধ, রসমুগ্ধ কবি আত্মার বৈচিত্র্য এবং বিস্তারের দিকটাই বিশেষভাবে প্রকাশ্য হয়ে উঠেছে। স্পষ্ট দেখা যায়, কবি প্রকৃতিগত অরূপ চৈতন্যের বিস্ময় - ব্যাকুলতা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে নিবিড় আনন্দ চৈতণ্যেময় রাজ্যে উপস্থিত হচ্ছেন, অরূপো তত্ত্বের দিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন এবং গীতালিতে অরূপের আলোকে জীবন ও গতিকে দেখেছেন।

টিপ্পনী

গীতালিতে এসে এইটুকুই বোঝা যায় সে অতঃপর অরূপ-রস-চর্বণায় সমাহিত চিত্তে কবি অবস্থান করবেন না, জীবন ও অরূপের সমন্বয় সাধনের মধ্যেই তার মানস পরিতৃপ্ত হবে । কবির বর্তমান প্রজ্ঞান আলোকিত চিত্তের দুঃখবরণের দিকটি রবীন্দ্রকাব্যে মুখ্য স্থান পেয়ে থাকে । এরকম দুঃখানুভবের মূল হয়ত কবির বিষাদবিধুর রোমান্টিক চিত্তে , হয়ত ব্যাক্তিগত শোকদুঃখ এ বিষয়ে খানিকটা যুক্ত হয়ে পড়েছে । কিন্তু কবির অরূপ দর্শনের স্বরূপ বিচার করে সমাজনের সঙ্গে এর অনিবার্য যোগ স্বীকার করতেই হয়। যার ফলে একদিকে কবি হয়েও তাঁকে কর্মী রূপে সমাজ সংগঠনের কাজে নামতে হয়েছে। গীতাঞ্জলির ‘বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি, সে কি সহজ গান’ অথবা ‘চিরজনমের বেদনা’ প্রভৃতি গানগুলিতে এই সামাজিক দুঃখানন্দ উপলব্ধির কথাই বর্ণিত হয়েছে । উল্লিসিত দ্বিতীয় সংগীতটির শেষে দুঃখবোধ কিভাবে আনন্দে উত্তীর্ণ হচ্ছে তার আভাস দেওয়া রয়েছে, যা থেকে রসজ্ঞ পাঠক অরূপাভিমুখী কবিমানসের পরিণাম সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন -

গরজি গরজি শঙ্খ তোমার
বাজিয়া বাজিয়া উঠুক এবার
গর্ব টুটিয়া নিদ্রা ছুটিয়া জাগুচক তীব্র চেতনা।

অন্যত্র কয়েকটি কবিতায় বর্ষাঘন দুর্যোগময় রাত্রির পরিবেশে কবিচিত্তের অরূপ ব্যাকুলতা বর্ণিত হয়েছে। যেমন -

গগনতল গিয়েছে মেঘে ভরি,
বাদল-জল পড়িছে ঝরি ঝরি
এ ঘোর রাতে কিসেদর লাগি
পরাণ মম সহসা জাগি
এমন কেন করিছে মরি মরি

এই সুখদুঃখাতীত আনন্দত্মক বিহ্বলাবস্থা -

অন্তরে আজ কী কলরোল
দ্বারে দ্বারে ভাঙল আগল
হৃদয় মাঝে জাগল পাগল আজি ভাদরে

কবির অরূপ কেবল নৈসর্গিক মাধুর্যে প্রকাশিত নয়, সমাজ বিপ্লবের মধ্যেও সমভাবে ক্রিয়াশীল এই দৃষ্টিভঙ্গি কবির রচনায় সর্বত্রই প্রকাশিত । এই অরূপ

তথাকথিত গতানুগতিক পাপপুণ্যের বিচারক অথবা good and kinjd to all নয়, ইনি সর্বনাশেও দেবতা, বিপ্লবের মধ্য দিয়ে মানুষের পরিত্রাতা। এইজন্য গীতাঞ্জলির 'অপমান' এর মত প্রত্যক্ষ সমাজ-সম্পর্কিত কবিতায়ও 'বিধাতার রুদ্ররোষে দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে' ইত্যাদিতে এই বিশিষ্ট বিধাতাকে আহ্বাণ করা কবির অসংগত মনে হয়নি।

গীতাঞ্জলির নিসর্গ সন্দর্শন তথা বিস্মিত অরূপ - সন্দর্শন মুহূর্তের একটিন গানে নভোবিজ্ঞান - বর্ণিত মহাকাশ ও মহাকাশ ধৃত পৃথিবীর সৃষ্টি ও ধ্বংসের নিয়মানুগ ছন্দকে নির্বিকারভাবে বরনের উৎসাহ বিবৃত হয়েছে -

পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দে রে

এই খসে যাবার ভেসে যাবার ভাঙবারই আনন্দে রে ...

মরণ বীণায় কী সুর বাজে তপন - তারা-চন্দ্রে-রে।

সুতরাং বলা যায় যে অরূপ অনন্ত বিষয়ে কবির ধাচরণা স্বোপার্জিত, এ অনন্তের প্রকৃতি অভিনব, পূর্বেকার কোনো তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত নয়। এই বিজ্ঞান-নির্ভর অনন্তের ধারণা গীতালি-বলাকা অতিক্রম করে পূরবীর সময়কার নটরাজ-লীলা-দর্শন পর্যন্ত প্রসারিত।

এইভাবে মানবিক ও নৈসর্গিক লীলার মধ্যে লীলাময়ের আগমণ সংকেত অন্য কোন দেশীয় ও বিদেশী কবির অনুভূতিতে এমন সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে আমরা জানি না। রবীন্দ্রপ্রতিভার এই একান্ত মৌলিক স্থির পরিণামী সত্তাটি অর্থাৎ নিসর্গ - প্রকৃতি থেকে ক্রমে মানব সমাজে অনুপ্রবেশের ধারটি আমাদের দৃষ্টির অগোচরে থাকলে তাঁর কাব্যের সামগ্রিক স্বরূপ ও আমাদের অনধিগত থাকবে।

গীতাঞ্জলির এই অরূপানুভূতির পর কবির সমাহিত চিত্তে ঈশ্বরীয় লীলারসের যে আনুষঙ্গিক বৈচিত্র্যগুলি পরিস্ফুট হয়েছে তার মধ্যে সর্বপ্রধান হল নিখিলমানবের মধ্যে নরদেবতারূপে অথবা সমাজপথচারী রুদ্র বিধতারূপে ও তাকে প্রত্যক্ষ করার আগ্রহ, অনুরাগ সম্পর্ক স্থাপনের ফলে উপাসকের ন্যায় সংযত, শুভ্র ও ভক্তিবিগলিত ভাবের প্রকাশ এবং মহাকাশ লীলায় নিশ্চিত বিশ্বাসী কবিমানসের মৃত্যু-অস্বীকার।

হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে, হে মোর দুর্ভাগা দেশ প্রভৃতি কবির মানব-প্রীতি সমাজ অণুভব সম্পর্কিত বহুপরিচিত কবিতাগুলিকে গ্রহণ করা যায়। এগুলি থেকে নিশ্চিতভাবে এই অতিসংগত অনুমানে আসতে হয় যে কবির মানবপ্রীতি অরূপানুরাগের দ্বারা গভীরতর হয়ে উঠেছে। পূর্বজীবনের রোমান্টিক বিশ্বাত্মবোধ,

টিপ্পনী

টিপ্পনী

এমনকি ‘এবার ফিরাও মোরে’র বাস্তব জীবনের প্রতি আগ্রহও বিশেষভাবে কবি কল্পনার বস্তুরূপেই অবস্থিত ছিল এমন বিতর্ক হয়ত বা সংগত হতে পারে। কিন্তু অধুনা অরূপানুপ্রাণিত স্থিনর সমাহিত চিত্তে কবি মানুষকে যে আদর্শের সঙ্গে হৃদয়ে গ্রহণ করলেন তার আন্তরিকতায় আর সন্দেহের অবকাশ রইল না।

আমরা ক্রমশ দেখতে পাব অরূপবোধের সঙ্গে মিশ্রিত এই উদার মানবীয়তা, দুঃখ ও মৃত্যুকে অস্বীকার প্রভৃতি কবিকে ক্ষণিকের জন্য গতিলোকে উধাও করে একটি ধ্রুব সামজিক আদর্শে জীবনকে দেখায় অনুপ্রাণিত করেছে। যেহেতু কবির বিশিষ্ট অরূপানুভূতিই এরূপ জীবনদর্শনের মূলে, সেইহেতু, অরূপ সম্পর্কের অধ্যায়টি কবির জীবনে গুরুত্বপূর্ণ।

সৃষ্টির সত্যতা সম্পর্কে স্থির ধারণায় উপণীত কবির নিবিড় মানাবুনুরাগময় সমাজবাদী পরিচয় এর পর থেকে তাঁর রচনায় বিশিষ্টভাবে ফুটে উঠতে লাগল। ‘অচলায়তন’ নাটকে কবি এদেশের অমানবীয় জাতিবর্ণভেদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন, বলাকা ও ফাল্গুণীতে দুঃখতাপজর্জর মানুষের মহিমা কীতর্ণ করে তাকে অগ্রগতিতে উৎসাহিত করলেন, মুক্তধারা ও রক্তকরবীতে সর্ববিধ রাষ্ট্রীয় ও ধনবাদী যান্ত্রিক নিপীড়ন থেকে মানুষকে উদ্ধার করে তার স্বরূপে অবস্থিত দেখতে চাইলেন। কাব্যজীবনের সায়াহ্নেও কবি বাস্তব মানবপ্রীতির বাণীতেই নিজ কাব্যকে চরিতার্থ করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাঙালীর ভাবসাধনার মধ্যে মানুষ-জীবনের মহিমা যদিও নানাভাবে লক্ষিত হয়েছে, যেমন, বৈষ্ণবের ‘দুর্লভ মানব জনম’ সহজ সাধকদের ‘সবার উপরে মানুষ সত্য’, শাক্তভক্তের ‘এমন মানব জমিন রইল পতিত’, তথাপি ঠিক মানুষকেই অরূপ বা ঈশ্বর বলে ধারণা করা হয়নি। মানুষ জীবন যেখানে উপলক্ষ্য বা সাধনার সহায়ক মাত্র। আধুনিক কবি দার্শনিকের এই ভাববাদী অথচ জীবনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নবতম এবং তাঁর স্বকীয়। এ বিষয়ে বাউল-সাধকদের থেকেও তিনি একপদ অগ্রসর এবং যথার্থভাবে সাধারণ মানুষের আধুনিক কবি।

গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালিতে দৃষ্টিপাত দেখা যায় নিসর্গ সৌন্দর্যেই অরূপের আবির্ভাব ঘটেছে। ‘সজল ঘন বাদল বরিষণে’ তাকে আহ্বান করা হচ্ছে, শেফালিকা বিকীর্ণ শিশির সিক্ত পথে তিনি হেঁটে আসছেন, ঝড়ের রাত্রে তিনি অভিসারে বেরিয়েছেন। কখনো যদি বা তাঁর পদধ্বনি শোনা যায়, তাঁকে চেখে দেখা যায় না, কারণ, নিসর্গসৃষ্ট বিহ্বলতার মাধ্যমে তাঁকে অনুভব করা যায় মাত্র। যদিও তিনি নরদেবতা, পথের সাথী, বিপ্লবের পরিচালক, ব্যাথাপথের পথিক। তিনি কোনো মন্দিরে আবদ্ধ নন; তিনি শুধু মনের মানুষ, তরীর মাঝি; তাঁর হাতে বাঁশি যদিও বাজে, তা বজ্রের মধ্যে বাজে। বৈষ্ণবদের ইশ্বরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অরূপের একমাত্র অতি

ব্যাপক মিল এই যে উভয়েই হৃদয়ানুভবগম্য।

গীতাঞ্জলির একটি বিশেষ লক্ষণ হল সংগতি বা অখন্ডতা। গীতাঞ্জলির সবগুলি রচনা পরস্পর - সম্পৃক্ত, একই প্রেরণা ও মনোভাব থেকে সঞ্জানত; এই তন্ময় সংলাপকে ব্যহত করে না কোনো নীতিকথা অথবা কৌতুক - রচনা। অনেকগুলি সমান্তর পথ অবশেষে এখানে এসে মিলিত হলোঃ প্রকৃতি ও মানবজীবন, নারী ও কবিতা, স্বদেশ, দুঃখ, মৃত্যু ও ভগবান - এই সব সূত্র, যা এতকাল বিচ্ছিন্ন অথবা আংশিকভাবে যুক্ত অবস্থায় দেখা দিয়েছে, তার সম্পূর্ণ সমন্বয় ঘটলো, একবার এবং শেষবারের মতো, গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালির কাব্যপর্যায়ে। তিনটি নাম তবে বক্তব্যে ও শৈলীতে অভিন্ন, পরস্পরের পরিপূরক ও সমর্থক। সর্বসাকুল্যে এই গীতিগুচ্ছের সংখ্যা তিনশত ছিয়াত্তর; এদের মধ্যে উৎকর্ষের তারতম্য যেমন আছে, তেমনি আছে অন্তত এক শত ভাস্বর ও অনির্বাণ রচনা, যাতে প্রেরণা কোথাও শ্লথ হয়নি এবং যা কলাসিদ্ধিতেও অবিকল। গীতাঞ্জলির পর্যায়ের রচনাগুলিতে অতিকথন নেই, নেই উচ্ছাস বা কণ্ঠকল্পণা; এদের মধ্যে যেগুলি উৎকৃষ্ট সেগুলি একেবারে নিটোল ও সুটাম ও নির্মেদ। রচনাগুলির রূপকই এই সিদ্ধির জন্য দায়ী। চার স্তবকে বিভক্ত বাংলাগান, তার মিলের বিন্যাস ও ধ্রুবপদ নিয়ে, পেত্রাকীয় সনেটের মতোই নিয়মাবদ্ধ এবং এই মিতবাক্ স্বল্পায়তন রূপটি রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি ও প্রতিভার পক্ষে ও সম্পূর্ণ অনুকূল ছিল।

গীতাঞ্জলি পর্যায়ের অধিকাংশ রচনা চার স্তবকে বিভক্ত, প্রতি স্তবকে পংক্তির সংখ্যা চার, প্রথম মিলটি দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্তবকের অন্তে ফিরে আসছে। রবীন্দ্র পূর্ববর্তী বাংলা গানে এই রকম কোনো সুস্পষ্ট কাব্যিক রূপ পাওয়া যায় না এবং এই পর্যায়ের পূর্বে কিংবা পরে রচিত গানগুলিতে তিনি নিজেও এই রূপকের সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করেন নি। অবশ্য গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য, গীতালিতে কিছু কিছু ব্যাতিক্রম আছে - আছে পংক্তি সংখ্যার তারতম্য বা মিলের বিন্যাসে বৈচিত্র্য - কিন্তু সেগুলিও একই প্রকার গঠনশিল্পের অধীন বলে বাগ্‌বাহুল্য স্বতই নিষিদ্ধ হয়েছিল। সুরের দাবি মেটানোর জন্য কবিকে লিখতে হয়েছে ছোট ছোট পংক্তিতে, কখনো একই পংক্তি তিনটি ক্ষুদ্রতর অংশে এমনভাবে বিভক্ত হয়েছে যাতে প্রতি অংশে একটি স্বাধীন পংক্তি হিসাবে গ্রাহ্য হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের মতো বানীশ্বর কবির পক্ষে এই আত্ম-আরোপিত আবস্যিক সংযম কত যে উপকারী হয়েছিল তা পরবর্তি বলাকা ও পূরবী কলোচ্ছাস স্মরণ করলেই আমরা বুঝতে পারি। শাজাহান বা তপোভঙ্গ কবিতার দীর্ঘতা তাদের বক্তব্যকে অতিক্রম করে গেছে কিন্তু গীতাঞ্জলির এমন অনেক কবিতা আমরা মনে করতে পারি যা তীরের মতো ঋজু এবং উজ্জল। রচনাগুলি সবই সুরলগ্ন সঙ্গীত, কিন্তু যে সংগীত কবিতারই নিজস্ব তার দ্বারা এমনভাবে পরতে পরতে ধ্বনিত যে অন্য এক শিল্পের সাহায্য তাদের পক্ষে বাহুল্য

টিপ্পনী

টিপ্পনী

বলা যায় । রবীন্দ্রনাথের এমন বহু গান আছে, যা গায়কের সহযোগ সাপেক্ষ অর্থাৎ গান হিসাবে না শোনা পর্যন্ত যা মনে কোনো সাড়া তোলে না, এবং একবার শোনা হবার পরে যার শব্দগুলি সুরাশ্রিত হয়েই স্মরণে হানা দেয়। কিন্তু গীতাঞ্জলিন পর্যায়ের রচণাগুলি সত্যিকার কবিতা এবং ছন্দশিল্পেরও উজ্জল উদাহরণ; অর্থাৎ তারা কবিতা হিসেবেই নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে । গীত হবার জন্য বাংলাদেশে তাদের জনপ্রিয়তা আজ অসামান্য । কিন্তু তাতে তাদের আন্তরিক মূল্য বৃদ্ধি পায়নি । বরং তাদের অন্তঃস্থলে পৌঁছতে হলে গান হিসেবে তাদের ভুলে থাকা ভালো। সুর যেমন স্নায়ুতন্ত্রীকে আনন্দ দেয়, তেমনি তা চিত্তবিক্ষেপও ঘটাতে পারে, আর গীতাঞ্জলির মতো স্বয়ংসম্পূর্ণ রচনা পেলে আমরা তাতে আরো কিছু যোগ করতে চাই না, প্রার্থনা করি তার সৌন্দর্য্যের নিঃশব্দ ও অব্যবধান অভিঘাত।

'শেষ খেয়া' কবিতায় কবি যার জন্য ঘাটে এসে বসেছিলেন গীতাঞ্জলিতে সেই খেয়ায় আমরা তাঁকে পারাপার করতে দেখেছি। কবিতাগুলি স্থিতি পাচ্ছে না। এই দোলাচলের জন্যই কবিতাগুলি এত আনন্দঘন, এরই জন্য আঁদ্রে জীদের মনে হয়েছিল তারা 'প্রাণের বেগে নিশ্বাসিত ও স্পন্দমান' । কিছুই তারা ভুলে যায়নি, কিছুই তারা দখল করে নিচ্ছে না। ঝড়ের মতো লুঠ করে নিচ্ছে না দ্যুলোক, মর্তকে পরিত্যাগ করেছি। কবির 'সকল রসের ধারা' এখানে এসে মিলে গেলো, কিন্তু একটি ধারাও আন্তর্হিত হল না। সব পুরাতন প্রেম নতুনভাবে জড়িত হল পরস্পরে, নতুন অবস্থায় পুরানো পাত্রপাত্রীকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি'; আমাদের পূর্ব পরিচিত প্রেমিক প্রেমিকা রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে যায় নি, যে অন্তরতম দেবতার আমরা পানপাত্র, তিনিও উপস্থিত আছেন । কবি পূর্বের মতোই তাঁর স্বদেশ বিশ্ব-মানব জীবনের অংশভাগী এখনো 'রৌদ্র ছায়া বর্ষা বসন্ত' তাঁকে অজানার বার্তা এনে দেয় এবং তাঁর সকল ভালোবাসা' না জেনে ধাবিত হয় মৃত্যুর দিকে। এমন কি সেই নিরুদ্দেশ যাত্রাও এখনো শেষ হল না ; 'কথা ছিল এক তরীতে' কবিতায় আবার দুই সহযাত্রী কূলহারা সমুদ্রে ভাসমান, আবার নামে সমুদ্রের বুকে সন্ধ্যা, অস্তরবির শেষ আলো মিলিয়ে যায় কবিতার শেষ পংক্তিতে 'নিরুদ্দেশ' শব্দটি পর্যন্ত ফিরে আসে। গীতাঞ্জলির অন্য কোনো - কোনো কবিতা স্মরণ করে বলা যেতে পারে যে এই যাত্রা এখন আর নিরুদ্দেশ নেই, কিন্তু কবির মনে কোনো লক্ষ্যস্থল থাকলেও সেটি কোথায় তা বলে দেয়া হয়নি। হয়তো এই অনিশ্চয়তারই জন্যই আভিং ব্যবিট শেলি, বোজলেয়ার হাইনে প্রভৃতি কবিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে 'ঘূর্ণি-পূজারি'দের দলে ফেলেছিলেন। কিন্তু ব্যাবিট কতদূর পর্যন্ত রোমান্টিকতার রসজ্ঞ, তার যুক্তিতেই বা কতটা সারিবত্তা আছে, এই সব প্রশ্ন বিষয়ে নীরব থেকেও বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথের সে সব কবিতাই আমাদের পক্ষে সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী, যেগুলি সবচেয়ে কম স্পষ্ট ও নিশ্চিত। তাঁর প্রতিভার এই বিশেষষ চরিত্রলক্ষণটি বেরিয়ে আসে তাঁর ব্রহ্মসংগীতের সঙ্গে

গীতাঞ্জলির তুলনা করলে। পদপ্রান্তে রাখ সেবকে / শান্তি সদন সাধনধন দেবদেব হে যদি গীতবিতানে মুদ্রিত না থাকত তাহলে এই ঈশ্বরবিশ্বাসী উত্তব-ভাবসম্পন্ন গানটিকে রবীন্দ্রনাথের রচনা বলে বিশ্বাস করা সহজ হতো না ; উপরন্তু এক 'দুঃখতাপ বিঘ্নতরন শোকশান্তস্নিগ্ধ চরণ' ঈশ্বরকে রবীন্দ্রনাথের হাত থেকেও গ্রহণ করতে আমাদের কারো কোআরো আপত্তি হতে পারে। কিন্তু আলোয় আলোকময় করহে / এলে আমার আলো' - এই কবিতাটিতে 'আলো বলতে কী বোঝাচ্ছে তা অস্পষ্ট বলেই অনাস্থার অপনোদন ঘটে, আমরা তৎক্ষণাৎ অতি সহজে কবির কাছে আত্মসমর্পণ করি।

'তুমি একটু কেবল বসতে দিয়ো কাছে / আমার শুধু ক্ষণেক তরে' গীতমাল্যের কুড়ি নম্বর কবিতা এটি, ইংরেজি গীতাঞ্জলির পঞ্চম। যে - সব পুস্তকে কবি এটিকে স্থান দিয়েছিলেন তা থেকে এমন অনুমান স্বাভাবিক যে রচণাটি ভক্তি রসাশ্রিত। কিন্তু 'গীতবিতান' এ এটি প্রেম বিভাগে সন্নিবিষ্ট হয়েছে, আর তাতে কখনো কোনো বাঙালি পাঠক আপত্তি করেছে বলে শোনা যায় নি। কেননা বাঙালির কানে ও মনে কবিতা হিসেবে, তার চেয়েও বেশি গান হিসাবে, এই রচনাটি যা পৌঁছে দেয় তা নরনারীর প্রণয়েরই বার্তা। এই বাসন্তিক ভ্রমরগুঞ্জণকে ভগবদ্‌ভক্তের স্ত্রোত্রপাঠ বলে ধারণা করা দুঃসাধ্য। আমরা ধরে নিতে পারি যে রবীন্দ্রনাথেরও এতে সম্মতি ছিল। কেননা গীতবিতান এর বিষানুক্রমিক শৃঙ্খলা তাঁর জীবৎকালে ও তাঁরই তত্ত্বাবধানে সাধিত হয়। পূজা, প্রেম, প্রকৃতি প্রভৃতি বিভাগগুলির ও প্রবর্তন করে কবি চেয়েছিলেন 'ভাবের অনুসঙ্গ রক্ষা করে' গানগুলিকে সাজাতে। কিন্তু যেহেতু তার বহু সুরলগ্ন রচনা উপরোক্ত একাধিক বিভাগ বা যে কোন বিভাগেই মানিয়ে যায়, তাই এই ভাবানুক্রমিক ব্যবস্থায় মাঝে মাঝে অসংগতি ধরা পড়ে। গীতাঞ্জলি পর্যায়ের বহু উৎকৃষ্ট কবিতা - যার কোনো একটিও নির্ভুলভাবে আতীন্দ্রীয় ইঙ্গিত দিচ্ছে - তা গীতবিতান - এ স্থান পেয়েছে পূজা বিভাগে নয়, প্রেম অথবা প্রকৃতি অংশে। যেমন - মেঘের পরে মেঘ জমেছে (গীতাঞ্জলি ১৬নং) এটি বর্ষার গান বলে চিহ্নিত হয়েছে। গীতবিতান এর বিভাগবিন্যাস যথাযথ হয়নি বলে সম্পাদকের দোষ দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়; বরং বিষয়টা হল এ যে এটা রবীন্দ্রনাথেরই গুণ যে তাঁকে খোপে খোপে ভাগ করা অসম্ভব। তাঁর দুর্বল মুহূর্তগুলিকে বাদ দিলে, আমরা তাকে মুটোয় ধরতে পারি না কখনো, চেপে ধরে বলতে পারি না ; 'এটাই উনি, অন্য কোনোটা নন'। তাঁর কবিতা সেখানেই উৎকৃষ্ট সেখানেই তা প্রান্তিক 'সেই সোনাচর তরীর মানস সুন্দরীর মতো স্বর্গ ও মর্তের মধ্যে ভাসমান, জীবনদেবতার মতো আদিরস ও ভক্তিরসে সন্নিপাতী ; পার্থিব ও স্বর্গীয় প্রেমের যে বিভাগ খৃষ্টান মানসে বদ্ধমূল, রবীন্দ্রনাথের কাছে - এবং আবহমান ভারতীয় ঐতিহ্যে - তার কখনো অস্তিত্ব ছিল না। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ভগবানের দর্শনলাভের চেয়ে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে জরুরি হল একটি

টিপ্পনী

টিপ্পনী

অপেক্ষমান বিনিদ্রবেদন অবস্থা এবং 'মানসী' থেকে 'গীতাঞ্জলি' পর্যন্ত যা ঘটেছে তা এই অবস্থারই রূপান্তর ও বিবর্তন। সত্যি সমগ্র গীতাঞ্জলি পর্যায়কে এক দীর্ঘায়িত ও বিচিত্র অপেক্ষার চকোআব্য বলা যায়; 'ডাকগর' -এর অমলের মতো, কবি অনবরত পথের ধারে বসে আছেন - অপেক্ষাই তাঁর বচরত ও বৃত্তি আর ভগবানকে সরিয়ে নিলে এই অপেক্ষার লক্ষ্য কেউ থাকে না। কিন্তুন কখনো কজখনো এই অপেক্ষাইজ যাত্রায় পরিণত হচ্ছে ; স্থিতির পাশে গতিচ এবং নাচরী ধর্মী প্রত্যাশার পাশে উদ্যমের পৌরুষ আছে বলেই নাটকটি মেন শেষ হয়েও শেষ হতে চায় না।

মেঘের পরে মেঘ জমেছে
আঁধার করে আসে
আমায় কেন বসিয়ে রাখ
একা দ্বারের পাশে - (গীতাঞ্জলি ১৬)

আর কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয় (গীতাঞ্জলি ৬৫)

এই দুটি উক্তি পরস্পরের বিরোধী নয়, পরিপূরক। অপেক্ষা ও যাত্রার এই একান্তরতা যেমন কবিতায়, তেমনি রবীন্দ্রনাথের গানেও চিরায়মান।

উপরন্তু, অভিজ্ঞতাটিও উভয়পক্ষীয়, অর্থাৎ নাটকটিকে ভগবানের দিচক থেকেও দেখানো হচ্ছে, তাঁরও অপেক্ষা ও পথিকবৃত্তি শেষ নেই; তিনিও বিনিদ্র ও বিস্ময়হীন ; যেমন তাঁর জন্য মানবহৃদয় তৃষ্ণার্ত, তেমনি মানুষের ভালোবাসা না পেলে তাঁরও চলে না।

তোমার প্রণয় যুগে যুগে মোর লাগিয়া
জগতে জগতে ফিরিতেছিল কি জাগিয়া ?
এ কি সত্য ?

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
62

'কল্পনার এই প্রণয় প্রশ্নে যাঁর আভাস পেয়েছিলেন, তিনিই 'গীতাঞ্জলি'তে 'ঝড়ের রাতে অভিসারে' বেরোলেন (২০নং), নেমে এলেন 'সিংহাসনের আসন থেকে' (৫৬নং) কখনো হয়তো নিদ্রিতার পাশে এসেও বসলেন (৬১নং) এবং কোনো কোনো আকস্মিক দুঃসাহসী মুহূর্তে তাঁরই বিষয়ে বলা হল -

আমার মিলন লাগি তুমি

আসছ করে থেকে।
তোমার চন্দ্র সূর্য তোমায়
রাখবে কোথায় ঢেকে। (গীতাঞ্জলি ৩৪)

তাই তোমার আনন্দ আমার পর
তুমি তাই এসেছ নীচে -
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমায় প্রেম হত যে মিছে (গীতাঞ্জলী : ১২১)

বেদনাদূতী গাহিছে, 'ওরে প্রাণ
তোমার লাগি জাগেন ভগবান।..... (গীতাঞ্জলি : ১৭)

তোমার আমায় মিলন হবে বলে
আলোয় আকাশ ভরা। (গীতাঞ্জলি : ৫২)

অথচ, এই পারস্পারিক আকাঙ্খা ও সন্ধান, ধৈর্য ও অপেক্ষা সত্ত্বেও, সমগ্র 'গীতাঞ্জলি' পর্যায়ে মিলনের মুহূর্ত অপেক্ষাকৃত বিরল ; আলংকারিকেরা যাকে 'স্থায়ীভাবে' বলতেন, এই কবিতাগুলিতে তার নির্ভর হলো - মিলন নয়, বিরহ ; নিশ্চিত নয়, আশা; সাফল্য নয়, প্রতিশ্রুতি । এই লক্ষণগুলিতে গীতাঞ্জলি বিশেষভাবে সমৃদ্ধ ; হয়তো তারই জন্য গীতিমাল্য ও গীতালির তুলনায় সেটি কাব্য হিসেবে আরো বেশি রসোজ্জল; অন্ততপক্ষে, টাটকা সতেজ কালোত্তীর্ণ কবিতার সংখ্যা গীতাঞ্জলিতে যে পরিমাখণে পাওয়া যায় পরবর্তী বই দুটিতে ততটা নয়; গীতাঞ্জলির উৎকৃষ্ট কবিতাগুলির সঙ্গে খেয়ার কোনো কোনো রচনা এবং 'ডাকঘর' নাটক যোগ করলে আমরা শুনতে পাই দুই অপেক্ষমান বিরহী প্রেমিকের সংলাপ, তা যেমন সাংকেতিক ও অব্যাহত, তেমনি তা হৃদয়স্পর্শী । মাঝে মাঝে আসে বার্তা, আসে দূত, গন্ধ, ইঙ্গিত; শোনা যমায় বীনাধ্বনি ও পদধ্বনি; যে চিঠি অমলের হাতে শেষ পর্যন্ত পৌঁছল না, বা এমন ছদ্মবেশে পৌঁছল যে অমল তা জানতে পারলে না, তাও হয়তো হাতে আসে কখনো; কিন্তু অতিথি বা রাজা, বন্ধু বা

টিপ্পনী

প্রিয়তম, নাম তাঁর যাও হোক না তিনি অবিরামভাবে আসন্ন হয়েও অধিকাংশ সময় আগত হন না; এবং এমন কোনো ইঙ্গিত প্রত্যাশিতের উপস্থিতির চাইতে তাঁরই প্রেরিত এই সব দূত ও বার্তা কম মূল্যবান।

আছে আমার হৃদয় আছে ভরে

এমন তুমি যা খুশি তাই করো। (গীতাঞ্জলি ১১০)

টিপ্পনী

এখানে কবি যে 'আছে' বলেছেন এই তির্যক ভঙ্গিতেই অপেক্ষার অবস্থা সূচিত হলো।

তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি

সে যে আসে, আসে, আসে (গীতাঞ্জলি ৬২)

এই যে উভমুখী অপেক্ষা ও যাত্রা - যাকে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব ভাষায় 'লীলা' বলেছেন - আমাদের সব মানবিক অভিজ্ঞতাও তারই অভিজ্ঞান, আর তারই জন্য জীবন ও মৃত্যু দুই অর্থপূর্ণ। গীতাঞ্জলিতে পরমের জন্য আকাঙ্খা যেমন প্রবল তেমনি গভীর মানবজীবনের স্বীকৃতি; এর জন্যই এদর আবেদন এমন সার্বিক, ভোক্তার আনন্দ এমন নিষ্কণ্ঠ। ভগবানের প্রান্তে পৌঁছিয়ে দিয়ে, পরমুহূর্তেই রবীন্দ্রনাথ যেন আমাদের ফেরৎ পাঠিয়ে দেন - সেই আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মরত্ববিদ্ধ ভালোবাসার জগতে; আমরা ফিরে এসে হয়তো সেই ভালোবাসাগুলিকে আরো একটু মূল্য দিতে শিখি, আরো একটু যোগ্য হয়ে উঠি তাদের। আমাদের এই ভঙ্গুর ও কালাক্রান্ত মর্ত জীবন - রবীন্দ্রনাথ তার সর্বত্র দেখতে পেয়েছেন 'পূর্ণের পদপরশ', পরমের স্বাক্ষর; তাই অর্মত্য ও মর্তের মধ্যে তাঁর চলাচল এমন সহজ ও স্বচ্ছন্দ। তাঁর কবিতার মধ্যে মানুষ ও তার জগৎ, ও ভগবান পরস্পরের প্রবিষ্ট ও সঞ্চরণশীল - কখনো কখনো এমনকি প্রায় বিনিময়ধর্মী; যে সম্বন্ধসূত্রে তারা সম্পৃক্ত, তা তত্ত্বগত বা শাস্ত্রীয় নয়, যীশু অথবা কৃষ্ণের মতো কোনো অবতারেও তা অবলম্বণ খোঁজেনি তা ব্যাক্তিগত এবং অনুভূত বলেই সত্য। অন্য কোনো কবিকে নেই যিনি পাঠকের মনে এই বিশেষ অনুভূতিটি সঞ্চারিত করেন - এই মর্মরধ্বনি ও চাঞ্চল্য, এই হিল্লোলিত আনন্দ ও বেদনা বা দিতে পারেন এমন এক শাশ্বতের সন্ধান, মানুষ ও ভগবান যার সমকক্ষভাবে অংশীদার। রবীন্দ্রনাথ যেখানে নাট্যকার, যেখানে কোনো বহিরাশ্রয়ের সাহায্যে তিনি সম্বন্ধটিকে রূপ দেবার চেষ্টা করেন, সেখানে তার সাফল্য হয়ত তর্কাতীত নয়। কিন্তু সেখানে তিনি গীতিকবি, যেখানে মুহূর্তস্থায়ী প্রেরণাকে তিনি অল্প কয়েকটি শব্দের বূহ্যে তৎক্ষণাৎ বেঁধে ফেলেছেন, প্রতীক অথবা অলংকার খুঁজে কালক্ষেপ করেন নি, সেখানে তাঁর রচনাগুলি কানায় -কানায় প্রাণপূর্ণ, অব্যর্থভাবে সংক্রমক। এবং তিনি এখানেই অনণ্য, তাঁর সঙহগে তুলনীয় অন্যান্য

কবিদের সঙ্গে এখানেই তাঁর ব্যবধান, এরই জন্য আমাদের মানতেই হবে যে বিশ্বকবিতায় তিনি একটি নতুন তন্ত্রী সংযোজন করেছেন। আর সেই তন্ত্রীটি যখন অনাহতভাবে বাজে, তখন তিনি যে - ভাবে ভাষা ব্যবহার করেন, তার দ্বারা মুগ্ধ হবার মতো পাঠকের কখনো অভাব হবে না, যতদিন বাংলা ভাষার অস্তিত্ব থাকবে।

গীতাঞ্জলি পর্বের রচনাতে দুঃখ অমঙ্গলকে রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে গ্রহণ করেছেন তা এই পর্বেরই বৈশিষ্ট্য। এদিক থেকে তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছেন বলা ভুল হবে; কিংবা জাগতিক দুঃখদুর্দশারূপ তমসার একেবারে পরপারে আদিত্যবর্ণ মহানপুরুষকে দেখতে পাছেন, তাও ঠিক নয়। দুঃখ বেশেই দেবতা নেমে আসেন ভক্তের দ্বারে।

টিপ্পনী

দুখের বেশে এসেছ বলে
তেমারে নাহি ডরিব হে
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা
নিবিড় করে ধরিব হে

অথবা দুঃখই মেজরাব হবে গভীর রাতে হৃদয়ের তন্ত্রীতে যে-গান বাজিয়ে তোলে সে-গানই মিলনের সেতু রচনা করে :

লুটিয়ে পড়ে সে গান মম ঝড় রাতের পাখি সম
বাহির হয়ে এসো তুমি অন্ধকারে।

আর কিছু না, গলায় যে ছিন্ন মালাটি মিলন রাত্রির শেষে শয্যাতলে পড়ে ছিল, সেটুকু চেয়ে নিতেও পারেনি ভীরু প্রণয়িণী। দ্বিধায় লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে চুপটি করে দরজায় এক পাশে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু যাওয়ার সময় এ কী দিয়ে গেল সে নিষ্ঠুর, সে ভয়ানক প্রেমিক ? এই কি তার প্রেমের দান, মিলন রজনীর স্মৃতিচিহ্ন ?

ভোরের পাখি শুধায় গেয়ে
'কী পেলি তুই নারী'।
নয় এ মাওলা, নয় এ থালা,
গন্ধজলের ঝারি,
এ যে ভীষণ তরবারি।

বুকের মাঝে তবু রাখতে হবে এবেদনার দানকে বজ্রহেন ভারী তরবারি আগুনের মতো জ্বলে উঠে বুক পুড়িয়ে ফেলে, তবুও মনে হয় না যথেষ্ট হয়েছে

টিপ্পনী

আঘাত। কঠিনতর বেদনায় টনটন করে উঠুক বুকের পাজরগুলো :

আরো আঘাত সইবে আমার

সইবে আমারো

আরো কঠিন সুরে জীবন

তারে ঝংকারো

আঘাতকে এড়িয়ে চলা আর নয় ভয় করার তো সত্যি কিছু নেই, এগিয়ে গিয়ে বুক পেতে নিতে হবে সবকটি বাণ :

ও নিষ্ঠুর, আরো কি বাণ

তোমার তুণে আছে ?

তুমি মর্মে আমার

মারবে হিয়ার কাছে ?

আর এক প্রকার দুঃখের কথা গীতাঞ্জলিতে বারে বারে বলা হয়েছে। সে-দুঃখ জীবননাথের দেওয়া দুঃখ নয়, তাঁকে না-পাওয়ার দুঃখ। নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, "গীতাঞ্জলিতে দেখিতেছি এই উন্মুখর অধীর প্রতীক্ষা বিরহের ক্রন্দনে যেন গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতেছে। বিরহের বেদনা, দেবতাকে একান্ত না-পাওয়ার দুঃখ গীতাঞ্জলির গানগুলির উপর সুগভীর ছায়াপাত করিয়াছে।" সুগভীর কিন্তু সুমধুর। বিরহ চিরন্তন হলে দুঃখ দুর্বিষহ হত। কিন্তু যে বিরহ মিলননেরই সম্ভাবনায় মদির, তা মিলনেরই পূর্বাস্বাদন, তিক্ত হলেও সুস্বাদু।

তুমি যদি না দেখা দাও

করো আমায় হেলা

কেমন করে কাটে আমার

এমন ববাদল বেলা।

এ অনুযোগ ব্যর্থ হবার নয়, ব্যর্থ হবে এমন আশঙ্কা নেই অনুযোগকারিনীর মনে। যদি থাকত তবে তার প্রকাশ হত অন্য ভাষায়, এই আবদারের সুর তাতে বেমানান হত।

দূরের পানে মেলে আঁখি

কেবল আমি চেয়ে থাকি

পরাণ আমার কেঁদে বেড়ায়

দুরন্ত বাতাসে।

'দুরন্ত শব্দটা লক্ষণীয়' যে বাতাসের সঙ্গে পরাণ কেঁদে বেড়ায় তাকে ছোট্ট ছেলের মতো আদর করে বলা হচ্ছে 'দুরন্ত'। এ কান্না তো গুমরে-ওঠা কান্না নয়। এই মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় যাঁর জন্য প্রতীক্ষা তিনি আসবেনই, খুব গোপন চরণ ফেলে 'সবার দিঠি এড়ায়ে' আসবেন। যে পথের দুই দিকে 'দুয়ার দেওয়া সকল ঘরে' সেই নির্জণ পথে প্রতীক্ষমাণার ঘরের সম্মুখে এসে দাড়াবেন। তারপরে যদি বিরহিনী বলে ওঠেন -

হে একা সখা, হে প্রিয়তম

রয়েছে খোলা এঘর মম

সম্মুখ দিয়ে স্বপন সম

যেয়ো না মোরে হেলায় ফেলে।

তখন কি আমাদের মনে খুব সন্দেহ থাকে যে উদাসীন অতিথি একবার একটু ক্ষণের জন্য ঘরেও প্রবেশ করবেন ? আর যদি হেলায় ফেলে চলেই যান দিন বৃথাই কাটে, রাত গভীর হয়, প্রহরের পর প্রহর পথ চেয়ে থাকতে হয় তবু -

প্রভু, তোমা লাগি আঁখি জাগে;

দেখা নাই পাই

পথ চাই

সেও মনে ভালো লাগে।

কারণ জানাই তো আছে যে উদাসীন সত্যই উদাসীন নন, তিনি আসতেই ইচ্ছুক, আর যখন আসেন, 'অরুণবরণ পারিজাত হাতে' আসেন, বাধা তাঁর দিক থেকে নয়। বাধা এই যে পাশে এসে বসলেও নিদ্রাকাতরা হতভাগিনীর ঘুম ভাঙে না ; ককনও বা নেহাত আলসেমিতেই পেয়ে বসে -

কতবার আমি ভেবেছিনু উঠি উঠি

আলস ত্যাজিয়া পথে বাহিরাই দুটি

উঠিনু যখন তখন গিয়েছ চলে।

এই অবিক্ষুব্ধচিত্তন স্থিতহৃদয় বিরহিনীর বিরহ দুঃখে কি সুখের আমেজ

টিপ্পনী

যথেষ্ট লাগে নি ? বিরহ মধুর হল আজি মধুরাতে শুধু কোনো বিশেষ রাতে নয় সব রাতেই মধুর।

রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি পর্বে দুঃখের কথা খুবই ভাবছেন, কিন্তু সে দুঃখ একান্তভাবে নিজেরই। আগেই বলা হয়েছে যে গীতাঞ্জলির কবি নিজেকে এবং তাঁর জীবনবল্লভকে নিয়ে সর্বান্তঃকরণে ব্যাপৃত, প্রায় সমস্ত কবিতা এই নিভৃত দ্বিরালাপের কবিতা। দৈবাৎ কোথাও যদি শুনি -

টিপ্পনী

অগ্নিবাণে তূণন যে ভরা,

চরণভারে কাঁপে ধরা,

জীবনদাতা মেতেছে আজ

মরণ মহোৎসবে

তবে হঠাৎ ভ্রম হয় কবি বুঝি সমস্ত পৃথিবীর, সকল মানুষের সর্বনাশের কথাই ভাবছেন। কিন্তু চপরবর্তী শ্লোক যে - ভুল ভেঙ্গে দেয় , অগ্নিবানে 'আমার'ই বক্ষ বিদীর্ণ হচ্ছে, 'আমার'ই মরণ নিয়ে এ মরণ-মহোৎসব; আর সে মরণকে নিয়ে তো কোনো দুর্ভাবনা নেই, কারণ -

মরণ-দুখে জাগাব মোর

জীবন-বল্লভে।

সর্বনামের দুঃখের কথা রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন নৈবেদ্য - এ আবার ভাববেন বলাকায় ভক্তিপর্বের দুই প্রান্তবর্তী কাব্যে। ইতিমধ্যে কেবল 'তুমি' আর 'আমি' একান্তে আসীন, সমাজ সংসার মিছে না হলেও বহু দূরে সরে গেছে। প্রমথনাথ বিশী রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ গ্রন্থে বলেছেন - "সর্ব মানবের সহিত একাত্মবোধ ..... গীতাঞ্জলি পর্বে বাধাগ্রস্থ।" কিন্তু তা থেকে কি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় যে নৈবেদ্য প্রকাশের পরে অর্থাৎ ১৯০২ হইতে বলাকার কবিতা রচনার সময় ১৯১৪ পর্যন্ত, এই দ্বাদশ বৎসর রবীন্দ্র প্রতিভার বনবাস ?" মানবমুখিতা রবীন্দ্র প্রতিভার একটি ধারা, একমাত্র ধারা নয়।

গীতাঞ্জলির ভারতীর্থ কবিতায় আছে দেশপ্রেম। তবে একটি বিষয় এ প্রসঙ্গে বলবার যে একবিতায় বিদেশী কবি হুইটস্যানের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কাব্য তো স্বয়ম্ভু নয়, তার ইতিহাস ও পারম্পর্য আছে। রবীন্দ্রনাথ হুইটম্যানকে কোনো একটি বিশেষ পথের পূর্বসূরী মেনে নিয়েছিলেন। তবে সমস্যা এই যে আমাদের অহেতুক জাত্যাভিমান বিদেশী প্রভাবকে কবুল করতে চায় না। যাঁর সাহিত্যের ঐতিহ্য মানেন তারা জানেন যে কোনো একটি কবিতার জনক অন্ততঃ আর একটি কবিতা, কবি নন।

শেলী, কীটস, ওয়ার্সওয়ার্থ ও টেনিসন থেকে রবীন্দ্রনাথ পাঠ নিয়েছেন। একথা এখন আর কেউ অস্বীকার করেন না, যদিওও সে প্রভাবের বিশেষ রূপ নিয়ে আলোচনার অনেক অবকাশ আছে। ইংরেজি রোমান্টিক কাব্যে যেমন মধ্যযুগীয় ও রেনেসাঁসের কাব্যের প্রতিবিম্ব, তেমনি ঊনবিংশ শতকের বাংলা কাব্যে ইংরাজি রোমান্টিক কাব্য গোপনে অহরহ বিরাজমান। এই প্রভাব রবীন্দ্রনাব্যে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের জোয়ারে ভেসে আসে। কিন্তু মার্কিন কবি হুইটম্যান রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ আবিষ্কার। দোর্দন্ডপ্রতাপ ইংরেজ সাম্রাজ্যকালে তো বটেই এখনো আমরা মার্কিন সাহিত্যের সঙ্গে তেমন ওঠাবসা পচ্ছন্দ করি না, আর রবীন্দ্রনাথ সেই একশবছর আগে হুইটম্যানকে ধরে ফেলেন। ঠাকুরবাড়ির ইঙ্গ-বঙ্গ কালচারের প্রসারতা ছাড়া মার্কিন সাহিত্যের সেই অনুপ্রবেশের ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। ভারতবর্ষ থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থিত, তখনো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আলোকছটায় অস্পষ্ট, যুক্তরাষ্ট্রকে রবীন্দ্রনাথ চিনে নিতে পেরেছিলেন।

মার্কিন কবি হউটম্যানের কাছে রবীন্দ্রনাথের ঋণ আছে। কাব্য অনন্য একক আনুগত্যহীন এরকম ভাবা ভুল। 'ভারততীর্থ' কবিতার দিকে তাকালে বিষয়টি বোঝা যাবে। শিরোনামটির ইংরেজি অনুবাদ করতে গেলেই পৌঁছে যাই হুইটম্যানের কবিতায় - "Passage to India" ১৯১০ এর গীতাঞ্জলির অন্তর্গত এই কবিতায় হুইটম্যান কি শুধু বলতে গেলে নামকরণই করেছেন ? বৃহত্তর ভারতের তথা মানবমৈত্রীর এই যে ওড্ (Ode), তা কি শুধু রবীন্দ্রনাথের ভারতপ্রেম জাত ? বিদেশীকাব্যের কাছে জন্মের ঋণ নেই ? দেশবন্দনা ও বিদেশী কাব্য প্রায় একই সময়ে বর্হিদুনিয়ার বাতাসে আন্দোলিত হয়ে ভারত সমুদ্রতীরে পৌঁছছিল।

প্রথমে শোনা যায় "Passage of India" র আওয়াজ - "হে মোর চিত্ত" যা পূর্ববর্তীর 'O my soul' এর হুবহু প্রতিধ্বনি। "passage o soul" "lo soul, seost thou not god's purpose from the first (লাইন ৩১) এই পংক্তিটির পাঠ নিয়ে "ভারতীর্থ রচিত। শব্দচয়নের মিল ছাড়াও বলতে হয় যে দুটি কবিতাই মানবমিলনের এক মহা সঙ্গমের চিন্তায় অনুপ্রাণিত। বিরোধের মধ্যে বলতে হয় Passage to India গদ্য কবিতা কিন্তু "ভারততীর্থ" মধ্য ও অন্ত্যমিল, অনুপ্রাস ও ছন্দের আরো নানান কলাকৌশলে হিল্লোলিত। রোমান্টিক কাব্যের ধ্বনিমাধুর্য ও হুইটম্যানের দর্শন গম্ভীর মুক্তকাব্য - এই দুই-ই রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করে রেখেছে।

কবিদের মনে প্রভাব কিভাবে পড়ে, তার সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া সহজ নয়। তবে 'ভারততীর্থ' কবিতার অবিস্মরণীয় পংক্তিগুলির সঙ্গে হুইটম্যানের কবিতার সাদৃশ্য লক্ষণীয় -

টিপ্পনী

টিপ্পনী

রনধারা বাহি জয়গান গাহি উন্মাদ কলরবে
ভেদি মরুপথ গিরিপর্বত যারা এসেছিল সবে
তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে কেহ নহে নহে দূর
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে তার বিচিত্র সুর।

হুইটম্যানের কবিতার সংশ্লিষ্ট স্তবকটি হচ্ছে -

Passage to India

Struggles of many a captain, tales of many of sailor dead

over my mood stealing and spreading they come.

রবীন্দ্রনাথের "হেথা একদিন বিরামহীন মহাওংকার ধ্বনি" হুইটম্যানের "Soundest below the sanskrit and the vedas"- এর মুক্ত অনুবাদ।

দুটি কবিতার বিভিন্নতার কথা অনেক বলা যায়। যেমন প্রথমটি আর্ন্তজাতিক, ভারতে অভিযাত্রার আবাহন, ২য় টি দেশবরণ (তবে বিদেশীর আহ্বাণ আছে : "এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ এসো এসো খৃষ্টান) প্রথমটির মরমীয়াবাদ ও তান্ত্রিকতা ২য় টিতে নেই। এ বিভিন্নতা দুটি কবির স্টাইল ও মানসিকতার বিভিন্নতা। তবে ভারততীর্থ স্বয়ম্ভু না হলেও স্বাতন্ত্র্যে বৈশিষ্ট্যময়। সমালোচক হয়ত এ কবিতায় প্রভাবের অন্য ব্যাখ্যা দিতে পারেন। তবে এ আসলে আত্মীয়তা, সহৃদয়তা। এক কবি আর এক কবির গানে মুগ্ধ হয়ে সুর মিলিয়ে নিয়েছেন।

সহায়ক গ্রন্থাবলী :

১। রবীন্দ্র জীবনী - প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

২। রবীন্দ্রকাব্য পরিক্রমা - ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

৩। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস (চতুর্থ খন্ড) - সুকুমার সেন

৪। রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয় - ড. ক্ষুদিরাম দাস

৫। রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ - প্রমথনাথ বিশী

৬। রবীন্দ্র কবিতাশতক - জগদীশ ভট্টাচার্য

৭। রবীন্দ্র সাহিত্যে ভূমিকা - নীহাররঞ্জন রায়

৮। নির্মাণ ও সৃষ্টি - শঙ্খ ঘোষ

৯। রবীন্দ্র সরণী - প্রমথনাথ বিশী

১০। রবীন্দ্রনাথ - সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

প্রশ্নাবলী :

টিপ্পনী

১। 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের প্রেক্ষাপট আলোচনা কর।

২। 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের আধ্যাত্মিক চেতনার পরিচয় দাও।

৩। 'গীতাঞ্জলি' কাব্যে সৌন্দর্যবোধ ও ঈশ্বরচেতনার মেলবন্ধন কতখানি সার্থক আলোচনা কর।

৪। গীতাঞ্জলির -গীতিমাল্য - এর পারস্পারিক অন্বয়ের এক তাৎপর্য আছে- আলোচনা কর।

৫। গীতাঞ্জলির কবিতাগুলি গান ও কবিতা কোন শিল্পরূপে সার্থক বুঝিয়ে দাও।

৬। গীতাঞ্জলি ১০৬ নং কবিতার বিষয়বস্তু আলোচনা কর।

৭। গীতাঞ্জলি ও গীতিমাল্য এর প্রকৃতি চেতনার পরিচয় দাও।

৮। গীতাঞ্জলি ও গীতমাল্য কবিতাগুলি নামহীন হলেও একসূত্রে গাথা আলোচনা কর।

টিপ্পনী

দ্বিতীয় একক

নাটক : রক্তকরবী

ভূমিকা :

টিপ্পনী

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার স্পর্শে সাহিত্যের প্রায় সব ক্ষেত্রেই সোনা ফলেছে। কবিতা ও ছোটগল্পের রাজ্যে তিনি যেমন অতুলনীয়, নাটকের ক্ষেত্রেও তেমনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর আগে পর্যন্ত বাংলার নাট্যসাহিত্য ,নাট্যরীতির সুনিয়ন্ত্রিত বিধানের মধ্যে নির্দেশিত আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু বন্ধন অসহিষ্ণু, মুক্তি প্রয়াসী রবীন্দ্রনাথ সবরকম রীতি ও নিয়ম অতিক্রম করে নাট্যরচনা শুরু করলেন। তাঁর নাটকের সঙ্গে পূর্ববর্তী নাট্যধারার কোনো যোগ নেই। তাঁর নাটকীয় চেতনার উৎস হয়েছে তাঁরই অনুভূতি-অভিজ্ঞতা-রসসিক্ত মানসভূমি। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য জীবনের মধ্যে তাঁর অনুভূত সত্যদর্শন ক্রমিক ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে এক অখন্ড, অবিচ্ছিন্ন রূপ লাভ করেছে। জগৎ ও জীবনে সম্পর্কে তাঁর যে মানস অভিজ্ঞতা ও বোধ সঞ্চিত হয়ে উঠেছিল তারই সৌন্দর্যময় প্রকাশ তাঁর সাহিত্যের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

সুতরাং, বিভিন্ন সময়ে কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধের মধ্যে তাঁর যে মানসের পরিচয় পাওয়া যায়, তার অভিব্যক্তি তৎকালীন নাটকের মধ্যেও রয়েছে এটা লক্ষ্য করবার বিষয়। রবীন্দ্রনাথের নাটক বস্তুতন্ত্রতা সত্ত্বেও তাঁর সাহিত্যের অন্যান্য ধারার সঙ্গে মিলিতভাবে তাঁর কোনো মানস সত্যকেই প্রকাশ করেছে এটা মনে রাখতে হবে।

রবীন্দ্র - প্রতিভা প্রধানত ও প্রথমত কাব্যধর্মী। কাব্যের ক্ষেত্রে তা অঙ্কুরিত হয়েছে এবং এই ক্ষেত্রের মৃত্তিকা ও রস গ্রহণ করে তা পুষ্টিলাভ করেছিল। পরবর্তীকালে এই প্রতিভা এর বহু বিচিত্র চিন্তা এবং মননের বায়ু থেকে খাদ্য গ্রহণ করেছিল বটে, কিন্তু এর মূলদেশের সঙ্গে কাব্যভুমির সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতম হয়ে রয়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের নাটকের মধ্যেও তাঁর সর্বব্যাপী কাব্যময়তা বিরাজ করছে এবং তা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। 'খেয়া' যুগের আগে পর্যন্ত তিনি যে নাটকগুলি লিখেছিলেন, সেইগুলির মধ্যে গীতিকাব্যের প্রভাব অধিকতর পরিস্ফুট। তবে অপরিণত বয়সের প্রাথমিক কয়েকখানা নাটক ছাড়া এই কাব্যভাব তাঁর নাটকের নাটকত্বের কোন ক্ষতি করেনি। 'বিসর্জন', 'মালিনী' প্রভৃতি কাব্য ছন্দে লেখা হলেও নাটক হিসাবে এগুলি তুলনাহীন। 'খেয়া'র আগে পর্যন্ত কবি মন বিশ্বের রূপরস সম্ভোগ আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল, সেইজন্য এই সময়কার নাটকেও উচ্ছ্বসিত সৌন্দর্য-

টিপ্পনী

তরঙ্গের অবারন লীলা, বিশ্বজগৎ এবং মানবজীবনের অকুণ্ঠিত জয়গান লক্ষ্য করা যায়। তখনকার সদাপ্রফুল্লিত চিত্ত হাস্যরসের তরল স্রোতে অতি সহজই ভেসে বেড়াতে চাইত, সেইজন্য তাঁর প্রহসনগুলিরও জন্ম হয় এই সময়ে। 'খেয়া'র পরে 'গীতাঞ্জলী' যুগ থেকে তাঁর মন রূপ থেকে অরূপ রাজ্যে, বিশ্ব থেকে বিশ্বাতীতের পানে অগ্রসর হল। তখন থেকে রূপক তত্ত্বময় নাটকগুলির সূচনা হয়। 'গীতাঞ্জলি', গীতালি', 'গীতিমাল্যে' যেমন বাহ্যজগতের আকুতি ও চাঞ্চল্য অন্তর্জগতের মৌন সাধনায় নিমগ্ন হল, তেমনি পূর্বেকার নাটকগুলির ক্রিয়ায় ঘটনারাশি রূপক নাটকের অন্তগূঢ় ভাবময়তার মধ্যে নির্বাণ লাভ করল। এটাই রবীন্দ্রনাথের নাট্যধারার ইতিহাস।

রবীন্দ্রনাথের আগে পর্যন্ত নাটকে বাহ্য ক্রিয়া এবং সংঘর্ষ খুব বেশি লক্ষ্য করা যায়। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে অন্তজর্গৎ উদ্‌ঘাটিত এবং বিশ্লেষিত হলেও বাহ্য ঘটনার অত্যাধিক প্রাধান্য রয়েছে। আমাদের পূর্বতন নাট্যকারগন তাঁদের নাটকে দৌড়ঝাঁপ, মারামারি, কাটাকাটি ইত্যাদি সস্তা ধরনের রোমাঞ্চকর দৃশ্যের সমাবেশ করে action সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। দর্শকও এই রকম নাটক দেখতে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকের মধ্য দয়ে স্থূল ও রোমাঞ্চময় ঘটনা একেবারে বাদ দিলেন। কিন্তু সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের নাটক যে ক্রিয়াবিরল, নিরাবেগ হয়ে পড়ল তা নয়। উত্তাপ তিনিও সৃষ্টি করলেন তবে তা স্থূল নয়, সূক্ষ্ম। তাঁর নাটক যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে অন্তর এবং বাইরের সব ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রস্তুত এবং প্রখর রাখতে হবে।

রক্তকরবী নাট্যরচনার ইতিহাস :

১৩৩০ সালে গ্রীষ্মবকাশে রবীন্দ্রনাথ যখন শিলঙে বাস করছিলেন, সেই সময় 'যক্ষপুরী' নাম দিয়ে একটা নাটক রচনা করেন। বাংলা ১৩৩৩, ইংরেজী ১৯২৬ এর ডিসেম্বরে 'রক্তকরবী' নামে ঐ নাটকই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। অবশ্য পান্ডুলিপি আকারেই 'যক্ষপুরী' নাম পরিবর্তিত করে গ্রন্থ-প্রকাশের পূর্বে এর নাম তিনি 'নন্দিনী' দিয়েছিলেন। অনেক চিন্তার পর শেষে নাম দেন 'রক্তকরবী'। ১৩৩১ সালের আশ্বিন মাসের প্রবাসী পত্রিকায় 'নন্দিনী' নামের নাটকটি কিছু পরিবর্তিত হয়ে 'রক্তকরবী' নামে প্রকাশিত হয়েছিল।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
74

রবীন্দ্র-জীবনীকার শ্রী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় নাটকটি রচনার যে ইতিহাসটুকু জানিয়েছেন তা খুব মূল্যবান। কবি অমিয় চক্রবর্তীর মাসতুতো ও মামাতো বোন শোভনা দেবী ও নলিনী দেবীর অনুরোধে কবি শিলঙে থাকাকালীন 'শিলঙের চিঠি' নামে একটি কবিতা লেখেন। তার শেষ দুই ছত্রে জানা যায় তিনি একখানি নাটক লেখায় নিযুক্ত।

জানালা দিয়ে বৃষ্টিতে গা ভেজে যদি ভিজুক তো ,

ভুলেই গেলাম লিখতে নাটক আছি আমি নিযুক্ত।

এই নাটকই 'যক্ষপুরী' পরে নন্দনী ও আরও পরে 'রক্তকরবী', 'রক্তকরবী'তে যন্ত্র সভ্যতার ক্লিষ্ট মানুষের বিশেষত শ্রমিকদের যে চিত্র আছে, তার কাঠামোটি কবি লাভ করেছিলেন রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের কাছে । সেই সময় শিলঙে তিনি ছিলেন এবং কবির সঙ্গে প্রায়ই তাঁর দেখা সাক্ষাৎ হত। কিছুকাল পূর্বে রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বোম্বাই এর শিল্প কেন্দ্রের শ্রমিকদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখে এসেছিলেন । এ সব অভিজ্ঞতার কথা কবির কাছে গল্পচ্ছলে তিনি বলতেন । রাধাকমলবাবু প্রভাতবাবুকে জানিয়েছিলেন যে, তাঁর সেই সমস্ত অভিজ্ঞতার কথা কবি খুবই মনযোগ সহকারে শুনতেন। কবির মনে রক্তকরবীর প্লট এইভাবেই জন্ম নিয়েছিল । ১৯২৩ এর ১৬ই মে রবীন্দ্রনাথ অমিয় চক্রবর্তীকে লেখেন, "নাটক গোছের একটা কিছু লেখবার ইচ্ছা আছে।" আর জুন মাসে অমিয় চক্রবর্তীর দুই ছোট বোনের অনুরোধে লেখা কবির চিঠি থেকে জানা গেল কবি নাটক লিখতে শুরু করেছেন। সেই নাটকেরই বর্তমান রূপ রক্তকরবী।

রক্তকরবী নাটকের তত্ত্ব-পরিচয় :

রক্তকরবী নাটক তত্ত্বাশ্রয়ী। এই তত্ত্বটিকে ভালোভাবে না বুঝলে নাটকটির রস আস্বাদন সম্ভব নয়। রক্তকরবী নাটকখানি রূপক নয় এটা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন অথচ নিজেই রামায়ণের কাহিনীর সঙ্গে এর তুলনা করে এর রূপক তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করেছেন। নাটকটির প্রস্তাবনায় তিনি বলেছেন, "কর্ষণজীবী ও আকর্ষণজীবী এই দুই সভ্যতার মধ্যে একটা বিষম দ্বন্দ্ব আছে। এ সম্বন্ধে বন্ধুমহলে আমি প্রায়ই আলাপ করে থাকি । কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে কলিযুগ কৃষিপল্লীকে কেবলি উজাড় করে দিচ্ছে। তাছাড়া শোষনজীবী সভ্যতার ক্ষুধাতৃষ্ণা, দ্বেষ-হিংসা বিলাসবিভ্রম সুশিক্ষিত রাক্ষসেরই মতো । ..... নবদুর্বাদল, শ্যাম রামচন্দ্রের বক্ষসংলগ্ন সীতাকে স্বর্ণপুরীর অধীশ্বর দশানন হরণ করে নিয়েছিল , সেটা সেকালের কথা, না এ কালের ? ... তখনো কি সোনার খনির মালিকেরা নবদূর্বাদলবিলাসী কৃষকের ঝুঁটি ধরে টান দিয়েছিল । . ..... আজকের দিনের রাক্ষসের মায়া - মৃগের লোভেই তো আজকের দিনের সীতা তার হাতে ধরে পড়েছে ; নইলে গ্রামে পঞ্চবট ছায়া শীতল কুটির ছেড়ে চাষীরা টিটাগড়ের চটকলে মরতে আসবে কেন। ..... রত্নাকর গোড়ায় ছিলেন দস্যু। তারপর দস্যুবৃত্তি ছেড়ে ভক্ত হলেন রামের। অর্থাৎ ধর্ষণ বিদ্যার প্রভাব এড়িয়ে কর্ষণ বিদ্যায় যখন দীক্ষা নিলেন, তখনি সুন্দরের আশীর্বাদে তাঁর বীনা বাজল। ..... হঠাৎ মনে হতে পারে রামায়ণটা

টিপ্পনী

রূপক কথা। বিশেষত যখন দেখি রাম রাবণ দুই নামের দুই বিপরীত অর্থ। রাম হল আরাম, শান্তি। রাবণ হল চীৎকার, অশান্তি। একটিতে নবাঙ্কুরের মাধুর্য, পল্লবের মর্মর ; আর একটিতে শান বাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে দৈত্যরথের বীভৎস শৃঙ্গধ্বনি।"

টিপ্পনী

"রক্তকরবী" নাটকের প্রস্তাবনায় রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, তিনি নাটকটির মধ্যে এমন একটি সমস্যাকে রূপ দিয়েছেন তা যেমন একালের তেমনি তা সেকালের এমনকি রামায়ণের যুগেরও। রামায়ণের মূলভাবের সঙ্গে এ নাটকের মূল বক্তব্যের চমৎকার সাদৃশ্যও তিনি অনুভব করেছেন। তিনি মনে করেন রামায়ণের রামচন্দ্র কৃষিবিদ্যার ধারক ও বাহক। তিনি নবদুর্বাদল -শ্যাম। তিনি শান্তি ও আরামের আশ্রয়। অন্যদিকে রাবণ স্বর্ণলঙ্কার অধীশ্বর, প্রচন্ড শক্তিমান ও ঐশ্বর্যশালী। তিনি যন্ত্রনির্ভর ধনতান্ত্রিক সভ্যতার ধারক ও বাহক। অশান্তি ও চীৎকারের আশ্রয় রাবণ। রামচন্দ্রের কর্ষনজীবী সভ্যতার সঙ্গে রাবণের আকর্ষণজীবী সভ্যতার বিরোধ দেখা দিয়েছিল রামায়ণে। সীতা শব্দের অর্থ 'লাঙ্গল - চিহ্নিত রেখা' - অর্থাৎ কৃষিবিদ্যার প্রতীক। আকর্ষণজীবী সভ্যতা স্বর্ণমায়ামৃগ সৃষ্টি করে কর্ষণজীবী সভ্যতার মানুষকে প্রলুব্ধ করেছে রামায়ণে। তাই সীতার অনুরোধে স্বর্ণমায়ামৃগ ধরতে গিয়ে রামের বিভ্রান্তি ও সেই সুযোগে সীতার অপহরণ। আর নারীরূপী সীতা পঞ্চবটী ছায়াশীতল কুঞ্জ থেকে অপহৃতা হয়ে যেদিন স্বর্ণলঙ্কায় উপস্থিত হয়েছে, সেদিন থেকে দুই সভ্যতার বিরোধ স্পষ্টভাবেও দেখা দিয়েছে এবং রাবণের আকর্ষণজীবী সভ্যতার ধীরে ধীরে দুর্দিন ঘনিয়ে এসেছে। শেষ পর্যন্ত কৃষিনির্ভর সভ্যতার শান্তির কাছে যন্ত্রসভ্যতার ঐশ্বর্যময়ী সভ্যতার অশান্তির অবসান ঘটেছে। ঐশ্বর্যে, প্রতাপ ও শক্তিতে রাবণ মদমত্ত। স্বর্ণালঙ্কার সকলকে ছাড়িয়ে গিয়ে ইনিও যেন নিজের চারিদিকে একটা গন্ডী টেনে দিয়েছিলেন। অথচ তারই গৃহে তাঁরই সহোদর বিভীষণ ছিললেন পুণ্যাত্মা। তিনি ঐ প্রস্তাবনায় তাই বলেছেন, 'একই নীড়ে পাপ ও সেই পাপের মৃত্যুবাণ লালিত হয়েছে। আমার স্বল্পায়তন নাটকে রাবণের বর্তমান প্রতিনিধিটি এক দেহেই রাবণ ও বিভীষণ। সে আপনাকে আপনি পরাস্ত করে।

রামায়ণের এই বিশ্লেষণের আলোকে 'রক্তকরবী' নাটকটি দেখা যেতে পারে। এ নাটকের ও সমস্যা হল কর্ষণজীবী সভ্যতার সঙ্গে আকর্ষণজীবী সভ্যতার দ্বন্দ্ব। তবে সময় বদলে গেছে তাই সংকটের রূপ পাল্টে গেছে। এখানে কর্ষণজীবী বা কৃষি সভ্যতার সঙ্গে সামগ্রিকভাবে ধনতান্ত্রিক যন্ত্রনির্ভর সভ্যতার দ্বন্দ্ব দেখানো হয়নি এবং যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে তা বিশেষ একটি অবস্থাগত। রবীন্দ্রনাথ ভালোভাবেই জানতেন যে, কৃষিসভ্যতা পৃথিবীর বুকে চিরকাল টিকে থাকবে না - ইতিহাসের অনিবার্য ধারায় যন্ত্রসভ্যতা আসবেই। যন্ত্রসভ্যতার আগমন মাত্রই নিন্দনীয় নয়। খনির মধ্যে বহু মূল্যবান সোনা উদ্ধার করতে গেলে প্রচুর খোদাইকর শ্রমিকের যেমন দরকার, তেমনই নানা যন্ত্র, যন্ত্রবিদ বস্তুতত্ত্ববিদ অধ্যাপকের

দরকার । অতিরিক্ত মজুরী বা মাইনের আকর্ষণে কৃষিবিদ্যা ছেড়ে মানুষ কলে কলকারখানায় কাজ করতে ছুটে আসে । যতদিন পর্যন্ত মানুষ তার শুভবুদ্ধিকে অক্ষুন্ন রেখে মানবকল্যাণের অভিমুখে যন্ত্রকে বাহন করে কাজ করে যেতে পারে, ততদিন পর্যন্ত যন্ত্রনির্ভর সভ্যতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের কোন বিরূতা নেই । কিন্তু ধনৈশ্বর্য বা স্বর্ণের নেশায় মত্ত হয়ে খনির মালিক ক্রমশ নিজের শুভচেতনা হারিয়ে ফেলেন। সঞ্চয়ের নেশায় কর্মরত খোদাইকরদের মানুষ বলেই তখন তিনি আর মনে করেন না। এখানেই রবীন্দ্রনাথের প্রচন্ড প্রতিবাদ। 'রক্তকরবী' নাটকে কৃষি সভ্যতার সৌন্দর্য, আনন্দ ও প্রাণের প্রতীক নন্দিনী, মকররাজ হলেন আকর্ষণজীবী সভ্যতার নিষ্ঠুরতা, হৃদয়হীনতা ও শুভবুদ্ধিলুপ্ত মানবিক চেতনার প্রতীক। এই দুয়ের সংঘর্ষই নাটকের মূল উপজীব্য।

'রক্তকরবী' তে রবীন্দ্রনাথ রূপক (Allegory) ও সাঙ্কেতিক (Symbolism) নাট্যের সমন্বয় করেছেন । 'রক্তকরবী'তে যে রূপক আছে তা শুধুমাত্র প্রাচীন ভারতবর্ষের ক্লৈব্যের নয়, বর্তমান ইউরোপীয় যন্ত্রসভ্যতার বিশ্বগ্রাসী শক্তির, এই যন্ত্রসভ্যতার প্রতীক হল রাজা, সে থাকে জাল দেওয়া ঘরের অন্তরালে। সে অদৃশ্য, কিন্তু তার শক্তি অপরিসীম, ক্ষুধাও অপরীসিম । অথচ রাজার মনে এই শক্তি ও ভীষণ সাফল্যের সঙ্গে রয়েছে অনন্ত ব্যর্থতার বিরাট অতৃপ্তি। নাটকের শেষে ছাড়া আর সব সময়েই রাজা থাকে নেপথ্যে, কিন্তু তার শক্তির শেষ নেই, কত লোক সোনার কাজে এসেছে, কেউই নিস্তার পায় নি। এটিই যন্ত্রসভ্যতার উপযুক্ত প্রতীক, এই সভ্যতার নিষ্পেষণ থেকে কেউই আত্মরক্ষা করতে পারছে না, অথচ ঠিক কোথায় যে এর শক্তি, কোথায় যে এর ভীষণ আকর্ষণ তাও বুঝতে পারা যায় না। এই সভ্যতা শুধু বিরাট নয়, তা ভয়ঙ্কর, কারণ তা রহস্যময়। এই শক্তির কেন্দ্রে রয়েছে অত্যন্ত জটিল জালের আবরণের আড়ালে ; আমরা শুধু বাইরের ঘটনা দেখতে পাচ্ছি। 'রক্তকরবী'র রাজা বিরাট সৃষ্টি। রাজার শক্তির অভিব্যক্তি কবি দেখিয়েছেন কয়েকটি খন্ডদৃশ্যের মধ্য দিয়ে। ফাগুলাল, চন্দ্রা, বিশু, সর্দ্দার, গোঁসাই, কিশোর, গোকুল --- এদের জীবনের মধ্যেই যন্ত্রসভ্যতার প্রভাব রয়েছে, সবাই নিষ্পেষিত হচ্ছে, কেউ কেউ নিষ্পেষণ যন্ত্রের অঙ্গীভূত হয়েছে আবার কারও ভাগ্যে জুটেছে অবিমিশ্র নির্যাতন। জীবন এখানে জড়তাগ্রস্থ, প্রাণের অবারিত আনন্দ ও প্রসন্নতা বিদায় নিয়েছে অথচ যক্ষপুরীর যন্ত্রবদ্ধ মানুষ তাদের জীবনের এই মর্মান্তিক অবস্থাকে বোঝবার শক্তিও ক্রমে হারিয়ে ফেলেছে। একমাত্র রাজা নিজের নিঃসঙ্গতা ও শূন্যতায় ব্যাথা অনুভব করেন কখনও কখনও। তাই শুভ - অশুভের দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে তার মধ্যে । এই রাজাকে উদ্ধার করলে অন্যান্যরাও মুক্তি পাবে । তাই রাজাকে উদ্ধার করাই নাটকের আসল কথা। আর এরই জন্য নন্দিনীর আবির্ভাব।

সৌন্দর্য, আনন্দ ও প্রাণের প্রতীক নন্দিনী, রঞ্জন হচ্ছে যৌবন প্রেমের

টিপ্পনী

টিপ্পনী

প্রতীক। নন্দিনী ও রঞ্জনকে যুক্ত করে নিলেই সোন্দর্য, আনন্দ, প্রেম ও যৌবন তথা শক্তি পূর্ণতা লাভ করে। নন্দিনী তার প্রসন্নতা আর প্রাণের স্পর্শ দিয়ে শুধু রাজাকে নয়, অধ্যাপক ও অন্যান্য অনেককে চঞ্চল করেছে। অনেকেই তাকে ঠিক বোঝে না। কিন্তু সে বিশুপাগলের সহায়তায়, কিশোরের কল্যাণ-কামনায় ও রঞ্জনের মূল প্রেরণায় যক্ষপুরীতে অন্ধকার কক্ষে আলো ঢেলে দিয়ে সেখানকার রাজাকে উদ্ধার করবে। নন্দিনীর ভূমিকার কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "জেলেদের জালে দৈবাৎ মাঝে মাঝে অখাদ্য জাতের জলচর জীব আটকা পড়ে। তাদের দ্বারা পেটভরা বা ট্যাঁকভরার কাজ তো হয়ই না, মাঝের থেকে তারা জাল ছিঁড়ে দিয়ে যায়। এই নাট্যের ঘটনাজালের মধ্যে নন্দিনী নামক একটি কন্যা তেমনিভাবে এসে পড়েছে। মকররাজ যে বেড়ার আড়ালে থাকেন, সেটিকে এ মেয়ে টিকতে দেয় না বুঝি।" নাটকের শেষে রঞ্জনের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে রাজা তাঁর হারানো যৌবন, প্রেম ও প্রাণকে ফিরে পেয়েছে - তার মুক্তি ঘটেছে। বন্দীশালা থেকে বিশুকে বের করা হয়েছে।ফাগুলাল, অধ্যাপক ও মেজোসর্দার রাজার দলে এসেছে। আশা করা যায় সর্দারও নিজের ভুল বুঝে নন্দিনীর আদর্শে মুক্তি লাভ করবে। রঞ্জন মারা গেলেও তার অপরাজিত কণ্ঠস্বর নন্দিনী তখনও শুনেছে। 'ও কখনো মরতে পারে না'।

'ডাকঘরে' অমলের মৃত্যু, 'মুক্তধারা অভিজিতের মৃত্যু যে অর্থে মৃত্যু নয় মুক্তি, ঠিক সেই অর্থেই রঞ্জনের মৃত্যুও মহামুক্তি। তার মৃত্যু রাজার হারানো প্রানের উদ্বোধক, যৌবন, প্রেম, ও আনন্দের জীবন থেকে কি চিরনির্বাসন ঘটতে পারো ? জ্ঞানপন্থীদের কঠোর সাধনা, পুঁথিগত শাস্ত্র বিদ্যার প্রতি অন্ধ আনুগত্য জীবনে সরস, প্রবাহকে কেমন রুদ্ধ করেছিল তার কথা 'অচলায়তন' নাটকে আছে । 'রক্তকরবী'তে যন্ত্রবদ্ধ মানুষের এবং যন্ত্রশক্তিতে শক্তিশালী রাজার শোচনীয় দুর্গতি এবং তা থেকে মুক্তির কথা বলা হয়েছে। মানবত্মার মুক্তিতত্ত্বের বিষয়টিই নাটকের আসল তত্ত্ব। আর এ তত্ত্বকে রূপ দিতে গিয়ে যে কাহিনীকে গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যস্থার শাসন ও শোষণের চিত্র, শ্রমিক - অসন্তোষ, শ্রমিক বিদ্রোহের শেষে রাজা ও প্রজার মধ্যে মধুর সম্পর্ক স্থাপন এবং মুক্তি ইঙ্গিত নাটকের মধ্যে আছে। আছে বন্ধন পীড়িত মানবত্মার মুক্তিকামনা ও শেষ পর্যন্ত মুক্তির আভাস।

'রক্তকরবী' রচনার প্রেক্ষাপট

শুধু রবীন্দ্রনাট্যধারায় নয়, সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের সাপেক্ষেও নাটকটি অনন্য। উপনিষদীয় আনন্দবাদে স্নাত কলাকৈবল্যবাদী রীন্দ্রনাথের এ এক অন্যমুখ। নিছক শৈল্পিক বিলাসবোধ থেকে এ নাটক লেখা হয়নি। এখানে এমন কিছু কথা বলা হয়েছে যা শিল্পের সীমা ছাড়িয়ে অন্য কোনো সত্যকে স্পর্শ করতে হাত বাড়ায়। আর

সে সত্যের অভিমুখ মানুষের প্রয়োজনে শিল্প-সাহিত্যকে ব্যবহার করার দিকে।

রক্তকরবী (১৯২৬) এক হিসাবে রবীন্দ্র জীবনের উপান্ত পর্বের ফসল। ততদিনে পূরবী (১৯২৫) রাগে রবি কবির নিজের কথাতেই 'শেষ রাগিণীর বীণ' বেজে গেছে। মনে হতে পারে যে নিভে যাওয়ার সম্ভাবনায় শঙ্কিত রবীন্দ্রনাথ এখন গুটিয়ে নিতে চাইছেন। কিন্তু বাস্তব এ ভাবনাকে মিথ্যা প্রমাণ করল। সম্পূর্ণ বিপরীত স্রোতে ভেসে এল রক্তকরবী। কিন্তু কোন্ দুর্বার তাগিদ অনুভব করলেন কবি?

টিপ্পনী

এর সন্ধান পেতে হলে ফিরে তাকাতে হবে সেদিনের পৃথিবীর দিকে। সময় দ্রুত রং বদলাচ্ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াভয় স্মৃতিকে তখনও বিস্মৃতির গভীরে নির্বাসন দেওয়া সম্ভব হয় নি। এরই মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নতুন করে শুরু করেছিল তাদের তাল ঠোকাঠুকি। অশান্ত ইউরোপ - আমেরিকা। ঘোর দুর্যোগের পূর্বাভাস সেখানকার আকাশে বাতাসে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পুচ্ছাংশ হিসাবে ভারতের বায়ুমন্ডলেও তখন বারুদের গন্ধ। পরাধীন ভারতবাসী স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। রক্ত ঝরছে পথে প্রান্তরে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শোষিত নিষ্পেষিত মানুষও তুলে নিয়েছেন হাতে প্রতিবাদের পতাকা। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এমন সংকটে বিচলিত রবীন্দ্রনাথ। সুস্থ মানবতার সন্ধান করেছেন দেশে বিদেশে। কোথাও তার স্পর্শমাত্র পাচ্ছেন না। ইউরোপ-আমেরিকা তো সবাই ধূসর। এক সীমাহীন শূন্যতার ফাঁসে আটকে গিয়ে মানবতা সেখানে ভাষা হারিয়েছে। এত শূন্যতার কারণ শুধু সাম্রাজ্যবাদীদের মদমত্ততা নয়। সাম্রাজ্যবাদের দোসর যে যন্ত্রসভ্যতা তথা ধনতান্ত্রিক অর্থশক্তি তাই এখানে সুস্থ মানবতার পথের প্রধান প্রতিবন্ধক। যন্ত্রসভ্যতার পীড়নে নিষ্পেষিত মানুষ ভুলতে বসেছে তাদের অতীত ও ভবিষ্যত। এখন সত্য শুধু বর্তমান। আর সে বর্তমানের রং কালো, ভয়ঙ্কর রকমের কালো। মানুষ এখানে মানুষের মতো বাঁচতে চায় না, চায় শুধু মোহের আগুনে দগ্ধ হতে। আরও চাই আরও চাই। পৃথিবীর সম্মিলিত সম্পদের ঢিবির পর প্রতিষ্ঠিত হোক আমার সিংহাসন। এমনি বীভৎস এক স্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্ন গোটা সমাজ-সভ্যতা। সব দেখেশুনে ভীষণ আহত কবি -

> "আমেরিকার অবস্থানকালে, যন্ত্রসংখ সমূহ (Organisations) ব্যক্তিগত মানুষকে একেবারে নির্বাসন দিয়া যন্ত্রগত মানুষকে (Mechanical) প্রকান্ড পদ্ধতি পিন্ডের মধ্যে সংহত করিয়া প্রচন্ড শক্তি অর্জন করিয়া দ্রুত ও বিপুল প্রসার লাভ করিতেছে দেখিয়া আমার মন পীড়িত হইয়াছিল। এবং সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা আমি কয়েকবার বলিয়াছিলাম - মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, তাহার দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় প্রাণ ও অনুভূতির অভাব প্রতিদিন

টিপ্পনী

নাড়িয়া চলয়াছে এবং মানুষ ধীরে ধীরে এই যন্ত্রেই অংশমাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়া কর্তব্য ও দায়িত্ববোধের প্রয়োজন সে অনুভব করে না। প্রাণশক্তিকে পরিহার করাতে এই যন্ত্রবদ্ধ জড়শক্তির দোহাই দিয়া আজিকার দিনে ভয়াবহ অত্যাচার ও অবিচার করা সহজসাধ্য হইয়াছে - কারণ জড়শক্তি অন্য সকল বিচার-বিবেচনাকে পদদলিত করিয়া আপন উদ্দেশ্য-সাধনে দ্বিধাহীন নির্মম গতিতে অগ্রসর হয়।"

রক্তকরবীর মূল নিহিত রয়েছে রবি-কবির এই আহত জীবনবোধের গভীরে। রবীন্দ্রনাথ এমন একজন ব্যক্তিত্ব যিনি নিজেকে ছাপিয়ে যান বারেবারে। তিনি স্বঘোষিত কলাকৈবল্যবাদী। আবার কলাকৈবল্যবাদের সীমা অতিক্রম করার প্রবণতা ও তাঁর মধ্যে খুব স্পষ্ট। শিল্পের সৌন্দর্যলোক থেকে অবতরণ করে তিনি প্রায়শ মর্তের ধূলিধূসরিত অঙ্গনে এসে দাঁড়িয়েছেন মাটি-মানুষেরা কর্ষণে কক্ষচ্যুত হয়েছে তাঁর সৌন্দর্য্যপিয়াসী কবিমন, থেমে গেছে সব চঞ্চলতা। এই রোমান্টিকতার উত্তুঙ্গ শিখরে বিহারের ক্ষণেও লেখা হয়েছে অক্ষমা, দারিদ্রের মতো কবিতা। মানুষের প্রয়োজনে লেখনী চালনার চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে রবীন্দ্র-সাহিত্যে যত্রতত্র। রক্তকরবী সেদিক থেকে রবীন্দ্রসাহিত্যে কোনো ব্যাতিক্রমী সংযোজন নয়। এর ঐতিহ্য রবীন্দ্র্যসাহিত্যে আছে।

'রক্তকরবী' নাটকের সমস্যা আধুনিক এবং রবীন্দ্রনাথের আমেরিকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতাই যে এই নাটকের সাক্ষাৎ অনুপ্রেরণা, এমন কথা বস্তুবাদী ও বীক্ষণশীল সমালোচকগণ মনে করে থাকেন। একথা মনে করার স্বপক্ষে যুক্তি অনেক আছে - রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনে এবং রক্তকরবী নাটকে। পশ্চিমী সভ্যতার ধনমদমত্ত যে প্রাণহীন রূপ ইনি দেখেছিলেন, তাঁর নিজের ভাষায় 'টাইটানিক ওয়েলথ' তার অভিশপ্ত দিকটি নাটকে প্রকাশ পেতেই পারে স্বাভাবিক ভাবে। নাটকটির অনুপুঙ্খ পাঠ থেকেও দেখা যায় আমেরিকান ধনতন্ত্রে কাঠামো তাঁর জানা ছিল বেশ ভালোভাবেই। যে-কোনও লেখকই যেহেতু সাহিত্যকর্মে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ওপরই অনেকটা নির্ভর করেন, সদ্যোলব্ধ তাঁর এই বীভৎস অভিজ্ঞতা একটি কালজয়ী নাটকে ধরা পড়তে অনায়াসেই।

তবে একথা ঠিক রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখা সম্পর্কে নিজের ব্যাখ্যানকে মূল্য দিতে গেলে বিভ্রান্তি জন্মায় অনেক সময়। 'নাট্যপরিচয়' অংশ তিনি বলেছেন, 'এটি সত্যমূলক', সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেছেন ' এই ঘটনাটি কোথাও ঘটেছে কিনা ঐতিহাসিকের পরে তার প্রমাণ সংগ্রহের ভার দিলে পাঠকদের বঞ্চিত হতে হবে এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে কবির জ্ঞানবিশ্বাস মতে এটি সম্পূর্ণ সত্য।'

রবীন্দ্রনাথের বলা কথাকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। তাঁর চিন্তায় সত্য এবং বাস্তব অর্থাৎ Truth এবং Really -র মধ্যে অনেক প্রভেদ। বাস্তব সত্য বা Factual truth অপেক্ষা তিনি অনেক বেশি মূল্য দেন কবির অনুভুত সত্যকে যাকে এখানে বলেছেন, 'কবির জ্ঞানবিশ্বাস মতে সত্য। এ বিষয়ে তাঁর সেই কবিতা বিখ্যাত হয়ে আছে যেখানে তিনি বলেছেন কবির নিজের মনোভূমি রামের জন্মস্থান হিসেবে অযোধ্যার চেয়ে অনেকবেশি সত্য। এই রকম যাঁর ধারনা তাঁর নাটকের মূলে শুধুমাত্র পশ্চিমী সভ্যতার নগ্নরূপ আছে। মনে করাটা একটু অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়ায়। অথচ তিনি আমাদের নাট্যপরিচয় অংশেই বলেন এই নাটকের একটি বাস্তব ভৌগোলিক পটভূমি আছে, 'যে-জায়গাটার কথা হচ্ছে সেখানে মাটির নীচে যক্ষের ধন পোঁতা আছে।' অর্থাৎ যে-কোনও খনি অঞ্চল, সোনার খনি হওয়াই সম্ভব, যেহেতু সেখান থেকে তাল তাল সোনা খুঁড়ে আনার কথা নাটকে লেখা আছে। অবশ্য সোনার খনিতে তাল তাল সোনা থাকে না। থাকে সোনার আকরিক। তাই অর্থের দিক থেকে অন্যান্য লাভজনক কোনও আকরিক আছে, এইরকম একটা খনি অঞ্চলকেই নাটকের পটভূমি হিসাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কোনও বিশেষ অঞ্চলকে সম্ভবত নাট্যকার বেছে নেননি , কারণ সেক্ষেত্রেই বলা সম্ভব, এই অঞ্চলের চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে গেলে ভৌগোলিকদের মধ্যে মতভেদ ঘটবে। অর্থাৎ কোনও বিশেষ অঞ্চলের প্রাণহীন ধনসঞ্চয় রবীন্দ্রনাথের এই রচনার উৎস কিনা, সেকথা তিনি এখানে বেশ সতর্কভাবেই গোপন করে গিয়েছেন।

নাট্যপরিচয় ছাড়া 'রক্তকরবী' নাটক সম্বন্ধে তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা রবীন্দ্রনাথ যে সব জায়গায় করেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত (বৈশাখ ১৩৩২) কবির একটি অভিভাষন যা পরে 'রক্তকরবী' নাটকে 'প্রস্তাবনা' হিসাবে মুদ্রিত হয়েছে। এখানে বারবারই রবীন্দ্রনাথ 'রামায়ণ' মহাকাব্যের সঙ্গে তাঁর এই নাটকের তুলনা করেছেন। তিনি রামায়ণের রূপকর্মের প্রতি কিছু কিছু ইঙ্গিত দান করে দুটি সাহিত্য কীর্তির সাধর্ম্য দেখিয়েছেন। রামায়ণ মহাকাব্যে রাবণ ছিল অমিত শক্তিধর, এই নাটকের রাজাও তাই। সেখানেও একটি মানবকন্যা তার সর্বনাশের উপলক্ষ হয়েছিল, এখানে নন্দিনী অনেক সক্রিয় সে কাজ করেছে। রামায়ণ মহাকাব্যের মতো বানরসেনা এখন নেই, কিন্তু নাট্যকারের অভিমত,'কলিযুগের রাক্ষসদের সঙ্গে কলিযুগের বানরের যুদ্ধ ঘটবে, এমনও একটা সূচনা আছে।' এই যে রামায়ণ মহাকাব্যের সঙ্গে নিজের নাটকের মিল দেখেন, অথচ বলেন রূপক অর্থে তাদের গ্রহণ করাটা সংগত নয়, এর কারণ মানুষ সম্বন্ধে এক সাধারণ সত্যের কথা এই দুই সাহিত্যেই আছে বলে মনে হয়েছে। মানুষের মনুষ্যত্ব আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে মানুষ পরিণত হয় পশুতে। সেই পাশব শক্তি সত্য নয়। সত্যটি মানুষের মনুষ্যত্বে প্রত্যাবর্তন।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার হাত ধরে এই সত্যটি বারবার নিজেকে প্রমাণিত করে। রামায়ণ মহাকাব্যে তা একটা উপলক্ষ নিয়ে এসেছে, 'রক্তকরবী' এ এসেছে আধুনিক সমস্যার চেহারা নিয়ে - কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটাই সত্য এরা উদ্ভাসিত করেছে, সেটা হল মনুষ্যত্বের সঙ্কট এবং তা থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার সংগ্রাম।

রক্তকরবী নাটকে চরিত্র পরিচয় :

রাজা : - এই নাটকের দুটি চরিত্র সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ রাজা ও নন্দিনী। এই দুজনের মধ্যে রাজা একই সঙ্গে রহস্যময় ও মানবিকতার দিক থেকে খুবই জীবন্ত। 'গ্রন্থ পরিচয়' এ রবীন্দ্রনাথ রাজা চরিত্রের যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন তাতে দেখা যায় তার রাজার মধ্যে দুটি সত্তা একই সঙ্গে বর্তমান। তিনি লিখেছেন, 'আমার পালায় একটি রাজা আছে। আধুনিক যুগে তার একটার বেশী মুন্ড ও দুটোর বেশি হাত দিতে সাহস হল না। আদি কবির মতো ভরসা থাকলে দিতেম। বৈজ্ঞানিক শক্তিতে মানুষের হাত পা মুন্ড অদৃশ্যভাবে বেড়ে গেছে। আমার পালায় রাজা যে সেই শক্তিবাহুল্যের যোগোই গ্রহণ করেন, গ্রাস করেন নাটকে এমন আভাস আছে। ত্রেতাযুগের 'বহুসংগ্রহী বহুগ্রাসী" রাবণের প্রতাপ চিরদিন অক্ষুন্ন থাকতে পারত। কিন্তু তাঁর দেবদ্রোহী সমৃদ্ধির মাঝখানে হঠাৎ একটি মানবকন্যা এসে দাঁড়ালেন, অমনি ধর্ম জেগে উঠলেন। ..... আমার নাটকে ঠিক এমনটি ঘটে নি, কিন্তু এর মধ্যেও মানবকন্যার আবির্ভাব আছে। তাছাড়া, কলিযুগের রাক্ষসের সঙ্গে কলিযুগের রাবণের যুদ্ধ ঘটেছে , এমনও এক সূচনা আছে। ..... আমার স্বল্পায়তন নাটকে রাবণের বর্তমান প্রতিনিধিটি একই দেহে রাবণ ও বিভীষণ ; সে আপনাকেই আপনি পরাস্ত করে।"

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি থেকে জানা যায় যে, তাঁর রাজা বৈজ্ঞানিক শক্তিতে প্রচন্ড শক্তিমান, কিন্তু রাজার মধ্যে রাবণ ও বিভিষণ অর্থাৎ পাপবুদ্ধি ও 'পাপের মৃত্যুবাণ' ধর্মবুদ্ধি একই সঙ্গে অবস্থান করেছে। তবে ধর্মবুদ্ধি প্রচ্ছন্নভাবে আত্মগোপন করে আছে, - তাকে পাপ বুদ্ধি প্রবল রাজা বড় একটা আমল দিতে চান না। অথচ এই ধর্মবোধ বা শুভবোধকে জাগ্রত করে মানুষ রাজাকে উদ্ধার করার জন্য নন্দিনী নামক এক মানবকন্যার আবির্ভাব ঘটেছে। সে যাই হোক, এই দুই বিপরীত সত্তার দ্বন্দ্বের রাজার চিত্ত এ নাটকে ধীরে ধীরে সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে এবং এই দ্বন্দ্বই রাজার চরিত্রকে মানবিকতায় চমৎকার মন্ডিত করেছে।

শক্তিমান ও ক্ষমতাশালী রাজা তার যক্ষপুরীতে খোদাইকরদের দিয়ে নির্মমভাবে তাল তাল সোনা সংগ্রহ করে চলেছেন। সঞ্চয়ের নেশায় তিনি এমনই মোহগ্রস্থ যে তার শুভ চেতনা একপ্রকার লুপ্ত, মনুষ্যত্বও আবৃত। তাই নিজের রচিত

জালের আড়ালে তাকে বাস করতে হচ্ছে। নন্দিনী বলেছে অধ্যাপককে, 'তোমাদের রাজাকে এই একটা অদ্ভুত জালের দেওয়ালের আড়ালে ঢাকা দিয়ে রেখেছে, সে যে মানুষ পাছে সে কথা ধরা পড়ে।"

রাজা নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। কোন অবসর নেই তার। প্রাণের দুটো কথা বা মনুষ্যত্ব উদ্বোধক কোনো কিছু আলাপের তার সময় নেই। নন্দিনীর হাতে গাঁথা কুন্দ ফুলের মালা পরতেও তাঁর ইচ্ছে হয় না। দূরে বাইরে সে ফসলকাটার গান চলেছে, তা শোনবারও তাঁর সময় নেই। নন্দিনীর ডাকে সাড়া দিতে চান না তিনি। তিনি যক্ষপুরীর অধীশ্বর, তিনি প্রচন্ড ও ভয়ঙ্কর, অর্থসঞ্চয়ের নেশায় মাতাল এবং দুদন্ড প্রাণের আলাপনে অবসরহীন। এই ভাবে রাজা অত্যন্ত নিঃসঙ্গ ও সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই তিনি বলেন, 'আমি পর্বতের চূড়ার মতো, শূন্যতাই আমার শোভা, 'নন্দিনীর কথায়, 'দেখলুম মানুষ, কিন্তু প্রকান্ড কপালখানা যেন সাতমহলা বাড়ীর সিংহদ্বার, বাহুদুটো কোন্ দুর্গম দুর্গের লোহার অর্গল। মনে হল যেন রামায়ণ মহাভারত থেকে নেমে এসেছে কেউ। সোনা সংগ্রহের কাজে কতো মানুষকে কাজে লাগানো হয়েছে - কত রকম আয়োজনে তাদেরও মনুষ্যত্বকে পিষে ফেলা হয়েছে ও হচ্ছে, কতো মানুষ তাঁকে অভিসম্পাত দিচ্ছে কিন্তু বিবেকহীন রাজা নির্বিকার। তিনি যে কতো বড় নিষ্ঠুর আর কতো বড় দেবদ্রোহী তা জানেন বলেই বলেন, 'সৃষ্টিকর্তার চাতুরী আমি ভাঙি। বিশ্বের মর্মস্থানে যা উকানো আছে, তা ছিনিয়ে নিতে চাই, সেই সব ছিন্ন প্রাণের কান্না।' তিনি আরো জানিয়েছেন যে, তিনি 'সাথীহীন মধ্যাহ্ন সূর্য।' তাঁর হাতে কখনো থাকে বাজপাখি, কখনো মরা ব্যঙ। আকস্মিকভাবে দুরন্ত রেগে বাজপাখির মতো যক্ষপুরীতে মানুষ নিয়ে আসা তার স্বভাব। মরা ব্যাঙের মতোই তিনি চিরকাল টিকে থাকতে চান।

কিন্তু মকররাজের এই পরিচয়টুকু তাঁর চরিত্রের বড় অংশ হলেও সব নয়। তাঁর চরিত্রের গভীরে তাই নিজ মানুষীসত্তাকে হারানোর জন্য একটা কান্না আছে। নন্দিনীর সঙ্গে কথায় রাজার সেই সত্তার পরিচয় মেলে। তাই নন্দিনীর অপরূপ রূপকে তিনি হাতের মুঠোয় এনে উলটিয়ে দেখতে চান। তাঁর রক্তকরবীর আভাটুকুকে চোখে অঞ্জন করে পরতে না পারার জন্য তিনি বেদনাবোধ করেন। নন্দিনীকে বলে ওঠেন তিনি, 'বুঝতে পারবে না। আমি প্রকান্ড মরুভূমি, তোমার মতো একটি ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি, আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত।' রাজার ঘরে ঢুকে নন্দিনী দেখেছে রাজা তাকে আদর করতে কতো ইচ্ছুক। নন্দিনী নিজের হাতে রক্তকরবীর মঞ্জুরী তাঁকে কবে পরিয়ে দেবে তার জন্যও তাঁর দীর্ঘশ্বাস পড়ে। তিনি তাই নন্দিনীকে না বলে পারেন না "সেই গুচ্ছ গুচ্ছ কালো চুলের নিচে মুখ ঢেকে ঘুমাতে ভারি ইচ্ছে করছে।" রাজা চরিত্রের এই অন্তর-দ্বন্দ্ব এবং জালবন্দী হয়ে নিঃসঙ্গ জীবনের একাকিত্ব ও বিচ্ছিন্নতা তাঁকে আধুনিক মানবের

টিপ্পনী

সামীপ্য এনে দিয়েছে।

রাজার এই পরিবর্তন অধ্যাপকের ও দৃষ্টি এড়ায় নি। তিনি পুরাণবাগীশকে বলেছেন, - 'রাজাকে দেখে মনে হচ্ছে, ওঁর সঞ্চয় - সরোবরের পাথরটাতে চাঁড় লেগেছে ; তলাটা ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ে এসেছে।" অধ্যাপকের বস্তুবিদ্যাকে উজাড় করে নিলেও প্রাণপুরুষের সন্ধান মেলেনি। এই প্রাণপুরুষের জন্যই দেখা দিয়েছে তাঁর কাঙালপনা। রাজার মধ্যে এই দোলাচল, দ্বন্দ্ব নন্দিনীর কাছে এসে আরো স্পষ্ট হয়েছে। রাজার মধ্যে যেন অদ্ভুত - কিম্ভুতের সমাবেশ। নন্দিনী তাঁর অদ্ভুত সত্তায় আকৃষ্ট। আর যক্ষপুরীর মানুষ তাঁর কিম্ভূত সত্তাটায় ভীত, সন্ত্রস্ত। চিকিঃসক একে অসুখ বলে বুঝেছে - 'দেখলুম, রাজা নিজের 'পরে নিজে বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। এরোগ বাইরের নয়, মনের।"

টিপ্পনী

নন্দিনীর প্রতি আকর্ষণে রাজা রঞ্জনেরপ্রতি ঈর্ষান্বিত। নন্দিনী যে রঞ্জনের, একথা তিনি সহ্য করতে পারেন না। নন্দিনী রঞ্জনের মতোই তাঁকে ভালোবাসে কিনা জানতে রাজার বড়ই আগ্রহ। তিনি ভালভাবেই জানেন যে, তাঁর মধ্যে শুধু জোরই আছে কিন্তু রঞ্জনের মধ্যে আছে 'যাদু'। দুর্গম স্থান থেকে হীরে মানিক আনতে তিনি সক্ষম হলেও সহজ সরোবর থেকে প্রাণের যাদু আনতে না পারায় তিনি বেদনার্ত। রঞ্জনের যৌবন তাঁর নেই। তা থাকলে তিনি অনায়াসেই নন্দিনীকে বাঁধতে পারতেন - এমনটাই ভাবেন রাজা। নাটকের শেষে রাজার হাতে রঞ্জনের মৃত্যু হয়। রঞ্জনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই রাজার চিত্তের দ্বন্দ্বমুক্তি ঘটে, তাঁর মনুষ্যত্ব জাগ্রত হয়। তাই তিনি যক্ষপুরীর ধ্বজা পূজার ধ্বজা ভেঙে ফেললেন। নিজে সর্দারকে বন্দী করতে চাইলেন এবং সঙ্গে লড়াই এ নেমে পড়লেন। চরম প্রাণের সন্ধান পেয়েছেন তিনি। তাই সর্দারের দল থেকে তিনি মুক্তি চান। সর্দারের সঙ্গে লড়াইয়ে যদি তিনি জিততে না পারেন তাহলে মরতেও তিনি আগ্রহী আজ। নাটকের আর সকলের নন্দিনীর প্রতি যে মনোভাব তাতে মনে হয়, রাজার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত এই সর্দারদেরই শুধু বিরোধ বাধতে পারে। কিন্তু 'কর্তব্যের রঙের সঙ্গে রক্তকরবীর রঙ কিছু' যখন সর্দারের চোখেও লেগেছে, তখন আশা করা যায় যে সর্দারও রাজা ও নন্দিনীর দলেই ভিড়বে। মোট কথা রাজার অনুচরদের এবং তার শ্রমিকবৃন্দের মুক্তি ঘটবে।

নন্দিনী : - রক্তকরবী নাটকের সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণকারী ও সবচেয়ে উজ্জ্বল চরিত্র 'নন্দিনী'। সে যেমন সৌন্দর্য, আনন্দ ও প্রাণের প্রতীক, তেমনি নাটকটিরও প্রাণ। তারই কথায় ও আচরণে অন্য চরিত্রগুলির মধ্যে ভিতরে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে এবং গতানুগতিক প্রাণহীন যান্ত্রিক জীবনে বিরাট একটি পরিবর্তনের জন্য প্রলয় ঝড়কে ঘনীভুত করে তুলছে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি 'নন্দিনী' বলে একটি মানবীর

ছবি। চারিদিকের পীড়নের ভিতর দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ। ..... মাটি খুঁড়ে যে পাতালে খনিজ ধন খোঁজা হয়, নন্দিনী সেখানকার নয়। মাটির উপরতলে যেখানে প্রাণের, যেখানে রূপের মৃত্যু, যেখানে প্রেমের লীলা নন্দিনী সেই সহজ সুখের, সেই সহজ সোন্দর্য্যের।" নন্দিনী প্রতীক চরিত্র হলেও তাকে অনেকখানি মানবিক রূপ-দান করা হয়েছে। নাটকে মানবিক নারীরূপে বাস্তব জগতের নারীর আচরণ যেমন সম্পূর্ণভাবে তার মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না, তেমনি সম্পূর্ণরূপে তাকে সাংকেতিক মনে করাও যায় না। দুয়ের মিশ্রনে এ চরিত্র রচিত। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে কথায়ও কাজে তার মানবিক দিকটি বহুস্থলে একটু অধিকমাত্রায় ফুটে উঠলেও 'রক্তকরবী' পুষ্পগুচ্ছকে তার অঙ্গের ভুষণ করে তার সাংকেতিক রূপটিকে রবীন্দ্রনাথ ভুলতে দেননি। জাভাযাত্রীর পত্রেও তিনি নন্দিনী সম্পর্কে বলেছেন, "নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার পথে বাধা পায়, তাহলেই তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে। তখন মানুষ আপনার সৃষ্ট যন্ত্রের আঘাতে কেবলই পীড়া দেয়, পীড়িত হয়।

'রক্তকরবী' নাটকে রক্তকরবী ও নন্দিনী একাত্ম। তার সকল অলংকার এই রক্তকরবী ফুলের। তার হাতে রক্তকরবীর কঙ্কন, গলায় রক্তকরবীর মালা এবং করবীতে রক্তকরবীর মঞ্জরী। সবমিলিয়ে তো তার রঙ রক্তের রক্তিম। একদিকে তার মধ্যে আছে মাধুর্য ও অন্যদিকে ভয়ের উপকরণ।

নাটক শুরু হয়েছে নন্দিনী ও কিশোরের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে। কিশোর তাকে রক্তকরবী ফুল এবং দেয়, তাকে কতো ভালবাসে, কিশোরকে যক্ষপুরীর সর্দাররা শাস্তি দিলে নন্দিনী দুঃখবোধ করে। কিশোরের সঙ্গে আচরণে নন্দিনীর স্নেহময়ীরূপ স্নেহশীলা দিদির মতো কিশোরকে সে সাবধানে চলতে পরামর্শ দেয়। যক্ষপুরীর অধ্যাপক নন্দিনীকে বলেছেন, "কিন্তু সুন্দরী, তুমি যে সোনা সে তো ধুলোর নয়, সে - যে আলোর।" ক্ষণে ক্ষণে নন্দিনী তাকে চমক লাগিয়ে চলে যায়, মনটাকে ও নাড়া দেয়। অধ্যাপক কখনো বলেন - "সকালে ফুলের বনে যে আলো আসে তাতে বিস্ময় কিছু নেই, কিন্তু পাকা দেওয়ালের ফাটল দিয়ে যে আলো আসে সে আর এক কথা। যক্ষপুরে তুমি সেই আচমকা আলো।" কখনও বলেন নন্দিনী তাদের 'ফাঁকা সময়ের আকাশে সন্ধ্যাতারাটি।' তার রক্তকরবীর রক্ত আভায় একটা ভয় লাগানো রহস্য আছে বলে তিনি মনে করেন।

নন্দিনী রাজার বিশ্রী জালটা ছিঁড়ে তাকে উদ্ধার করতে চায়, যক্ষপুরের অন্ধকার কক্ষে আলো আনতে চায়। রঞ্জন এলেই যক্ষপুরীর মরা পাঁজরের ভেতর প্রাণ নেচে উঠবে বলে সে মনে করে এবং এ খবরও সে পেয়েছে যে, রঞ্জনের সঙ্গে আজই তার দেখা হবে। 'ধানী রঙের কাপড় পরা' নন্দিনী সম্বন্ধে অধ্যাপক

টিপ্পনী

টিপ্পনী

পুরাণবাগীশকে বলেছেন, 'পৃথিবীর প্রাণ ভরা খুশিখানা নিজের সর্বাঙ্গে টেনে নিয়েছে ওই আমাদের নন্দিনী,' যক্ষপুরীতে সে একেবারে আলাদা - 'চারিদিকের হাটের চেঁচামিচি, ও হল সুরবাঁধা তম্বুরা।' অধ্যাপকের ও বস্তুচর্চার জাল তার চলে যাওয়াতে ছিঁড়ে যায়। অধ্যাপকের মন উড়ে যায়। নন্দিনীর কপালে রক্তকরবী গুচ্ছকে তিনি প্রলয়গোধুলীর মেঘের মতো মনে করেছেন। নাটকের শেষে অধ্যাপক এই নন্দিনীকে ধরবার জন্যেই তারই সুরে সুর মেলাবার জন্য বেরিয়ে পড়েছেন।

নন্দিনী রহস্যময়ী ও মায়াবিনী। গোকুলের কাছে নন্দিনী রহস্যময়ী। 'তোমাকে বুঝতেই পারলুম না তুমি কে ? তাঁর ধারণা নন্দিনীর মধ্যে একটা কোনো মন্তর আছে। "ফাঁদে ফেলেছে সবাইকে।" সর্বনাশী সে। তার সুন্দর মুখ দেখে যারা ভুলবে, তারা মরবে। সে 'ভয়ংকরী'। সে 'রাঙা আলোর মশাল '। রাজা বলেছেন নন্দিনী যেমন কোমল তেমনি কঠিন ঠিক রক্তকরবীর মতো। রক্তকরবীর আভাটুকু রাজা ছেঁকে নিতে পারেন না যেমন পাপড়িগুলির বাধার জন্য তেমনি বাধা আছে নন্দিনীকে হাতের মুঠোয় আনার। 'বিষের বাঁশিতে নাচের যে ছন্দ বাজে সেই ছন্দ হল নন্দিনী, চন্দ্রা মনে করে নন্দিনী মায়া জানে। তার সুন্দরীপনা তার ভালো লাগে না। চন্দ্রা মনে করে রক্তকরবীর মালার ফাঁসে নন্দিনী একদিন বিশুর সর্বনাশ করবে। বিশু বলে নন্দিনী তার প্রাকার। তার ওপর উঠলেই সে 'বাহিরকে দেখতে' পায়। তার মধ্যে যে এখনও আলো আছে - এ বোধটুকু নন্দিনীকে দেখে বিশুর হয়েছে। নন্দিনী এখান থেকে বিশুকে বের করে নিয়ে যাবে।

নন্দিনী সংবেদনশীল ও মমতাময়ী। মাংসমজ্জা-মন-প্রাণহীন কতকগুলি চেনা ছেলের যক্ষপুরীতে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে যে শোচনীয় অবস্থা হয়েছে তা দেখে নন্দিনী অত্যন্ত বেদনাবোধ করেছে। পালোয়ান গজ্জুর দুর্গতিও তার চিত্তে নিদারুন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। পাগলভাই বিশুর হাতে হাতকড়ি দেখে ও তাকে চাবুক মেরেছে শুনে নন্দিনী ক্রুদ্ধা হয়ে ওঠে, কিশোরও শাস্তি পাচ্ছে, অথচ তার জন্য কিছু করতে না পারায় নন্দিনী বেদনাহত।

নন্দিনী বিদ্রোহিনী। মানুষে প্রাণ ছিড়ে নিয়ে তাকে নাম দিয়ে ভোলাবার পুরাণ বাগীশদের ব্যবস্থাকে নন্দিনী আক্রমণ করে। গোকুল ও চন্দ্রা কেউই তাকে সহ্য করতে পারে না। গোকুল তাকে ডাইনী বলে পুড়িয়ে মারতে চায়। চন্দ্রা তার রূপকে খুরপো দিয়ে নিড়িয়ে দিতে চায়। বিশুর বন্দীদশা দেখে চন্দ্রা নন্দিনীর ওপরই ক্ষুব্ধ। রঞ্জনকে মেরে ফেলায় ও কিশোরকে মেরে ফেলায় নন্দিনী সমস্ত শক্তি দিয়ে রাজার সঙ্গে লড়াই করতে চেয়েছে। আর তখনই হয়েছে রাজার অদ্ভুত চিত্ত - পরিবর্তন। সর্দার রাজাকে বর্শা দিয়ে আক্রমণ করতে আসছে দেখে নন্দিনী প্রাণ দেবার জন্য দ্রুতবেগে ছুটে গেলে জ্ঞানী অধ্যাপক জানেন এইবারই নন্দিনীকে পাওয়া যাবে, আর

এড়িয়ে যেতে পারবে না, তাকে ধরা যাবে।

রবীন্দ্রনাথ নন্দিনী সম্পর্কে বলেছেন, 'রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি নন্দিনী বলে একটি মানবীর ছবি। চারদিকে পীড়নের ভিতর দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ।" নন্দিনীকে মানবী বলে তাকে দেহাশ্রিতা এক সুন্দরীরূপে প্রতিপন্ন করতে চাইলেও প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তাকে পুরোপুরি মানবী বলে আমাদের মনে হয় না। নন্দিনী তরুনী, সুন্দরী প্রাণময়ী, হাসিতে, গানে ও আনন্দে সে যক্ষপুরীর অন্ধকারে আলো নিয়ে এসেছে। সে স্নেহময়ী ও অন্যের বেদনায় ব্যথিতা। যক্ষপুরীর মানুষ উদ্ধারই তার প্রধান কাজ। সে মুক্তির দূতী, আবার সে প্রেয়সীও। রঞ্জনই তার সেই দয়িত। তার সাহস ও সকল প্রেরণার উৎস এই রঞ্জন। নন্দিনীকে বধূরূপে লাভের জন্য একদা রঞ্জন ও বিশুর মধ্যে যে প্রতিযোগিতা হয়েছিল তাও মানবীয় সত্তারই পরিচয় দেয়। তবুও সে যে রহস্যময়ী এবং ভয়ঙ্করী একথাও বিস্মৃত হওয়া চলে না।

প্রেয়সীর সৌন্দর্য ও শ্রেয়সীর কল্যাণ দুই-ই তার মধ্যে আছে। এবং যেহেতু সৌন্দর্য আনন্দেরই কারণ, তাই নন্দিনী আনন্দেরই প্রতীক। চারিদিকে পীড়নের ইতর দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ বলে রক্তকরবী তার অলঙ্কার। তার রঞ্জনের প্রতি প্রেমও বেদনারক্তিম। নাটকের মধ্যে আদ্যন্ত তার আচরণ, কথা ও কাজ লক্ষ্য করলে তাকে পুরোপুরি মানবী বলে কখনোই মনে করা চলে না। সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার অবশ্য তার সম্পর্কে বলেছে, "সে তো মানবী নয় রক্তমাংসের নারী নয়। তাহাকে নারী - প্রকৃতির একটা ধ্যানকল্পিত ভাবমূর্তি বলা যাইতে পারে।" এ অভিমত মানা সম্ভব নয়, নন্দিনীর চরিত্র পরিচয়ে নিশ্চয়ই পরিস্ফূট হয়েছে।

কিশোর :- কিশোর যক্ষপুরীর সুড়ঙ্গ খোদাইকর বালক। তবে যক্ষপুরীর যান্ত্রিক জীবন তাকে একেবারেই গ্রস্ত করেনি। তাই সহজ সৌন্দর্য, আনন্দ ও প্রাণের টানে নন্দিনীর প্রতি অকারণ এক আকর্ষণ অণুভব করে। নন্দিনীকে ডেকে সে আনন্দ পায়। সমগ্র যক্ষপুরীতে একটি মাত্র রক্তকরবী গাছের সন্ধান পেয়ে সে সেখান থেকে ফুল তুলে রোজ নন্দিনীকে দিয়ে কৃতার্থ হতে চায়। নন্দিনীর জন্য প্রাণ দেবে সে একদিন, একথা তার কতোবার মনে হয়। নন্দিনীকে ফুল দিতে গিয়ে যদি সে শাস্তিও পায়, তবুও 'ওদের মারের মুখের ওপর দিয়েই রোজ' তাকে ফুল দিয়ে যাবে সে।

বিশুর সন্ধান জানাবার জন্য নন্দিনী যখন উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিল, তখন কিশোর তাকে বলেছিল, 'এখনি তার সঙ্গে দেখা হবে। মনটা ঠিক করে রাখো।' বিশুকে চাবুক মারায় ও বেঁধে নিয়ে যাওয়ায় নন্দিনী যখন বেদনাকাতর হয়ে তার শাস্তি ভাগ করে নিতে চাইছিল, তখন কিশোর বিশুর বদলে নিজেই বন্দী হয়ে মার খেতে চেয়েছিল। তার বয়স অল্প বলে সে শাস্তি সইতে পারবে - এই যুক্তি দেখিয়েছিল বিশুর কাছে। সে কাজ কামাই করেছে বলে সর্দারের দল তাকে যে শাস্তি

টিপ্পনী

টিপ্পনী

দেবে, তা সে জানে। কিন্তু বিশু তাকে আরও একটি গুরুতর কাজের ভার দিয়েছে। বলেছে যে রঞ্জন এসেছে। তাকে যে কোন উপায়ে বের করতে হবে। এখন ধরা পড়লে চলবে না। তখন কিশোর নন্দিনী ও বিশুর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে এবং নন্দিনীর আদেশে রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হলে তাকে রক্তকরবীর গুচ্ছ দেবে জানিয়েছে। রঞ্জনের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। রাজার কক্ষে শায়িত রঞ্জনের হাতে রক্তকরবীর মঞ্জরী দেখে নন্দিনী তার প্রমাণ পেয়েছিল। রাজার কাছে নন্দিনী যখন কিশোরের সন্ধান চাইলে রাজা বলেছিলেন - "সে-যে অদ্ভুত ছেলে। বালিকার মত তার কচিমুখ। কিন্তু উদ্ধত তার বাক্য। সে স্পর্ধা করে আমাকে আক্রমণ করতে এসেছিল।" তাই রাজার হাতে 'বুদবুদের সে লুপ্ত হয়ে গেছে। কিশোরের এই মিলিয়ে যাওয়ার সংবাদে নন্দিনী অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে রাজার সঙ্গে সমস্ত শক্তি দিয়ে লড়াই করতে অগ্রসর হয়েছে। নাটকে রঞ্জনের অভাব কিশোর অনেকখানিপূর্ণ করেছে নন্দিনীর জীবনে। তাকেও একেবারে স্বাভাবিক মানবীয় চরিত্র বলে মনে হয় না। তার মধ্যে কিশোর বয়সের আচরণ কম - তাকে পরিণত বুদ্ধির অধিকারী বলে মনে হয়। এ নাটকে নন্দিনীর মানুষ উদ্ধারের পালায় সহজ প্রাণ ও শক্তির অধিকারী কিশোরের ভূমিকাও সামান্য নয়।

বিশু পাগল :- বিশু পাগল যক্ষপুরীর একজন খোদাইকর হলেও এ কাজে তার মন নেই। তার মন যন্ত্রবদ্ধ জীবনের অনেক উর্দ্ধে। রাজা ও নন্দিনীর পরেই নাটকে তার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাকে ঠিক সাধারণ মানুষও মনে করা যায় না। নন্দিনীর মুখে শোনা যায় যে, একসময়ে এই যক্ষপুরীতে আসার আগে তার সঙ্গে বিশুর যোগ ছিল। রঞ্জন প্রাণের খেলায় মেতে যখন নন্দিনীকে জয় করে নেয় তখন বিশুও নাকি সে - খেলায় যোগ দিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ কী মনে করে সে ঐ খেলা থেকে বেরিয়ে আসে একলা। যাবার আগে নন্দিনীর দিকে এমনভাবে চেয়েছিল যার অর্থ সে বুঝতে পারেনি। তারপর একটি নারীর আকর্ষণে ধরা দিয়ে সে আসে এই যক্ষপুরে , পরে ঐ নারী বিশুর পদাবনতি ঘটায় ও তাকে ছেড়ে চলে যায়। বিশু প্রথমে চরের কাজ পেয়েছিল। কিন্তু ঐ নীচ কাজ তার ভালো না লাগায় আবার এই খোদাইকরের কাজ নিয়েছে। বিশুর সঙ্গে আগে থেকেই নন্দিনীর যে যোগ এবং পরেইও যক্ষপুরীতে যে যোগ লক্ষ্য করা যায়, তাতে মনে হয় বিশু আনন্দময় ও প্রাণময় পুরুষ ও মুক্তির বার্তাবহ। তার অনেক কথা দুর্বোধ্য এবং গানই তার ভাব - প্রকাশের প্রধান বাহন। কখনো মনে হয় বিশু পুরোপুরি বাস্তব চরিত্র নয়। আধা বাস্তব, আধা সাংকেতিক।

চন্দ্রা ও ফাগুলাল বিশুকে খুব ভালোবাসে। কিন্তু তাদের দৃষ্টির স্বচ্ছতা ছিল না বলে নন্দিনীর সঙ্গে বিশুর সম্পর্ক ঠিকমতো বুঝতে পারেনি। তাই চন্দ্রা তার

সম্পর্কে বলেছে- 'ওকে নন্দিনীতে পেয়েছে, সে ওর প্রাণ টেনেছে, গানও টেনেছে।'

সাধারণ মানুষের মতো নয় বলেই বিশুকে সকলে পাগল বলে, এমনকি নন্দিনীও তাকে বলে 'পাগল ভাই'। যক্ষপুরীর অভ্যস্ত জীবন ধারায় সেও বেমানান। যে সুন্দর, যে আনন্দ ও যে প্রাণের নির্বাসন ঘটেছে যক্ষপুরে , সেখানে তার মতো মানুষকে বোঝা সহজসাধ্য নয়। বাইরে তার আচরণ ও কথায় কিছু অস্বাভাবিকতা ও দুর্বোধ্যতা থাকলেও অন্তরে অন্তরে সে সত্যদ্রষ্টা জ্ঞানী। 'মুক্তধারা' নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগী, শারদোৎসব' নাটকের ঠাকুরদাএবং 'অচলায়তন' ও 'রাজা'র ঠাকুরদা চরিত্রের আদর্শ অনেকখানি এ চরিত্র গঠিত । বিশুর সাধনা মুক্তির । কিন্তু দুঃসহ দুঃখের মধ্যে দিয়ে সে মুক্তির আলোকে আসতে চায়। সে যেন এক অনাসক্ত বাউল। ভোগের প্রতি তার কোনো আকর্ষণই নেই। ব্যাথার আনন্দে, চোখের জলে তার কত না আনন্দ। সে পাগল 'ভোলানাথ' - যিনি সব দেবতার মধ্যে খাপছাড়া। যক্ষপুরীতে সকলে যখন কাজে মত্ত, সেখানে সে গেয়েছে গান।

বিশু সুন্দরের পূজারী । সে নন্দিনীর কর্মসহচর । গোকুলকে সে বলেছে 'যক্ষপুরীর হওয়ায় সুন্দরের পরে অবজ্ঞা ঘটিয়ে দেয়, এইটেই সর্বনেশে ।" নরকবাসীর সবচেয়ে বড় সাজা হল সেখানে সুন্দর থাকা সত্ত্বেও ওকে তারা বুঝতে পারে না । যক্ষপুরীর খোদাইকরেরা মদ খায় কেন তার জবাবে ফাগুলালকে বিশু মদের যে ব্যাখ্যা দিয়েছে, তাতে বোঝা যায় সে কতো বড় সত্যদ্রষ্টা জ্ঞানী। বিশু বলে মদের বরাদ্দ জগতের চারিদিকেই - নারীদের চোখের কটাক্ষে ও বাহুর বন্ধনেও যেমন আছে মদ, তেমনি ক্ষুধা তৃষ্ণার চাবুকে কাজে মত্ত হওয়াটা এক ধরনের মদের নেশা। আবার বনের সবুজ মায়া, রোদের সোনার মায়াও মদ। মদের আড্ডা বন্ধ, তাই কয়েদখানার চোরাই মদের ওপর তাদের এমন ভয়ঙ্কর টান। যক্ষপুরীর অন্ধকারময় জীবন ও নন্দিনীর স্বরূপকে এই সত্যদ্রষ্টা স্পষ্ট করেছে।

চন্দ্রার ভুল ভেঙে দিয়ে বিশু তাকে জানিয়ে দেয় যক্ষপুরীর পরিবর্তন শুধু পুরুষদের মধ্যেই নয়, নারীদের মধ্যেও । তাদের 'ফুল গেছে শুকিয়ে, এখন 'সোনা সোনা' করে প্রাণটা খাবি খাচ্ছে।" ফাগুলাল সে বারো ঘন্টার পরে আরও চার ঘন্টা খেটে মরে এখানে, তার মূলে আছে চন্দ্রার সোনা পাওয়ার অতি তীব্র কামনা। সেই কামনার চাবুক সর্দারের চাবুকের চেয়েও কড়া। চন্দ্রাকে বিশু আরও জানিয়ে দেয় এখানকার মানুষের দেশে ফেরার পথ শুধু সর্দার বন্ধ করেনি, তাদের ইচ্ছেটাকে পর্যন্ত মেরেছে। দেশে যদিও বা কেউ ফেরে সেখানে টিকতে পারবে না, সোনার নেশায় আবার তাকে ছুটে আসতে হবে। যক্ষপুরী কারিগরদের জীবনের ট্র্যাজেডি গভীর অন্তদৃষ্টি দিয়ে বিশু দেখতে পেয়েছিল।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

বিশু একদিন যথেষ্ট পুঁথি পড়েছে, ওরা এখানকার রাজার চরবৃত্তির কাজ তাকে দিয়েছিল। কিন্তু সজীব দেহের পিছনে চরবৃত্তির কাজ তার ভালো লাগেনি। দেশে ফিরে যেতে চেয়েছিল সে । সর্দার তাকে যেতে দেয়নি - এখন সে খোদাইকরের কাজে কোদাল ধরেছে বটে, কিন্তু সর্দারের তার প্রতি ঘোর অবজ্ঞা সর্দারের অপকর্মের সকল দিক বিশুর চোখে ধরা পড়েছে। সর্দারকে তা বলতে ও সে দ্বিধা করে নি। নাটকের শেষে ফাগুলাল প্রভৃতি যে সক্রিয় হয়ে উঠেছে তার মূলেও বিশুর এতদিনের প্রয়াসই কাজ করেছে।

যক্ষপুরে মানুষের এই তলে তলে সোনা তোলার নেশা কবে কাটবে বিশু তার নির্দিষ্ট তারিখ বলতে পারে না। এখানে 'অঙ্কের পর অঙ্ক সার বেঁধে চলেছে। বিনা অর্থে পৌঁছায় না। তাই সর্দারের কাছে বিশু মতো তারা মানুষ নয়। কেবল সংখ্যা । কেউ ৪৭ক কেউ ৬৯ঙ । সর্দারকে খুব ভালো করেই চেনে বিশু । চন্দ্রা নবান্নের সময় দেশে যাওয়ার জন্য সর্দারের কাছে ছুটি চাইতে বলায় বিশু জানায় সর্দারের "মকরের দাঁত, খাঁজে খাঁজে বড় পরিপাটি করে কামড়ে ধরে, মকররাজ স্বয়ং ইচ্ছে করলেও আলগা করতে পারে না।"

নন্দিনীর সঙ্গে সম্পর্কের কথায় বিশুর দার্শনিক দৃষ্টির পরিচয় ফুটে ওঠে। সে কবি ও দার্শনিক। চন্দ্রাকে সে বলে, 'এমন দুঃখ আছে যাকে ভোলার মতো দুঃখ আর নেই ।" কিংবা "কাছের পাওনাকে নিয়ে বাসনার যে দুঃখ তাই পশুর, দূরের পাওনাকে নিয়ে আকাঙ্খার যে দুঃখ তাই মানুষের।" তার সেই চির - দুঃখের দূরের আলোটি নন্দিনীর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। নন্দিনী বলেছে, এই বন্ধ গড়ের মধ্যে বিশুর ও তার মাঝখানটাতে একখানা আকাশ বেঁচে আছে। আর সেটুকু আছে বলেই বিশু নন্দিনীকে গান শোনায়। রাজার সম্বন্ধে সে বলে যে, যেদিন রাজার ওপর 'বিধাতার দয়া হবে, সেদিন ও মরবে' সর্দার সম্বন্ধে বলে 'প্রাণকে শাসন করবার জন্য প্রাণ দিয়েছে দুর্ভাগা।" রাজাকে বিশু বলেছে 'আমি রঞ্জনের ও পিঠ। সে পিঠে আলো পড়ে না - আমি অমাবস্যা।' অর্থাৎ অমাবস্যার আঁধার ভরা তার জীবন। এই দুঃখ ক্রমশ তার জীবনে অনাসক্তি, ভয়শূন্যতা ও বাধাহীন - বাধন এনেছে।

বিশুকে সর্দারের দল চাবুক মেরেছে ও হাতে হাতকড়ি দিয়ে ধরে নিয়ে যাচ্ছে যখন তখন সে বলে, 'এতেই বা কি ক্ষতি হল। সত্যের মধ্যে মুক্তি পেয়েছি। এখানে নির্ভীক ও বন্ধনকে ও মুক্তিকামী বিশুকেই দেখি। নাটকের শেষেও এই বিশুকে আমরা দেখি।

নন্দিনীর সন্ধানে সে যক্ষপুরীতে এসেছে। শায়িত রঞ্জনকে ও ধূলায় আর রক্তরেখা দেখে সে ফাগুলালকে বলেছে 'ওই তাদের পরম মিলনের রক্তবাহী, এবার আমার সময় এল একলা মহাযাত্রার।' সেও ফাগুলালকে সঙ্গে নিয়ে নন্দিনীর জয়ধ্বনি

করে সর্দারের সঙ্গে লড়াই এ চলেছে। নন্দিনীর শেষ দান হিসেবে ধুলোয় পড়ে থাকা তার রক্তকরবীর কঙ্কনটি কুড়িয়ে নিয়ে বিশু শেষ বিদায় নিয়েছে।

রক্তকরবী নাটকের পর্যালোচনা :

'রক্তকরবী' (১৯২৪) রবীন্দ্রনাথের কঠিনতম ভাবনাট্য । রূপক ও গল্পকাহিনীতে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জমাট বেঁধেছে । কেন্দ্রীয় ভূমিকা নন্দিনীর সাজ রক্তকরবীর ফুলে এবং এই ফুল দিয়ে অথবা না দিয়ে তার প্রেম ও প্রীতির গতি সূচিত । তাই নাটকটির নাম 'রক্তকরবী' সঙ্গত হয়েছে । হয়তো রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের রচনায় কিছু আভাস দিতে চেয়েছেন। মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে ইরাবতী বসন্তের প্রথম অবতারসূচক কুবরকগুচ্ছ পাঠিয়ে অগ্নিমিত্রকে দোলাঘরে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কুবরক করবী নয়, তবে ধ্বনিসাম্যে 'করবীর' মনে পড়ায়।

মুক্তধারা ও রক্তকরবীর তুলনামূলক আলোচনা :

অধ্যাত্মভাবনার দৃষ্টিতে মুক্তধারা ও রক্তকরবী পরস্পরের পরিপূরক । মানবসত্তার অনুভূতি বা প্রকাশ ঘটে দুই রূপে - বোধিত ও শক্তিতে। এই দুই প্রকাশ যেন দিনরাত্রি, আলোছায়া, হাসিকান্নার পেন্ডুকলাম ; যা কালের গতিকে প্রবাহিত রেখেছে। রক্তকরবীর প্রথম প্রকাশের বছর দেড়েক আগে রচিত (৩০ই চৈত্র ১৩২৯) এই গানটিতে এই ভাবনার সমর্থন পাওয়া যায় -

কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে ডাইনে বায়ে দুই হাতে
সুপ্তি ছুটে নৃত্য উঠে নিত্য নূতন সংঘাতে।
বাজে ফুলে বাজে কাটায়, আলোছায়ার জোয়ার ভাঁটায়
প্রাণের মাঝে ওই যে বাজে দুঃখে সুখে শঙ্কাতে।

মুক্তধারায় অভিব্যক্ত হয়েছে ডান হাতের ঝঙ্কার, দিনের আলোর দীপ্তি, হাসির জোয়ার। এখানে বোধির প্রাধান্য শক্তিকে ছাপিয়ে আনন্দের সৃষ্টি করেছে। রক্তকরবীতে প্রকটিত হয়েছে, বোধিকে ছাপিয়ে, বাঁ হাতের ঝঙ্কার, রাতের আঁধার, কান্নার ভাটা। এখানে শক্তির জাল বোধিকে ঘুম পাড়িয়ে আনন্দের আবির্ভাব সম্ভব করেছে। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, রক্তকরবী মুক্তধারার আগে লেখা উচিত ছিল, কিন্তু তা যে করেননি তাতে রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ মনীষারই পরিচয় পাই। মানব সভ্যতার ইতিহাস বর্তমান ক্ষণে বোধিকে আচ্ছন্ন করে শক্তির প্রবলতাই যে বেড়ে চলেছে তা রবীন্দ্রনাথ অনুভব করে যেন ভবিষ্যদবাণী উচ্চারণ করেছেন। করবী ফুল দেবী চন্ডিকার প্রিয় - কঠিন এবং স্বল্পগন্ধ। প্রস্ফুট অবস্থায় লাল, শিথিল অবস্থায় ম্লান

টিপ্পনী

টিপ্পনী

। করবী ফুলের এই দুই অবস্থার সিম্বল অবলম্বনে রক্তকরবী ও মুক্তধারা বিরচিত। এই মর্মকথার প্রায় সমসাময়িক সাক্ষ্য পাই যথাক্রমে দুটি গানে -

নিদ্রাহারা রাতের এ গান বাঁধব আমি কেমন সুরে
কোন রজনীগন্ধা হাতে আনব সে তান কণ্ঠে পুরে।
সুরের কাঙাল আমার ব্যাথা ছায়ার কাঙাল রৌদ্র যথা
সাঁঝ - সকালে বনের পথে উদার হয়ে বেড়ায় ঘুরে।
ওগো সে কোন্ বিহান বেলায় এই পথে কার পায়ের তলে
নাম - না - জানা তৃণকুসুম শিউরেছিল শিশিরজলে
অলকে তার একটি গুছি করবীফুল রক্তরুচি
নয়ন করে কী ফুল চয়ন নীল গগনে দূরে দূরে।

(চৈত্র ১৩২৮)

কেন রে এতই যাবার ত্বরা-
বসন্ত, তোর হয়েছে কি ভোর গানের ভরা
এখনি মাধবী ফুরাল কি সবই
বনছায়া গায় শেষ ভৈরবী
নিল কি বিদায় শিথিল করবী বৃন্তঝরা।

মুক্তধারার প্রধান ভূমিকা বলতে এই চারটি - রাজা রণজিৎ সিংহ, যুবরাজ অভিজিৎ সিংহ, যন্ত্ররাজ বিভূতি ও বৈরাগী ধনঞ্জয়। এরা যথাক্রমে মানবসত্তার বোধিস্বত্ত্বের শক্তিস্বত্ত্বের ও আনন্দস্বরূপের প্রতীক। রক্তকরবীতে রাজা (মানবসত্তা) বিভূতির কবলে ঢাকা পড়ে গেছে। অভিজিৎ বিপর্যস্ত হয়ে দ্বিধা বিভক্ত এবং লুপ্তপ্রায় (একভাগে সে পুরুষ রঞ্জন অপরভাগে সে নারী নন্দিনী), ধনঞ্জয় খর্ব ও ম্লান হয়ে বিশুর ভূমিকায় পরিণত।

আধুনিক জড়বাদী বিশ্বসভ্যতার দুই অঙ্গ - যন্ত্র ও ধনতন্ত্র, এই দুই অঙ্গ পরস্পরের পরিপূরক এবং এদের মিলিত রূপ অর্থাৎ যান্ত্রিক ধনতন্ত্র থেকে যে বস্তুশক্তির উদ্ভব তা জড়বাদী বিশ্বের উপর সর্বগ্রাসী ক্ষমতা বিস্তার করেছে। এই বস্তুশক্তি মাটিকে পাষাণ করে মানুষকে পুতুল করে ফেলেছে। এর দানবীয় বাহু যখন প্রসারিত হয় রাজনৈতিক জগতের দিকে, তখন স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত লাগে, এক

রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের সংগ্রাম শুরু হয় আর ধরাতলে নেমে আসে রক্তস্রাবী সর্বনাশের বীভৎস মরণলীলা। বিগত দুটি যুদ্ধে আমরা তো এই লীলাই দেখেছি। রবীন্দ্রনাথ এই মদমত্ত বস্তুশক্তির বিরুদ্ধে চিরকাল তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এ প্রতিবাদ মানুষের - মানুষের প্রেম ও প্রাণের। 'মুক্তধারা' র মধ্যে যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আর 'রক্তকরবী'র মধ্যে প্রতিবাদ রয়েছে পুঞ্জীভূত ধনের বিরুদ্ধে। এই ধনের আকর্ষণে মানুষ ধনের কথা ভুলেছে, লক্ষ্মীর শাসন ফেলে কুবেরের আগারের দিকে ছুটিতেছে। এই আকর্ষণ অশুভ হলেও সত্য। কারণ ইতিহাসের অনিবার্য কারণ -পরম্পরা থেকে এর উদ্ভব। পশুচারণ যুগ থেকে কৃষিযুগ এবং কৃষিযুগ থেকে শিল্পযুগ এগুলি সভ্যতার ক্রমিক ঐতিহাসিক স্তর। শিল্পবিপ্লবের পর থেকে সমগ্র বিশ্বজগতে যন্ত্র ও পুঁজিবাদের সম্প্রসারণ হচ্ছে, মৃত্তিকাপ্রাণ মানুষ ক্রমে ক্রমে অর্থনৈতিক সত্তার দ্বারা অধিগত হচ্ছে, ব্যক্তি মানুষ শ্রেণী মানুষে পরিণত হচ্ছে। বর্তমানে যাঁরা মানুষের মুক্তি চান তাঁদের মধ্যে অনেকেই মানুষের অর্থনৈতিক চেতনা থেকে মানুষের প্রাণকে মুক্তি দিতে চান। সোনার খনি থেকে দূরে, দমবন্ধকরা কারখানার বাইরে যেখানে মাটির পরে সোনার আসন পাতা, এই পথ কারো কাছে পশ্চাৎপ্রসারী ও প্রতিক্রিয়াশীল মনে হতে পারে, কিন্তু তবুও কবির এ পথকে অস্বীকার করা চলে না। তবে এ সম্বন্ধে একটু ভুল বোঝার সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথ অর্থবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানিয়েছেন বটে , কিন্তু তাই বলে তিনি অর্থকে কেবল অনর্থ বলেও ভাবেন নি। মানুষের প্রয়োজনে অর্থ, অর্থের প্রয়োজনে মানুষ নয় এটাই কবির অভিমত। সোনার থলি যতক্ষন মানুষের হাতে থাকে ততক্ষণ মানুষের কল্যাণ কিন্তু সেই থলি যখন বোঝা হয়ে মানুষের ঘাড়ে চাপে তখন থেকে শুরু হয় মানুষের দুর্গতি । এই দুর্গতি যক্ষপুরীর, এই দুর্গতি যক্ষপুরীর রাজার। যখন যক্ষপুরীর বন্দীশালা ভেঙে পড়ল আর রাজা বের হয়ে এলেন মুক্তিপথে তখনই এই দুর্গতির অবসান। তখন যক্ষপুরীর সোনা ছড়িয়ে পড়ল পৌষালী ধানের ক্ষেতে আর শিশির ভেজা রোদের আঁচলে। তখন রাজার দানব সত্তার মৃত্যু আর নির্জিত মানব সত্তার পুনর্জন্ম। ধনতন্ত্র অভিশাপ থেকে মানুষ বাঁচল বটে কিন্তু বাঁচার জন্য আবার মরতে হল মানুষকে। যুগে যুগে এভাবে মানুষকে বাঁচাতে মানুষ মরেছে। যন্ত্রের হাত থেকে মানুষকে বাঁচাতে অভিজিৎ মরল আর স্বর্ণের হাত ধেকে মানুষকে রক্ষা করতে রঞ্জন ও নন্দিনী প্রাণ দিল।

মুক্তধারার যন্ত্ররাজের সঙ্গে রক্তকরবীর যক্ষরাজের এইখানে পার্থক্য যে, যন্ত্ররাজ নির্দ্বন্দ্ব, নির্মানুষ জড়শক্তি মাত্র কিন্তু যক্ষরাজের মধ্যে জড় ও জীবনের দ্বৈত লীলা। সেজন্য যন্ত্ররাজের সংগ্রাম মানুষের সঙ্গে কিন্তু যক্ষরাজের সংগ্রাম নিজের সঙ্গে।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

মুক্তধারার মত রক্তকরবীরও অঙ্ক দৃশ্য বিরহিত নাটক। কিন্তু মুক্তধারার মধ্যে নাট্যকার যেমন বিভিন্ন শ্রেণীর চিত্র পরপর এনে ক্রিয়া ও রসের বৈচিত্র্য ঘটিয়েছেন রক্তকরবীতে সেরূপ কখনো বৈচিত্র্য দেখা যায় না। মুক্তধারায় উন্মুক্ত পথের উপরে চরিত্রগুলিকে যথেষ্ট গতিশীল করে তোলা হয়েছে কিন্তু রক্তকরবীতে সে সুযোগেরও অভাব। একটি বদ্ধ পুরীর জালের আবরণের বহির্ভাগে এই নাটকের ঘটনা ঘটেছে। এই নির্দিষ্ট ও সংকীরর্ণ স্থানে সব ঘটনার অবতারণার জন্য স্বভাবতই নাটকের গতি ধীর হয়েছে। দ্বিতীয়ত এই নাটকে নাট্যকার চরিত্রগুলির কথায় সৌন্দর্যের দিকে যত দৃষ্টি দিয়েছেন গতির দিকে তত দৃষ্টি দেন নি। সেই কথায় তারকার জ্যোতি আছে বটে কিন্তু প্রদীপের দাহ নেই। রূপক - শ্লেষ - বিরোধ প্রভৃতি অলঙ্কার সৌন্দর্যে, চিত্র ও সঙ্গীতের সরসতায় নাটকখানি একটি অনবদ্য কাব্যরূপ লাভ করেছে।

মুক্তধারা ও রক্তকরবী দুটো নাটকেরই মুখ্য বিষয় যন্ত্র সভ্যতার নিপীড়ন এবং উভয় নাটকেই রূপকের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। রক্তকরবীতে যন্ত্রসভ্যতার প্রতীক হচ্ছেন রাজা। মুক্তধারায় নাট্যকার যন্ত্রসভ্যতার চিত্র এঁকেছেন যন্ত্রের সাহায্যে। যন্ত্ররাজ বিভূতি এক ভীষণ লৌহযন্ত্র আবিষ্কার করেছে এবং নাট্যকার অতি বিচিত্র উপায়ে দেখিয়েছেন, যন্ত্রসভ্যতা যে অকল্যাণ আনে তা সুদূরপ্রসারী। এর কোন সার্থকতা নেই, মানুষের দম্ভেই তা পরিপুষ্ট হচ্ছে। যন্ত্ররাজ বিভূতি নিজের কৌশল ও ক্ষমতা দেখাবার জন্য এটা সৃষ্টি করেছে এবং দম্ভের সঙ্গে বিদ্বেষের সম্বন্ধ চিরন্তন। তাই বিভূতির লৌহযন্ত্র শুধু উত্তরকূটের আন্দোলনের সামগ্রী নয়, এটি শিবতরাইয়ের লোকদের উপর অত্যাচার করবারও উপায়। বিভূতির যন্ত্র শিবতরায়ের লোকের অসুবিধা করেছে তাদের ঝর্নার জল বন্ধ করে। যন্ত্রের বৈশিষ্ট্যই এই যে, তা প্রকৃতিপ্রদত্ত কল্যাণের পথ রুদ্ধ করে ; যে আলো বাতাস ও জল মানুষ জন্মেই পায়, যা তার প্রধান সম্পদ - তারই সঙ্গে যন্ত্রের চিরবিরুদ্ধতা।

রক্তকরবীর নন্দিনীর সঙ্গে কুমার অভিজিতের তুলনা করা যেতে পারে। নন্দিনীর সঙ্গে যন্ত্ররাজের অতীত প্রেমের ও সৌন্দর্য্যের জগতের কোন সহজ সম্পর্ক নেই ; সে প্রধানত বিদ্রোহিনী। রাজার বিরুদ্ধে সে যে আন্দোলন শুরু করেছে তাই যেন তাকে মাটির উপরতলার দিকে ঠেলেছে। তবে মহাপঞ্চক, বিভূতি, কাঞ্চীরাজের মত সবল মতনিষ্ঠ চরিত্র রক্তকরবীতে নেই সেজন্য নাট্যাংশে একটু দুর্বলতা রবেছে। রক্তকরবীর নাট্যবেগ দেখা গেছে শুধু দুটি বিষয়ে - রাজার চরিত্র দ্বন্দ্বে ও রঞ্জনের আগমন প্রত্যাশায়। বাস্তবিক বর্তমান ধনতন্ত্রী মানুষ বিশ্বের সব ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য হাতের মুঠোয় পেয়েও আসলে কত একা, কত অসহায়।

নাটকের বিশ্লেষন :-

রক্তকরবীর দৃশ্যপট মাত্র একটি। এই নাট্যব্যাপার যে নগরকে আশ্রয় করে আছে তার নাম যক্ষপুরী। এখানকার শ্রমিকদল মাটির তলা থেকে সোনা তুলবার কাজে নিযুক্ত। এখানকার রাজা একটা অত্যন্ত জটিল আবরণের আড়ালে বাস করে। প্রাসাদের সেই জালের আবরণ এই নাটকের একটিমাত্র দৃশ্য। সেই আবরণের বহির্ভাগে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে।

রূপকবাদ দিয়ে শুধু কাহিনীকে ধরতে গেলে এইরকম নির্যাস পাওয়া যায়। একদা কৃষিসমৃদ্ধ রাজ্য এখন খনিজসমৃদ্ধির জন্য পাগল। প্রজাদের শ্রমিক বানিয়ে রাজা তাদের মানবত্বের ও জীবনের বিনিময়ে সোনার তাল জমাছেন এবং নিজের শক্তি ও আয়ু বাড়িয়ে চলেছেন। তাই তিনি বিজ্ঞানশক্তির সাধনায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত করেছেন এবং তার ফলে জড়প্রকৃতির উপর তাঁর শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবশক্তির প্রতি আকর্ষণও বেড়ে চলেছে। ফলে বাইরের সঙ্গে নিজের যোগাযোগ এরকম লুপ্ত। প্রজাদের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলেও রাজার শাসনে কঠিন ভূমিগর্ভে খনির শ্রমিকদের খাটাবার জন্য অনেক শ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত আছে। তারা ধনলোভে অন্ধ হয়ে কর্তব্যের অতিরিক্ত কাজ করে যাচ্ছে। এমন সময় একদিন একটি মেয়ে ও একটি ছেলে এল। মেয়েটি নন্দিনী,ছেলেটি রঞ্জন। পরস্পর ভালোবাসে, দুজনেই সরল, নিঃশঙ্ক, জীবনরসচঞ্চল। মেয়েটি শ্রমিকদের মনে চাঞ্চল্য জাগাল। একজনের সঙ্গে তার আছে কিছু পরিচয় ছিল। সে বিশু। বিশু ভালো গান গায়। তার গান নন্দিনীকে যেন ভালবাসার উপরে অতিরিক্ত কিছুর উদ্দেশ দেয়। কিশোরও নন্দিনীকে ভালোবেসেছে। সর্দারের শাস্তি উপেক্ষা করেও সে খুঁজে পেতে করবী ফুল এনে নন্দিনীকে দেয়। রাজা নন্দিনীকে দেখেছে এবং নন্দিনীও তার কঠিন হৃদয়ে ঘা মেরেছে। এদিকে কুলিসর্দারেরা কিছুতেই রঞ্জনকে বশে এনে পশুর মতো খাটাতে পারছে না। প্রধান সর্দার বুঝেছে যে নন্দিণী রঞ্জনের মিলন ঘটলে কারখানার শ্রমিকপল্লীতে জীবন জেগে উঠবে, তখন যক্ষপুরীর কারা -কর্মশালা অচল হতে বিলম্ব হবে না। চক্রান্ত করে রঞ্জনকে রাজার কাছে পাঠাল। বৈজ্ঞানিকরা যেমন ল্যাবরেটরিতে প্রাণী নিয়ে নানারকম প্রক্রিয়া করে রাজাও জীবনরহস্য জানবার জন্য জীবন্ত প্রাণী ও মানুষ নিয়ে প্রক্রিয়া চালাত। রঞ্জনের জীবনহর্ষ রাজা সহ্য করতে পারলনা। রঞ্জন যে নন্দিনীর প্রিয় তা রাজা জানত না , জানলে হয়তো তাকে হত্যা করত না। কিন্তু রঞ্জন নিজের পরিচয় দেয়নি। রঞ্জনের মৃত্যুতে রাজার আত্মবন্ধন দশা ঘুচে গেল। রঞ্জনের পার্ট নাটকে সম্পূর্ণ উহ্য। সুতরাং রাজার সঙ্গে তার বিরোধ ও সে বিরোধের পরিণতি কল্পনার বিষয়। নন্দিনী রঞ্জনের উদ্দেশ্যে কিশোরের হাতে করবীগুচ্ছ পাঠিয়েছিল। মৃত রঞ্জনের হাত থেকে সে তা তুলে নিল। ইতিমধ্যে বিশু ও

টিপ্পনী

নন্দিনীর অনুরাগী ফাগুলালকে নেতা করে শ্রমিকেরা বদ্রোহী হয়েছে। তারা কারাগার ভেঙ্গে সর্দারের কোপ থেকে বিশুকে উদ্ধার করল। বিশু এসে দেখল যে রাজার সঙ্গে নন্দিনী চলে গেছে। একটি দূরে গিয়ে দেখা গেল নন্দিনীর প্রকোষ্টচ্যুত রক্তকরবী কঙ্কণ পড়ে আছে। বিশু তা তুলে নিল। এইখানে নাটক শেষ।

টিপ্পনী

রাজা নাটকের রাজার মতো 'রক্তকরবী' নাটকের রাজাও নেপথ্যচারী। তাঁর কথা শোনা যায়, কিন্তু তিনি আছেন যেন নেপথ্যেরও বাইরে। নাটকের শেষ ভাগে তাঁর মৃত্যুর ইঙ্গিত আছে। মৃতদেহের আভাস আছে - ধুলায় পড়া রক্তকরবীর গুচ্ছে। রাজা ও রঞ্জন যেন একই ব্যক্তিত্বের টানাপোড়নে দ্বিধান্বিত। যেমন চাঁদের উজ্জ্বল মুখ ও অন্ধকার পিঠ। উপমাটি বেশি টেনে যাওয়া ঠিক হবে না। কেননা যে রাজা নাটকে বাক্‌কর্মের দ্বারা প্রকট সে ব্যক্তি প্রৌঢ় কিন্তু সুন্দর নয় এবং রঞ্জন যে নাটকে কায়বাক্যে অনুপস্থিত সে যৌবনচঞ্চল ও সুন্দর। শক্তিসঞ্চয়ের ও মৃত্যুবঞ্চনার সাধনায় নিবিষ্ট হয়ে রাজা যৌবন ও জীবন সৌন্দর্য্য হারিয়েছে। তার সেই হারানো অংশটুকুই যেন পৃথক সত্তা ধরে আছে রঞ্জনে। এখানেও নাম দুটির বুৎপত্তি লক্ষ্য রাখতে হবে। 'রাজা' ও রঞ্জন' দুই শব্দই রন্‌জ ধাতু থেকে উৎপন্ন। রঞ্জনের মৃত্যুতে রাজার ব্যক্তিত্ব পূর্ণতাপ্রাপ্ত। তার সাধনা - কারাগার তখন ভেঙে পড়েছে। তাই সে নন্দিনীর সঙ্গে মিলতে পারল।

রাজা ও রঞ্জনের প্রতিযোগ রবীন্দ্রনাথ নানাদিক থেকে উপস্থাপিত করেছেন। রাজা জ্ঞানের পথে শক্তির সাধক। সে শক্তির লোভে আপন রচা কারাগারে বদ্ধ। দীর্ঘজীবন প্রাপ্তির সাধনায় সে সমস্ত হৃদয়বৃত্তি বিসর্জন দিয়েছে। সে মৃত্যুভীত। ঘুমের নিশ্চেষ্টতা তার কাছে মৃত্যুরই মতো। তাই তার 'ঘুমোতে ভয় করে'। সেই কারণেই হৃদয়দৌর্বল্য সে কিছুতেই প্রশ্রয় দেয় না। -"গান শুনতেও ভয় পায়। ওর বুকের মাঝে যে বুড়ো ব্যঙটা সকল রকম সুরের ছোঁয়া বাঁচিয়ে আছে, গান শুনলে তার মরতে ইচ্ছা করে। তাই ওর ভয় লাগে।" রাজা যেন তপস্বী রুদ্র। জান - জটিল আবরণে তার রূপ দেখা যায় না, তার 'ছায়া পড়ে - সে ভয়ঙ্কর'।

রঞ্জন যেন নটরাজ শিবসুন্দর। প্রাণের হিল্লোল তার যৌবনের উদ্দামতায় প্রকাশমান। তার লোভ নেই কিছুতে, তাই কোন বাঁধনই তাকে আটকাতে পারে না। তার জাদুতে সব বন্ধনই শিথিল হয়ে আসে। রঞ্জন "যেখানে যায় ছুটি নিয়ে সঙ্গে নিয়ে আসে। ওর গায়ে কিছু চেপে ধরে না। আর, ও কথায় কথা সাজ বদল করে চেহারা বদল করে আশ্চর্য ওর ক্ষমতা। কখন্ গারদের ভিত কেটে বেরিয়ে এসেছে। ভেলকি জানে'।

নন্দিনী 'প্রাণভরা খুশি' বা 'হর্ষ' প্রাণের সহজ ভালোবাসা, জীবনের সরল সৌন্দর্য্য, সৃষ্টির শেষ অর্থ আনন্দ। যার চিত্তে সজীবতা নিঃশেষিত নয় সে তাকে

দেখে আনন্দিত হয়। কিন্তু তাকে পেতে গেলে দুঃখবেদনার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আসতে হয়।

রঞ্জন রক্তকরবীর ভালোবাসে বলেই ও ফুল নন্দিনীর প্রসাধন নয়, দুঃখবেদনার রঙে রাঙা বলেই সে ফুল তার প্রসাদ।অনেক খুঁজে পেতে কিশোর নন্দিনীকে ফুল এনে দিয়েছে। নন্দিনী সে গাছের সন্ধান জানতে চাইলে কিশোর বলেছিল, "ওই গাছটি থাক, আমার একটি মাত্র গোপন কথার মতো, বিশু তোমাকে গান শোনায়, যে তার নিজের গান, এখন থেকে তোমাকে আমি ফুল যোগাব ; এ আমারই নিজের ফুল। নন্দিনী উত্তরে বলেছিল, 'কিন্তু এখানকার জানোয়াররা তোকে শাস্তি দেয়, আমার যে বুক কেটে যায়।" কিশোর বলে, "সেই ব্যথায় আমার ফুল আরো বেশি করে আমারই হয়ে ফোটে। ওরা হয় আমার দুঃখের ধন।" নন্দিনী বলেছিল, "কিন্তু তোমার এ দুঃখ আমি সইব কী করে।" কিশোর বলেছিল, "কিসের দুঃখ। একদিন তোর জন্য প্রাণ দেব নন্দিনী, এই কথা কতবার মনে মনে ভাবি।"

নন্দিনীর আকর্ষণ বিভিন্ন প্রকার সাড়া জাগিয়েছিল যক্ষপুরীতে। কিশোর চায় আত্মদান করতে , বিশু চায় গান শোনাতে, রাজা খুশি হয় - 'কিন্তু কিসে তা নিজের কাছে স্পষ্ট নয়, অধ্যাপক চায় নন্দিণীকে তত্ত্বকথা শোনাতে। "প্রাণ নিয়ে সর্বস্ব পণ করে" হারজিতের খেলায় রঞ্জন নন্দিণীকে জিতে নিয়েছিল। তারপর যক্ষপুরীর চক্রান্তে তাদের দুইজনের বিচ্ছেদ ঘটছে। নন্দিণী মিলনের জন্য উৎকণ্ঠিত। কিন্তু রঞ্জনের দেখা নেই। রাজাকে দেখে নন্দিনী অবাক হয়েছে। রাজার শক্তি তাকে মুগ্ধ করেছে।

নেপথ্যে। ..... আমার শক্তিতে তুমি খুশি হও নন্দিনী ?

নন্দিনী। ভারি খুশি লাগে। তাই ত বলছি, আলোতে বেরিয়ে এসো, মাটির উপর পা দাও, পৃথিবী খুশী হবে উঠুক।

নেপথ্যে। নানা, যেয়ো না, আমাকে কী মনে কর বলো।

নন্দিনী। কতবার বলেছি, তোমাকে মনে করি আশ্চর্য। প্রকান্ড হাতে প্রকান্ড জোর ফুলে ফুলে উঠেছে, ঝড়ের অপেক্ষায় মেঘের মতো দেখে আমার মন নাচে।

রঞ্জনকে দেখেও নন্দিনীর মন নাচে। রাজাকে সে উত্তর দেয় - "সে নাচের তাল আলাদা তুমি বুঝবে না।"

রঞ্জনের মৃত্যুতে রাজার দেহছাড়া আত্মা যেন ফিরে এল। তার কর্মশালা ও কারাগার ধ্বসে পড়ল। ধ্বজদন্ড ভেঙে ফেলে রাজা নন্দিনীকে দীপশিখা করে প্রলয়

টিপ্পনী

টিপ্পনী

নাচনের পথে এগিয়ে গেল। নন্দিনীকে নিয়ে হারজিতের খেলায় বিশুও ছিল। রঞ্জন নন্দিনীকে জিতে নিলে তার জীবনরস শুকিয়ে যায়। সে অসহায় হয়ে পড়ে। যাকে সে বিয়ে করেছিল তার প্ররোচনায় সে যক্ষপুরীতে ভালো চাকরি - চরগিরি পেয়েছিল। কিন্তু সে কাজ করা তার চলল না। তার পদাবনতি ঘটলে তার স্ত্রীও তাকে পরিত্যাগ করল। পাগল বলে তাকে কেউ অনুকম্পা কেউ বা অবজ্ঞা করতে লাগল। যক্ষপুরীতে নন্দিনীর দেখা পেয়ে বিশুর গানের নিরুদ্ধ কণ্ঠ খুলে গেল। নন্দিনীর ডাক শুনলে বিশু যে উৎসাহিত হয়ে উঠে, তা যক্ষপুরীর অধিবাসীদের অজ্ঞাত থাকে না। ফাগুলালের স্ত্রী চন্দ্রা বিশুকে একদিন স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা করল - "কোন্ সুখে ও তোমাকে ভুলিয়েছে বল দেখি বেহাই।"

বিশু। ভুলিয়েছে দুঃখে।

চন্দ্রা। বেহাই অমন উলটিয়ে কথা কও কেন।

ফাগুলাল। বিশুদাদা, পষ্ট করে কথা বলো, নইলে রাগ ধরে ..

বিশু। বলছি শোন, কাছের পাওনাকে নিয়ে বাসনার যে দুঃখ তাই পশুর, দূরের পাওনাকে নিয়ে আকাঙ্খার যে দুঃখ তাই মানুষের। আমার সেই চির দুঃখের দূরের আলোটি নন্দিনীর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

রক্তকরবী নাটকে ঠাকুরদাদা বা বাউল গোছের কোন ভূমিকা নেই। কাছাকাছি যে ভূমিকাটি আছে তা বিশুর। রঞ্জন ও রাজা নন্দিনীর ভালোবাসা পেয়েছে কিন্তু তাকে পায়নি অর্থাৎ আনন্দের সন্ধান পেয়েছে কিন্তু আনন্দের অধিকারী হয়নি। বিশু দুঃখবেদনার মধ্য দিয়ে আনন্দসিদ্ধি লাভ করেছে। রাজা যেমন রঞ্জনের বিশু তেমনি নন্দিনীর অপরার্ধ। তাই নন্দিনী বলে - "তোমাকে একটা কথা বলি পাগল, যে দুঃখটির গান তুমি গাও, আগে আমি তার খবর পাইনি।"

মহাপ্রস্থানের পথে পা দিয়ে নন্দিনী বিশুকে স্মরণ করিয়ে রক্তকরবীর কঙ্কন পথের ধূলায় ফেলে দিয়ে গেলে বিশু তা কুড়িয়ে নিয়ে বলেছিল -"তাকে বলেছিলুম, তার হাত থেকে কিছু নেব না। এই নিতে হল - তার শেষ দান।" রাজা নিষ্ঠুর, কঠিন, ভয়ঙ্কর কিন্তু নীচ নয়। ক্ষুদ্র, স্বার্থপর, নীচ এবং সম্পূর্ণভাবে মনুষ্যত্বহীন হচ্ছে সর্দার। আসলে সর্দারই রাজার প্রতিপক্ষ। রঞ্জনকে এনে দেবে এই ভেবে খুশি হয়ে নন্দিনী সর্দারকে কুন্দ ফুলের মালা দিয়েছিল। সর্দার বলেছিল, 'আজই তাকে দেখতে পাবে।' মনে মনে সে রাজাকে বঞ্চনা করে, রঞ্জনের বিনাশ স্থির করে রেখেছে। সুতরাং তার কথা মিথ্যা হল না। সেই দিনই নন্দিনী রঞ্জনের মৃতদেহ দেখতে পেল। কিশোরের মৃত্যুর জন্য সর্দার কতটা দায়ী তা বোঝা যায় না। তবে বিশুকে জব্দ করার জন্য সে যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল। রাজাও শেষে স্বীকার করেছিল, 'ঠকিয়েছে আমাকে

। আমারই শক্তি দিয়ে আমাকে বেঁধেছে।" যন্ত্র এমনি করেই যন্ত্রীকে জব্দ করে।

অধ্যাপক ভূমিকাগুলিও বেশ স্পষ্ট । দুটি একটি ভূমিকায় যেমন - গোঁসাইজীর - ব্যাঙ্গের ঝাঁজ আছে। কিন্তু অধ্যাপকের ভূমিকা তা নেই।

রক্তকরবীর ভূমিকাগুলিকে প্রতীক বলে বিবেচনা করলে নাটকটির একটি নিটোল রূপক নিষ্কর্ষ পাওয়া যায়। সে নিষ্কর্ষ অনুসারে রবীন্দ্রনাথের উক্তি সম্পূর্ণ যথার্থ - "এই নাটকটি সত্যমূলক"। সে সত্য মানব ইতিহাসের মেরুদন্ডের মর্মসত্য ।

সৃষ্টির প্রথমক্রমে জড় থেকে জীবের উদ্ভব কতকটা প্রকৃতির আনুকূল্যে এবং কতকটা দৈবসংঘটনায় সংসাধিত হয়েছিল । এইরূপ অনুমান বৈজ্ঞানিকরা করেন। তার পর থেকে জীবের ক্রমবিবর্তন প্রধান প্রকৃতির আনুকূল্যেই ঘটে আসছে । সে আনুকূল্যের সঙ্গে অবশ্যই ক্রমস্ফুটমান জীববৃত্তির সহযোগিতা ছিল। অবশেষে যখন মানুষের আবির্ভাব ঘটল তখন থেকেই প্রকৃতির সঙ্গে জীববৃত্তির প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আরম্ভ । প্রকৃতির প্রতিকূলতার উর্দ্ধে উঠবার চেষ্টার ফলেই মানুষের হৃদয়বৃত্তির ও বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমোৎকর্ষ । প্রচেষ্টার শেষ নেই । বিশেষ করে বুদ্ধির অনুশীলনে । আধুনিক কালে সভ্যমানুষের বুদ্ধিচর্চা তাকে প্রকৃতির নিগূঢ় শক্তির অধিকারী করেছে। এই শক্তি মদমত্ততায় এবং সেই সূত্রে আগত লুব্ধতার ফলে তার হৃদয়বৃত্তি সংকীর্ণতর হয়ে পড়েছে এবং তার ফলে প্রকৃতির সঙ্গে জীবনধারায় মানুষের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে আসছে। নিখিল - জীবন প্রবাহ বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিজীবন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হলে হৃদয়ের শুষ্কতা ও শূন্যতাই বেড়ে যায়, আনন্দের সম্ভাবনা নিশ্চিহ্ন হয় । মৃত্যু জীবন থেকে নবজীবনে উত্তীর্ন হবার তোরনদ্বার । নিখিল - জীবনধাত্রী প্রকৃতি মৃত্যুর মধ্য দিয়েই ব্যক্তি জীবনকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যায়। মৃত্যু ভয় করে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। জীবনের আনন্দ সহজ ও সরল। তাকে মুষ্টিতে আঁকড়াতে গেলে বাতাসের মতো উবে যায়। জলের মতো গলে যায়। কিন্তু বাতাসে আঁচল উড়ানোর মতো, স্রোতে গা ভাসানোর মতো সে আনন্দ অনায়সে ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করা যায়, কিন্তু তাকে ধরে রাখা যায় না । জীবনের আনন্দ জীবনের বেদনারই উল্টো পিঠ - এই তত্ত্বকথা রবীন্দ্রকাব্যের অন্তরবাণী তা রক্তকরবীর রূপকেও প্রমূর্ত।

রূপকের মধ্যে যে সত্য থাকে সাধারণ সত্য, সব দেশের এবং সব কালের সত্য। মানুষের মনের গতির ইতিহাস যদি কোথাও স্থায়িভাবে ধরা থাকে তা মুখ্যত সাহিত্যে। আধুনিক কালের তথাকথিত সভ্য দেশে ধনমত্ত ও শক্তিলুব্ধ ব্যক্তিমানুষ পরিচালিত জনপিন্ড যে জীবনের ক্ষেত্রে ইতস্তত তাড়িত হচ্ছে তাতে প্রাণের ও প্রকৃতির সহজ দান ও সরল সৌন্দর্য উপেক্ষিত ও রসবোধ সংকীর্ন হয়ে আসছিল।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

এরই প্রতিবাদে রক্তকরবীতে ধনের উপর ধান্যের, শক্তির উপরে প্রেমের এবং মৃত্যুর উপরে জীবনের জয়গান ধ্বনিত। লোভের ভূমিগর্ভে সুড়ঙ্গ না কেটে জ্ঞান ও শক্তি যদি প্রকৃতির সৌন্দর্যের মোহমুক্ত ক্ষেত্রে জীনের সঙ্গে মিলিত হয় তবেই কল্যাণে সার্থকতা। এটাই রক্তকরবীর বক্তব্য। রবীন্দ্রনাথ এই সম্পর্কে যা বলেছেন তা রক্তকরবীর মর্মকথা।

> যক্ষপুরের পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন করে আনছে। নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টায় তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য সেখান থেকে নির্বাসিত। সেখানে জটিলতার জালে আপনাকে আপনি জড়িত করে মানুষ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই সে ভুলেছে। সোনার চেয়ে আনন্দের দাম বেশি ; ভুলেছে, প্রতাপের মধ্যে পূর্ণতা নেই, প্রেমের মধ্যেই পূর্ণতা। সেখানে মানুষকে দাস করে রাখবার প্রকান্ড আয়োজনে মানুষ নিজেকেই নিজে বন্দী করেছে।
>
> এমন সময় সেখানে নারী এল, নন্দিনী এল। প্রাণের বেগ এসে পড়ল যন্ত্রের উপর, প্রেমের আবেগ আঘাত করতে লাগল লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধন জালকে। তখন সেই নারীশক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনায় কী করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল, এই নাটকে তাই বর্ণিত আছে।

অচলায়তনের সঙ্গে রক্তকরবীর কিছু মিল লক্ষ করা যায়। অচলায়তনের গুরু শিষ্যেরা না বুঝে আচার অনুষ্ঠানের ঘানি ঘুরিয়েছে আর যক্ষপুরীর সর্দার মজুরেরা ভয়ের কারায় লোভের নেশায় খেটে মরছে। লোভের নেশায় খেটে মরছে। লোভের প্রয়োজনের অন্ত নেই, এই তাদেরও খাটুনির শেষ নেই।

রক্তকরবীর রঞ্জন রঙ্গভূমির বাইরে থাকলেও রঞ্জন আইডিয়াটি নাট্যসুত্র পরিচালিত করেছে। এই আইডিয়ার সিম্বল রক্তকরবী।

প্রতিবাদের নাটক রক্তকরবী :

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
100

প্রতিবাদের নাটক হিসাবে রক্তকরবী বহুমাত্রিক। কর্ষণজীবী সভ্যতার সঙ্গে আকর্ষনজিবী সভ্যতার দ্বন্দ্ব, যন্ত্রসভ্যতার যান্ত্রিকতার সঙ্গে সুস্থ মানবতার দ্বন্দ্ব, মানুষের মধ্যেকার শুভ ও অশুভ বোধের দ্বন্দ্ব,প্রেম-প্রীতি -ভালোবাসা নিরপেক্ষ জীবনে যারা শুধু ঐশ্বযর্কেইএকমাত্র সত্য বলে জ্ঞান করেন তাদের বিরুদ্ধে সবুজ সতেজ প্রাণের প্রবল প্রতিবাদ প্রভৃতি এর এক একটি মাত্রা। যক্ষপুরীর দুই বিশেষ

শ্রেণীর অধিবাসীরা নাটকে কুশীলব । একপক্ষে রয়েছে রাজা, অধ্যাপক, সর্দার, মোড়ল ও গোসাইরা ; অন্যপক্ষে খোদাইকরের দল । তাদের পারস্পারিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেছে নাট্য ঘটনা।

যক্ষপুরী আসলে একটি প্রেতপুরী। এখানকার প্রেতাত্মারা কামনা করে আরও বেশি সম্পদের। তাদের কামনার আগুনে আত্মাহুতি দেয় গোকুল, ফাগুলালরা। তারা খনির গভীর থেকে তাল তাল সোনা এনে পূর্ণ করে রাজভান্ডার, কাজ করতে করতে তাদের মন একসময় ছুটি চায়। কিন্তু সর্দাররা কাউকে ছুটি দিতে রাজি নয়। তারা যুক্তি দেখায় - "কেন ? যে বাসা দিয়েছে সে তো খাসা, বাড়ির চেয়ে অনেক ভালো। সরকারি খরচে চৌকিদার পর্যন্ত রাখা গেছে।" আসলে তারা জানে এখান থেকে একবার বেরিয়ে যেতে পারলে এরা আর কেই ফিরে আসবে না। তারা চায় মদের স্রোতে গা ভাসিয়ে ফাগুলালরা ক্লান্তি দূর করে নিক, প্রয়োজনে একটু ধর্মকথা শুনুক । এর অতিরিক্ত কোন মানবিক অনুভূতিকে সর্দাররা স্বীকার করে না। তাদের কৌশল গুনে যক্ষপুরীতে কাজ করতে আসা শ্রমিকদের অনেক যন্ত্রে পরিণত হয়েছে । ঘটনাচক্রে যক্ষপুরীর সীমায় কিছু মানুষ এসে পড়ে যারা কিছুতেই যন্ত্র হতে চায় না। রঞ্জন, নন্দিনী, কিশোর, বিশু এই দলের । এদিকে সর্দাররাও ছাড়বার পাত্র নয় । তাদের পক্ষে রয়েছে সম্পূর্ণ রাষ্ট্রশক্তি, সর্বোপরি প্রবল প্রতাপান্বিত মকররাজ, নন্দিনীরা বাহুবলে খুব সবল না হলেও প্রবল মানসিক শক্তিতে বলীয়ান । তারাও কিছুতেই হার মানতে চায় না।

নাটকের সূচনা হয়েছে প্রতিবাদের পূর্বাভাসে। প্রাণের আবেগে দীপ্ত কিশোর নন্দিনীকে চিৎকার করে ডেকেছে 'নন্দিনী ! নন্দিনী ! নন্দিনী' এমন চিৎকার করে কথা বলা যক্ষপুরীর রীতি বিরুদ্ধ । শুধু চিৎকার করে কথা বলা নয়, খোদাইকররা নিজেদের অতিরিক্ত কথা বলুক সর্দাররা তাও চায় না। তাদের দেখে বিশু ফাগুলালরা কথা বলা বন্ধ করে দেয়। এখানে রাজা থেকে সর্দার সকলেই নিয়মের দাসত্ব করে। কিশোর সেখানে এক মূর্তিবান বিদ্রোহ। সে নিয়ত নিয়মের বেড়াজাল ভেঙে ফেলতে চায়, এতেই নাকি তার আনন্দ। যক্ষপুরী আঁধার সমুদ্র। কিশোর এই আঁধার সমুদ্রে ডুব দিয়ে আলোর সন্ধান করে। নন্দিনী তার ধ্রুবতারা। রক্তকরবী নন্দিনীর প্রিয় ফুল। কিশোরের সাধনা রক্তকরবীর মালা গেঁথে নন্দিনীর পদতলে অর্পণ করা। যক্ষপুরীর আঁধার রাজ্যে রক্তকরবী বিশেষ ফোটে না। কিশোরকে তাই অনেক সন্ধান করতে হয়। এতে সে একটা আলাদা আনন্দ পায়। নন্দিণী নিজে গিয়ে ফুল তুলে আণার প্রস্তাব করলে সে প্রতিবাদ করে নন্দিনী, নিষ্ঠুর হোয়ো না। এমন সে ভালবাসা তার জন্য কিশোরকে চড়া মূল্য দিতে হয় । কাজ ফাঁকি দিয়ে ফুল তুলতে যাওয়ার অপরাধে সর্দাররা তাকে শাস্তি দেয় । সে শাস্তি নন্দিনীর মনে তীর হয়ে বেঁধে, 'এখানকার জানোয়াররা তাকে শাস্তি দেয়, আমার যে বুক ফেটে যায়।" কিন্তু কিশোর

টিপ্পনী

টিপ্পনী

কোন কিছুতেই পরোয়া করে না। তার স্পষ্ট কথা 'সমস্ত দিন তো কেবল সোনার তাল খুঁড়ে আনি, তার মধ্যে একটু সময় চুরি করে তোর জন্য ফুল খুঁজে আনতে পারলে বেঁচে যাই।' এমনি করে বেঁচে থাকার প্রয়াসই তো প্রেমের অন্য নাম।

প্রেম সাগরে ডুব দিয়ে অস্তিত্বের সংকট থেকে উত্তরণের পথ খুঁজছে নাটকের আর এক চরিত্র বিশু। সেও কিশোরের মত ভালোবাসে নন্দিনীকে তবে তার ভালোবাসার ধরন একটু আলাদা। তার প্রেমের প্রকাশ গানে। সে গানের স্রোতে ভেলা ভাসায় আর তাতে তুলে নেয় নন্দিনীকে। নন্দিনী তার দূর আকাশের চাঁদ। জীবনের প্রথম প্রভাতে সে নন্দিনীকে ভালোবেসেছিল। তারপর রঞ্জনের সঙ্গে প্রেম যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল অনেক দূরে। ঘটনাচক্রে যক্ষপুরীর এই প্রেতপুরীতে আবার নন্দিনীর সঙ্গে তার দেখা। এখানে নন্দিনীকে সে জাগিয়ে রাখতে চেয়েছে , আবার তার সংস্পর্শে নিজেকেও যেন নতুন করে ফিরে পেয়েছে - যক্ষপুরীতে ঢুকে অবধি এতকাল মনে হতো, জীবন হতে আমার আকাশখানা হারিয়ে ফেলেছি। মনে হতো এখানকার টুকরো মানুষের সঙ্গে আমাকে এক ঢেকিতে কুটে একটা পিন্ড পাকিয়ে তুলেছে। তার মধ্যে ফাঁক নেই। এমন সময় তুমি এসে আমার মুখের দিকে এমন করে চাইলে, আমি বুঝতে পারলুম আমার মধ্যে এখনো আলো আছে।' তার প্রেম-পদ্মের সৌরভে সুরভিত নন্দিনী সহ যক্ষপুরীর মানুষ। চন্দ্রা আর ফাগুলাল মতো যারা নন্দিনীতে কোনভাবেই মুগ্ধ হয়নি তারাও কিন্তু বিশুর ভালবাসায় মজেছে। নাটকের পরিণতিতে খোদাইকরের দল যে ভাঙার খেলা শুরু করেছে সে বিশুরই জন্য।

নায়িকা নন্দিনী প্রেমের আর এক রূপ। সে প্রেমের বিশ্বাত্মা। তার প্রেমক ছড়িয়ে যায় দিক থেকে দিগন্তে। রঞ্জন তার শক্তির উৎস। রঞ্জনাকে ভালোবাসে সে ভালোবাসতে শিখেছে শত্রু - মিত্র নির্বিশেষে সকলকে এমন ভয়ঙ্কর যে মকররাজ নন্দিনী তাকেও প্রেমের বাঁধনে বাঁধতে চায়। অধ্যাপককে উদ্দেশ্য করে সে বলে - "তোমাদের ঐ সুড়ঙ্গের অন্ধকার তালাটা খুলে ফেলে তার মধ্যে আলো ঢেলে দিতে ইচ্ছে করে, তেমনি ইচ্ছে করে ঐ বিশ্রী জানলাটাকে ছিঁড়ে ফেলে মানুষটাকে উদ্ধার করি।" তার প্রেমে সবাই ধরা পড়ে অধ্যাপক থেকে রাজা পর্যন্ত। নন্দিনীর প্রেমের আলোয় স্নাত হয়ে তারা তখন নতুন মানুষ। বিশু বা কিশোরের থেকে নন্দিনীর প্রেম এখানেই আলাদা। তারা তাদের ভালবাসা অর্পণ করেছে নন্দিনীকে, আর নন্দিনী তার ভালবাসা ছড়িয়ে দিয়েছে সকলের মধ্যে। দুই বিপরীতমুখী প্রেম শেষপর্যন্ত একমুখী হয়ে প্রবল আঘাত হেনেছে সর্দারদের দুর্গ প্রাসাদে। এতে তার ভিত গেছে টলে। যক্ষপুরীর প্রেমহীনতার বিরুদ্ধে সবুজ সতেজ প্রাণের প্রতিবাদ এখানেই।

নন্দিনীকে যত দেখেছে ততই বিরক্ত হয়েছে সর্দাররা। তারা তার বিরুদ্ধে

যুদ্ধের ঘোষণা করেছে - "ওহল ইন্দ্রদেব আগুন। অনেককে টানবে, তারপরে শেষ বোঝাপড়া হবে তোমাতে আমাতে। বেশি দেরী নেই।' এই যুদ্ধের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে রঞ্জনের সঙ্গে নন্দিনীর মিলনের পথ চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কৌশলে রাজাকে দিয়ে হত্যা করানো হয়েছে রঞ্জনকে। কিন্তু তাতেও নন্দিনীর চলা থামে নি। মৃত্যুর আগে রঞ্জন এক প্রস্থ মাতিয়ে দিয়ে গিয়েছিল খোদাইকরের দলকে - 'দিয়েছিলুম, ভাবলুম চাপে পড়ে বশ মানবে, উলটো হল - খোদাইকরদের উপর ও যেন চাপ নেমে গেল। তাদের মাতিয়ে তুললে, বললে আজ আমাদের খোদাই নৃত্য হবে।' রঞ্জনের মৃত্যুর পর তার অবশিষ্ট কাজের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে নন্দিনী। সে এখন রঞ্জরূপপূর্ণ সূর্যের আকর্ষণে উদ্বেলিত। এমন উদ্বেলিত সিন্ধুকে প্রতিহত করে কার সাধ্য। ভেসে গেছে সর্দার পক্ষের সমস্ত প্রতিরোধ।

নতুন ফসলের গন্ধে মেতে উঠেছে যক্ষপুরী। নন্দিনী যক্ষপুরীর মৃতবৎ মানুষ গুলিকে স্মৃতির পথ ধরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে তাদের হারানো অতীত - 'পাগল ভাই, দূরের রাস্তা দিয়ে আজ সকালে ওরা পৌষের গান গেয়ে মাঠে যাচ্ছিল, শুনেছিল।' তার এ চেষ্টা বিশুকেতো বটেই চন্দ্রাকে পর্যন্ত ভিতর থেকে চাগিয়ে দিয়েছে। চন্দ্রা এমনিতে নন্দিনীর ঘোর বিরোধী। তবু সে তার পৌষের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারে নি। নতুন ফসলের গন্ধে মেতে উঠেছিল যে যন্ত্রমানবের দল তারা এখন সকলেই বিদ্রোহের পতাকা নিয়ে নন্দিনীর পশে এসে দাঁড়িয়েছে। শুরু হয়েছে শেষ লড়াই। এ লড়াইয়ে চূড়ান্ত হার হয়েছে সর্দার পক্ষের। তাদের প্রতিরোধের ব্যূহ ভেদ করে এগিয়ে গেছে খোদাইকরেরা। তারা বন্দীশালার প্রাচীর ভেঙে উদ্ধার করে এনেছে বিশুকে। তারপর সকলে মিলে উড়িয়ে দিয়েছে বিজয় কেতন ; আকাশ বাতাস জুড়ে ধ্বনিত হয়েছে পৌষের গান - "পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয় রে চলে / আয় আয় আয়।/ ধূলার আঁচল ভরেছে আজ পাকা ফসলে, / মরি হায় হায় হায়।

পৌষের গান দিয়ে নাটকেরেই পরিসমাপ্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, এ নাটকের আদিঅন্ত জুড়ে ব্যাপ্ত রয়েছে এক শ্বাসরোধকারী অবস্থা। রাজা এক ঐশ্বর্যমদমত্ত পুরুষ। তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে নন্দিনী। রাজা তাই উপলব্ধি করেছে সে। সীমাহীন শূন্যতায় ভরা এক মরুভূমি ; ভয়ঙ্কর রকমের পিপাসার্ত। বেঁচে থাকার আকাঙ্খায় ব্যাকুল - 'বুঝতে পারবে না। আমি প্রকান্ড মরুভূমি তোমারমতো একটি ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত।' এই ব্যাকুলতা থেকেই সে নন্দিনীর কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করেছে - "সেই গুচ্ছ গুচ্ছ কালো চুলের নীচে মুখ ঢেকে ঘুমাতে ভারি ইচ্ছা করছে।" এতে সাড়া না দিয়ে পারেনি নন্দিনী। সে বিছিয়ে দিয়েছে তার শ্যামল অঞ্চল। রাজা এ অঞ্চলতলে মুখ লুকিয়ে নিজেকে আবিষ্কার করেছে। নন্দিনীর প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত রাজা যখন জীবনটাকে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

নতুন করে শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখনই শোনা গেছে সেই দুঃসংবাদ। মৃত্যু হয়েছে রঞ্জনের আর রাজা নিজে সে মৃত্যুর কারিগর। সর্দারদের কৌশলের শিকার হতে হয়েছে তাকে। এমন অবস্থায় রাজার পক্ষে নন্দিনীর হাত ধরে বেরিয়ে এসে সর্দারদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেওয়াতে কোন অস্বাভবিকতা নেই । তাই যারা প্রতিবাদের নাটক হিসাবে রক্তকরবীকে শুধুই তত্ত্বগতা নিছক বায়বীয় বলে উড়িয়ে দিতে চান তারা যথার্থ নন। এই প্রসঙ্গে নাট্যকারের নিজস্ব ব্যাখ্যার কথাও স্মরণ করতে হয় - "আদি কবির সাত কান্ডে স্থানাভাব ছিল না, এই কারণে লঙ্কাপুরীতে তিনি রাবণ ও বিভীষণকে স্বতন্ত্র স্থান দিয়েছিলেন, কিন্তু আভাস দিয়েছিলেন যে তারা একই, তারা সহোদর ভাই। আমার স্বল্পায়ত নাটকে রাবণের বর্তমান প্রতিনিধিটি একই দেহেই রাবণ ও বিভীষণ, সে আপনাকেই আপনি পরাস্ত করে।"

রক্তকরবী নন্দিনী নামে এক 'মানবীর ছবি'। একজন নারীকে সামনে রেখে এখানে যেভাবে প্রতিবাদের আগুন জ্বেলে দেওয়া য়েছে তা অভিনব। রবীন্দ্র - নাটকে তো বটেই অপরাপর বাংলা নাটকেও এই প্রবণতা বিশেষ চোখে পড়ে না। অথচ প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে, বিশেষত বাংলা লোকসাহিত্যে এর ঐতিহ্য রয়েছে। বেহুলার প্রতিবাদী সত্তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে। প্রতিবাদী নারী হিসাবে মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতীরা অসামান্য। আধুনিক বাংলা উপন্যাস ও কাব্য - কবিতায় প্রতিবাদী বাঙালি নারীর এই ঐতিহ্যের অনুবর্তন কম-বেশি লক্ষ করা গেলেও বাঙালি নাট্যকাররা এ বিষয়ে বিশেষ উচ্চবাচ্য করেন নি। সধবার একাদশীতে এত অনাচারের পরেও নিমচাঁদ বা অটলের স্ত্রীরা স্বামী প্রেমে অটল। যে মধুসুদন বীরাঙ্গনাকাব্যে প্রতিবাদের অগ্নিস্ফূরণ করিয়েছেন তিনিও 'কৃষ্ণকুমারী' তে প্রচলিত পথের পথিক। নন্দিনী বাংলা নাটকের এ প্রচলিত প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ।

নন্দিনী কোন কল্পনার চরিত্র নয় তাকে বাস্তবের পটভূমিতে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন নাট্যকার। তাকে নিয়ে আসা হয়েছে ঈশানী পাড়া থেকে। সেখানে একদা সে খঞ্জনী নামে পরিচিত ছিল। এই গ্রামীণ প্রেক্ষাপট লোকঐতিহ্য অনুসরণের ফল। নন্দিনীর পোশাক পরিচ্ছেদেও আদ্যন্ত গ্রামীণ। কুন্দ ফুলের মালা গেঁথে গেঁথে সে উপহার দিয়েছে শত্রু - মিত্র সকলকে। মাথায় পরেছে রক্তকরবীর মালা। রাজার ঘর থেকে কঙ্কু শক্লুরা যখন উচ্ছিষ্ট হয়ে বেরিয়ে এসেছে তখন তাদের দেখে নন্দিনীর ব্যাকুলা লক্ষ করার মতো - "ওদের এমন দশা কে করলে ? ..... অনুপ, শকলু - এই দিকে চেয়ে দেখ। ও, এই আমি, তোমাদের নন্দিন, ঈশানী পাড়ার নন্দিন । মাথা তুলে দেখলে না - ওকী, কঙ্কু যে ! আহা, আহা, ওর মতো ছেলেকেও যেন আখের মতো চিবিয়ে ফেলে দিয়েছে। ..... গেলো গো, আমাদের গায়ের সব আলো নিবে গেল ! - 'এ ব্যাকুলতায় গ্রামীণ সংস্কৃতির ছায়া পড়েছে, এই মেয়েরই হাতে লেখক তুলে দিয়েছেন জয় পতাকা। এতে নাটকটি অন্য মাত্রা পেয়েছে।

নাটকের নাম রক্তকরবী, নায়িকা নন্দিনী। দুটি নামই অর্থবহ। রক্তকরবী দৃপ্ত প্রাণের প্রতীক। যক্ষপুরীর যন্ত্রিকতায় এ নাম ভিন্ন তাৎপর্য পায়। নন্দিনী আনন্দদায়িনী। যক্ষপুরীতে আনন্দের আয়োজন বড়ই সীমিত। নেই বললেই চলে। নাট্যকার আনন্দের উততাপ করতে চেয়েছেন নন্দিনীর নামের সূত্রে। এ নাম বহুস্তরিক। বিশু থেকে শুরু করে রাজা প্রত্যেকেই নামটিকে ভেঙে গড়ে নিজের মতো করে তৈরি করে নিয়েছে। কেউ ডেকেছে নন্দ, কেউ নন্দিন। এভাবে ডাকার মধ্যে সজীব প্রাণের হিল্লোল আছে।

রবীন্দ্র - নাট্যধারায় প্রতিবাদের নাটক সংখ্যায় কম নয়, তবু রক্তকরবীর জন্য নাট্যকারের আন্তরিকতা বিশেষভাবে লক্ষ করার মত। নাটকটির সঙ্গে যে ভূমিকা সংযোজন করা হয়েছে তা অর্থবহ। - 'এ নাটকটি সত্যমূলক। এর ঘটনাটি কোথাও ঘটেছে কি না ঐতিহাসিকের পরে তার প্রমান সংগ্রহের ভার দিলে পাঠকদের বঞ্চিত হতে হবে।এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে, কবির জ্ঞানবিশ্বাস মতে এটি সম্পূর্ণ সত্য।' বোঝা যায় নাট্য বিষয়কে দর্শক পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য নাট্যকার একটা তাগিদ অনুভব করেছেন। নাটকটির সত্যভিত্তি সম্পর্কে নাট্যকার এতটাই স্থির বিশ্বাসী ছিলেন যে, উত্তরকালে এ সম্পর্কে বলতে গিয়েও পূর্বকথার পুনরাবৃত্তি করেছেন - "বাল্মীকির রামায়ণকে ভক্ত পাঠকেরা সত্যমূলক বলে স্বীকার করেন। আমার পালাটিকে যাঁরা শ্রদ্ধা করে শুনবেন তাঁরা জানবেন এটিও সত্যমূলক। ঐতিহাসিকের উপরে প্রমাণের ভার দিলে ঠকবেন। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, কবির জ্ঞান বিশ্বাস মতে এটি সত্য।'

রক্তকরবীকে শুধু সত্যমূলক বলে রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হননি, আরও সওয়াল করেছেন -"কিন্তু এ নাটকটি একেবারেই পৌরাণিক নয়, একে রূপকও বলা যায় না।" এমনিতে নাটকটিকে পৌরাণিক কালের বিষয়াশ্রিত বা রূপকধর্মী ভাবার সঙ্গত কারণ আছে। যক্ষপুরী নামেই রয়েছে পুরাণের স্পর্শ, যক্ষের ধন, মকররাজ এসব তো পৌরাণিক বিষয়। রামায়ণের ঘটনার সঙ্গে রক্তকরীর যে রূপকধর্মী এক যোগ রয়েছে তার ব্যাখ্যা নাট্যকার নিজেই দিয়েছেন। কিন্তু তিনি চাননি নাটকটি শুধুমাত্র পৌরাণিক পরিচয়ে পরিচিত হোক। তাতে এর আবেদন অনেক লঘু হয়ে যায়। নাট্যকার বরং যক্ষের একটা ডাইমেনশন সন্ধান করেন। যে যক্ষ ছিলেন শুধুই পৌরাণিক দেবতা তিনি এখন এই কলিযুগে জন্ম নিয়ে নতুন পরিচয়ে পরিচিত হচ্ছেন। আধুনিক কালের যক্ষ বিশ্বজনীন। সব দেশের সব সমাজেই তার অধিষ্ঠান। ভারতীয়রা তাদের কল্পনার পাখা মেলে যক্ষের ধনভান্ডার সম্প্রসারিত হতে দেখতেন দেশের চতুর্সীমায়। কবি আধুনিক যক্ষের ধনভান্ডারকে ছড়িয়ে যেতে দেখেছেন সমস্ত মর্ত জুড়ে। নাটকটিকে তাই বাঁধা হয়নি কোনো দেশ-কালের বাঁধনে। এ যক্ষপুরীর ভৌগলিক অবস্থান হতে পারে যে কোনো দেশের যে কোনো অঞ্চলে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

অথবা আজকের পৃথিবীটাই একটা যক্ষপুরী। এই ভূমন্ডল জুড়ে রয়েছে হাজার হাজার সব যক্ষপুরী। দেশে দেশে যক্ষপুরীর অধীশ্বরদের নাম বিভিন্ন। নাট্যকার তাদের একটি সাধারণ ব্যবহারিক নাম নির্ধারণ করে দিয়েছেন মকররাজ।

মকররাজের হাতে আমাদের সমাজ সংসারের কী যে নিদারুন পরিণতি হচ্ছে আমরা প্রত্যেকেই তার সাক্ষী। অথচ আশ্চর্য এই পরিণতি প্রত্যক্ষ করেও আমরা এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন নই। বরং একটা অন্ধ আকর্ষণকে যেন ভিতরে ভিতরে পোষণ করে চলেছি। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার প্রতি মানুষের এই গোপন ভালোবাসাকে নাট্যকার কিছুটা ব্যঙ্গের সুরে বিদ্ধ করেছেন, আজকের দিনের রাক্ষসের মায়ামৃগের লোভেইতো আজকের দিনের সীতা তার হাতে ধরা পড়েছে। নইলে গ্রামের পঞ্চ বটছায়াশীতল কুটির ছেড়ে চাষীরা টিটাগড়ের চটকলে মরতে আসবে কেন।" তবে এখানেই তিনি তাঁর কর্তব্য শেষ করেন নি। ঐশর্যের প্রতি মোহাবিষ্ঠ মানুষের পরিণতির কথা ভেবে নিজেও অব্যক্ত ব্যাথায় কাতর হয়েছেন। যে দুর্বলতা চিরন্তন তার থেকে মানুষকে উদ্ধার করা অত্যন্ত কঠিন। মহাকালের প্রেক্ষাপটে অনুসন্ধান করতে হয় সমাধানের পথ। নাট্যকার খুব সচেতনভাবে নাট্যঘটনাকে মহাকালের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করেছেন। মকররাজ একই সঙ্গে অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের। নন্দিনী ও রঞ্জনরাও তাই। মকররাজের মধ্যে যেমন রয়েছে অমোঘ আকর্ষণশক্তি নন্দিনীরাও তেমনি এক মায়াশক্তিতে সমৃদ্ধ। তারাও এমন একটা মায়াজাল বিস্তার করে রাখে যে মানুষও মাটি মায়ের অঞ্চল ছেড়ে কলে কারখানায় কাজ করতে চলে গেলেও কখনোই ভুলতে পারে না মাটির গন্ধ। স্মৃতির পটে একদিন সবই আবার সত্যের ফুল হয়ে ফোটে। তখন শুরু হয় প্রতাবর্তনের পালা। সেই প্রথম দিন থেকে এ পালার অভিনয় চলছে বলে আজও টিকে আছে গ্রামীণ সভ্যতা - সংস্কৃতি। প্রতিবাদের নাটক যদি ঐতিহ্যের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে ব্যর্থতার সম্ভবনা থেকে যায়। রক্তকরবীকে নাট্যকার ঐতিহ্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে প্রতিবাদের নাটক হিসাবে এর সম্ভাবনাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

কিন্তু এ নিয়ে না কথা উঠেছে। রক্তকরবীতে রাজাকে যেভাবে প্রতিবাদের মিছিলে সামিল করা হয়েছে তা কতটা ন্যায়সঙ্গত। এরজন্য প্রতিবাদের বহর কি আরও দীর্ঘ হয়েছে। এটা না করে যদি প্রতিবাদ পন্থার সাধারণ পথ ধরে এগিয়ে যাওয়া যেত তা হলেই বা কী হত।নন্দিনীর নেতৃত্বে ফাগুলালরা বন্দিশালার প্রাচীর ভেঙে উদ্ধার করে আনত বিশুকে। অতঃপর বিশু নন্দিনীতে মিলে মকররাজের বিরুদ্ধে শুরু করত চূড়ান্ত সংগ্রাম, উড়িয়ে দিত বিজয়কেতন। এতে নাটকের ভিত্তি আরও দৃঢ় হত না কি ?

প্রতিবাদ - প্রতিরোধের নাটক হিসাবে রক্তকরবীর ভূমিকা বিতর্ক আছে। এই

বিতর্ক নিরসনের জন্য বোধ হয় তৃতীয় প্রশ্নকে তুলে আনা জরুরি - রক্তকরবী কি সত্যিই প্রতিবাদের নাটক । নাট্যকার কি চেয়েছিলেন নাটকটিকে এমন একটা শ্রেণীগত পরিচয়ে পরিচিত করতে। বলা বাহুল্য এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে রবীন্দ্র জীবনাদর্শ ও সাহিত্যাদর্শের মধ্য থেকে। ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ শিব সত্য সুন্দরের মন্ত্রে দীক্ইত, সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ আদ্যন্ত কলাকৈবল্যবাদী। কলাকৈবল্যবাদী রবীন্দ্রনাথ মাঝে মধ্যে শিল্পের সৌন্দর্যলোক থেকে নেমে এসে মাটি মানুষের মাঝে পা রেখেছেন । কিন্তু তার অর্থ এই নয় তিনি স্বধর্ম থেকে সরে এসেছেন। বরং কলাকৈবল্যবাদের সীমানায় দাঁড়িয়ে তিনি একটা হাতকে বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন বাস্তব পৃথিবীর দিকে। সেই অর্থে রিয়ালিস্টিক বা বাস্তববাদী সাহিত্য বলতে আমরা যা বুঝি রবীন্দ্রনাথ তাকে কোনোদিনই পুরোপুরি মেনে নিতে পারেন নি। বরাবরই একটা দূরত্ব বজায় রেখে গেছেন। এদিকে যে প্রতিবাদী নাটক নিয়ে আমাদের আলোচনা তার অবস্থান ওই বাস্তববাদী সাহিত্যের শ্রেণিতে। এই অবস্থায় প্রতিবাদী নাটকের সাধারণ মানদন্ডে রক্তকরবীর মূল্যায়নের চেষ্টা হলে বিভ্রান্তি তৈরি হওয়া স্বাভাবিক । আমাদের তাই বিষয়টিকে অন্যভাবে পর্যালোচনা করতে হবে।

রক্তকরবী প্রতিবাদ - প্রতিরোধমূলক রচনার থেকে আরো বেশী কিছু। শুধু কোন প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের কথা বলার জন্য এ নাটক লেখা হয় নি। যে বাস্তব অবস্থা রবীন্দ্রনাথকে নাটকটি লিখতে প্রাণিত করেছিল কবি সেই বাস্তবের দাবি মেনে নিয়েছেন, কিন্তু সেখানেই থেমে থাকেন নি। প্রতিবাদ - প্রতিরোধের ধারণা ক্ষণিকের সত্য, পরিস্থিতি পাল্টে গেলে বিষয়টি তাৎপর্য হারায় । এমন ক্ষণিক সত্যের সীমা ধেকে মুক্ত করে তিনি তাঁর সৃষ্টিকে তুলে নিয়ে যেতে চেয়েছেন এক চিরন্তন শাশ্বত লোকে। যন্ত্রসভ্যতার পীড়নে পীড়িত মানুষের আর্তনাদ আজকের পৃথিবীতে দেশ-কাল নিরপেক্ষ সত্য । নাটকটিকে দাঁড় করানো হয়েছে এই সত্যভিত্তির উপরে । অতঃপর সমাধানের যে পথ প্রদর্শিত হয়েছে তা নাট্যকারের সম্পূর্ণ নিজস্ব ধারণা প্রসূত। এ পথ প্রেমের পথ। প্রেমের পথে প্রতিহিংসার স্থান নেই, নেই কোনো বিরোধ । এখানে সব বিরোধের অবসান হয়। প্রেমের স্পর্শে মানুষ একসময় তার যাবতীয় সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হয়ে উন্নীত হয় পরম পবিত্র লোকে । রক্তকরবী সেই উত্তরণের ইতিবৃত্ত।

মকররাজ ধনসম্পদের মোহে আবিষ্ট হয়ে যক্ষপুরীকে করে তুলেছিল প্রেমহীন এক ধূসর মরুভূমি। কিশোর বিশুরা এই মরুভূমিতে ফসল ফলানোর কামনা করে। কিন্তু এমন ধূসর যে মরুভূমি তাকে আবার সবুজে শ্যামলে ভরিয়ে তোলার জন্য শুধু মানবিক প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়। তার জন্য প্রয়োজন দেবতার আশীর্বাদ। নন্দিনী সেই আর্শীবাদস্বরূপ। সে যক্ষপুরীর আঁধার সমুদ্রে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তার প্রেমের আলোয় আলোকিত হয়েছে এ আঁধার পুরীর প্রতিটি অলিন্দে। মকররাজের গহন

টিপ্পনী

টিপ্পনী

গভীরে আলো ফেলতেও নন্দিনীর বাঁধনে। এমন প্রেম ভালোবাসার পথই তো শেষ কথা। এ পথে সব সমস্যার সমাধান সম্ভব। যুগ যুগ ধরে ধর্মপ্রচারকরা এই পথেই হেঁটেছেন এবং সফল হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ধর্ম প্রচারক নন, তিনি শিল্পী সাহিত্যিক। তাঁর পক্ষে বলার কথাকে কথা মাতরকে সীমাবদ্ধ রাখায় কোনো সার্থকতা নেই, একে শিল্পের রঙে রাঙিয়ে দেওয়াই তার সাধনা। রক্তকরবী এই সাধনার উৎকৃষ্টতম ফসল। শিল্পী মনের এক এক আলোকিত উদ্ভাসন। একে ঠিক প্রতিবাদ প্রতিরোধের নাটক বলা চলে না। শুধু রক্তকরবী নয়, রবীন্দ্রনাথের কোনো নাটকেই সম্ভবত এই ধারায় ফেলা যায় না। আসল কথা এই যে মানুষের জীবনে ব্যবহারিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত যদি কোনো সত্য থাকে রবীন্দ্রনাথ সে সত্যের পূজারী, রক্তকরবী তাঁর পূজাচার। শুধু রবীন্দ্রনাথ নন, এমন করে সত্যকে অনুসন্ধান করে ফেরেন যে সব মানুষ রক্তকরবী তাদের পথ চলার পাথেয় স্বরূপ।

সহায়ক গ্রন্থাবলী :

১। রবীন্দ্র নাট্যপরিক্রমা - শ্রী অশোক সেন।

২। রবীন্দ্র নাট্যপরিক্রমা - উপেন্দ্র ভট্টাচার্য।

৩। রবীন্দ্রনাথের রূপকনাট্য - শান্তিকুমার দাশগুপ্ত

৪। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস - আশুতোষ ভট্টাচার্য

৫। রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা - নীহাররঞ্জন রায়।

৬। রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ - প্রমথনাথ বিশী

৭। রবীন্দ্রনাথের তত্ত্ব নাটক - শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়

৮। রবীন্দ্রজীবনী - প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

৯। বাংলা নাটকের ইতিহাস - অজিতকুমার ঘোষ।

১০। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খন্ড, রবীন্দ্রনাথ - সুকুমার সেন।

প্রশ্নাবলী :

১। 'রক্তকরবী' নাটকের নামকরণের সার্থকতা বিচার কর।

২। রূপক বা সাংকেতিক নাটক হিসাবে 'রক্তকরবীর' সার্থকতা বিচার কর।

৩। 'রক্তকরবী'কে প্রতিবাদের নাটক বলা কতদূর সঙ্গত ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দাও।

৪। 'রক্তকরবী' নাটকে গানের প্রয়োগ কতখানি যুক্তিযুক্ত বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দাও।

৫। রক্তকরবী নাটকের নন্দিনী চরিত্রের সার্থকতা বিচার কর।

৬। রক্তকরবী নাটকের রাজা ও রঞ্জন চরিত্রদুটি ব্যাখ্যা কর।

৭। রক্তকরবী নাটকের সংলাপ কতদূর সার্থক হয়েছে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দাও।

৮। রক্তকরবী নাটকে বিশুপাগল চরিত্রটির উপযোগিতা বুঝিয়ে দাও।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

তৃতীয় একক

উপন্যাস : যোগাযোগ

ভূমিকা :

টিপ্পনী

রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকা নিয়ে অনেক সশ্রদ্ধ কথা বলেছেন। নানা সুযোগে তাঁর উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করেছেন, বিবিধ মন্তব্যও করেছেন।বাংলা উপন্যাসে বঙ্কিমের স্থান যে কতখানি মহিমার সে বিষয়ে তাঁর সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। উপন্যাসে এত বড় মাপের প্রতিদ্বন্দ্বীর সামনে তাঁকে দাঁড়াতে হবে, নিজস্ব স্বতন্ত্র ও নতুন জগৎ তৈরি করতে হবে এ বিষয়ে বউঠাকুরানির হাট লিখতে লিখতেই তিনি সচেতন হন এবং বইটি শেষ করে, এর ব্যর্থতা সত্ত্বেও তিনি তৎপর হয়ে ওঠেন।

কাব্যের ক্ষেত্রে এতটা ভাবনা তাঁর ছিল না। ছোটবেলায় তিনি মধুসূদনের শক্তিকে অস্বীকার করতে চাইতেন। একটু পরিণত হয়ে বুঝলেন তার বিশেষ প্রয়োজন নেই। কারণ মহাকাব্য আখ্যানকাব্য থেকে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের কবিতা তিনি সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু উপন্যাসে পথ জুড়ে বসে আছেন খুব বড় মাপের যে -লেখক তাঁর সম্পর্কে চোখ বুজে থাকা চলবে না। ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তিনি নিশ্চিন্ত। কারণ তাঁর হাতেই ছোটগল্পের জন্ম ও সিদ্ধি। কিন্তু উপন্যাসে কি ঐতিহাসিক, কি সামাজিক দুদিকেই বঙ্কিমের অভ্রভেদী অবস্থান। তাঁকে অতিক্রম করা যাবে না, আর রবীন্দ্রনাথ কিছুতেই কারোরই উপগ্রহ হয়ে থাকার পাত্র নন। তাঁকে খুঁজে পেতে হবে অন্য কোনো পথ।

রবীন্দ্রনাথের তেরোটি উপন্যাসকে প্রকাশের সময় ধরে পাঁচটি স্তরে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে -

প্রথম স্তর : ১৮৭৭ - ৭৮

(১) করুণা - ১৮৭৭ - ৭৮

দ্বিতীয় স্তর : ১৮৮৩ - ৮৭

(২) বউঠাকুরানির হাট - ১৮৮৩

(৩) রাজর্ষি - ১৮৮৭

তৃতীয় স্তর : ১৯০৩ - ১০

টিপ্পনী

(৪) চোখের বালি - ১৯০৩

(৫) নৌকাডুবি - ১৯০৬

(৬) গোরা - ১৯১০

চতুর্থ স্তর : ১৯১৬ - ২৯

(৭) চতুরঙ্গ - ১৯১৬

(৮) ঘরে বাইরে - ১৯১৬

(৯) যোগাযোগ - ১৯২৯

(১০) শেষের কবিতা - ১৯২৯

পঞ্চম স্তর : ১৯৩৩ -৩৪

(১১) দুই বোন - ১৯৩৩

(১২) মালঞ্চ - ১৯৩৩

(১৩) চার অধ্যায় - ১৯৩৪

সাহিত্যের ধারণায় রবীন্দ্রনাথ পূর্ণতাবাদী বিষয় ও রূপের অর্থনারীশ্বরযোগে যে শেষ পর্যন্ত সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ রূপ গড়া সম্ভব, এটা তিনি বিশ্বাস করতেন। উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে মানুষের ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক তাৎপর্য সন্ধান তাঁর অন্বিষ্ট । কিন্তু জীবনের গভীর দর্শন ভাবনাকে গুরুত্ব দিলেও আঙ্গিকের দিকটিকে তিনি কখনো উপেক্ষা করেন নি এবং তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করেছেন বারবার । সময় ও চেতনার নিরন্তন পালাবদলের সেই সাক্ষ্য বহন করে তাঁর সমগ্র সাহিত্য জীবনে রচিত তেরোটি উপন্যাস । তিনি বলেছেন সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে কাহিনী গঠন সুষমায়' এবং 'পরিমিত সুসামঞ্জস্যে' । রূপগত উৎকর্ষের দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি আরও বলেছেন 'রসসাহিত্যে বিষয়টা উপাদান' তার রূপটাই চরম । অল্প বয়সে লেখা 'করুণা'য় প্রথম সলতে পাকাবার আয়োজন । তারপর ইতিহাসাশ্রিত দুটি উপন্যাস 'বউঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষিতে' বঙ্কিম প্রভাবিত বৃত্তে পরিক্রমণ । মাঝখানে বেশ খানিকটা সময়ের বিরতির পর বিশ শতকের সূচনায় এসে তাঁর 'চোখের বালি' আঁতের কথা বের করে আনার আয়োজনে আঙ্গিক গঠনের দিক থেকেও প্রথম তাঁর আত্মস্বাতন্ত্র্যের পরিচয় লাভ করল । 'নৌকাডুবি'তে সাময়িকভাবে রোমাঞ্চকর ঘটনার প্রতি কিছুটা ঝোঁক দেখালেও এরপর একে একে 'গোরা' থেকে 'চারঅধ্যায়' রবীন্দ্র প্রতিভার চলমানতার নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। বঙ্কিম -যুগের সঙ্গে বাংলা কথাসাহিত্যের বন্ধন ছিন্ন হয়েছে তাঁর হাতেই।

বঙ্কিমচন্দ্র নিটোল আখ্যান ও বৈচিত্রপূর্ণ চরিত্রকে সমগ্রন্থি বন্ধনে এবং সমমূল্যে বাধতে চেয়েছিলেন এবং সংযোজন ঘটিয়েছিলেন নাটকীয়তার। রবীন্দ্রনাধ তাঁর উপন্যাসের আখ্যানভাগে বাইরে থেকে কোন চমক সৃষ্টি করতে আগ্রহী হলেন না, ঘটনার ঘনঘটায় পাঠককে অবিরাম নাড়া দিলেন না, নাটকীয়তাকে প্রাধান্য দিলেন না। এডউইন ম্যুর কথিত Novel of action, Novel of character Dramatic Novel কোন কিছুরই নির্ধারিত সংজ্ঞায় বাঁধা গেল না তাঁর উপন্যাসকে। তিনি চাইলেন দেশকালের পটভূমিকে স্মরণ রেখেই ব্যক্তির গূঢ় সত্তার উদ্ভাসন। ব্যক্তিত্বের ক্রম উন্মোচনের ক্ষেত্রে উপন্যাসের পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত কিছু উপকরণকে তিনি ব্যবহার করছেন।

টিপ্পনী

ঘরে বাইরে (১৯১৬) -র তেরো বছর পরে যোগাযোগ (১৯২৯)প্রকাশিত হয়। স্বভাবতই এখান থেকে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসে আর এক নতুন যুগের সূচনা - এরকম একটা ধারণা হতে পারে। কিন্তু বাস্তবত সে রকম ঘটেনি। যদিও এই বই নানা দিকে আগের বই থেকে পৃথক। তবুও চতুরঙ্গ, ঘরেবাইরে, যোগাযোগ, শেষের কবিতা, - এই চারটি নভেলকে একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। সময়ের বিচারে এই পর্যায়ের বই চারটি ১৯১৬ এবং ১৯২৯ এই দুই বছরে প্রকাশিত দুটি দুটি করে উপন্যাসের সমবায়ে গড়ে উঠেছে। মাঝখানে তেরো বছরের দীর্ঘ ব্যবধান। চারটি নভেল চার রকম। তবে ভাষারীতিতে মিল আছে। দৃষ্টিকোণের দিক থেকে যোগাযোগ প্রধাণত সাপেক্ষ রীতির, কিছু নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণের মিশ্রণ আছে। তবুও এই উপন্যাস অনেকটা চোখের বালি গোরার মতো আদ্যন্ত ক্রমানুগ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির। গোরা থেকেই রবীন্দ্রনাথ মানুষের ব্যক্তিগত সম্পর্ককে পরিবার - জীবনের চৌহদ্দির বাইরে সমাজের বিস্তৃত ভূমিতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। যোগাযোগ লেখকের নতুন পরীক্ষা। এই একটি উপন্যাসেই রবীন্দ্রনাথের সমাজবাস্তবতা সরাসরি শিকড়ের খোঁজ করেছে - অর্থনৈতিক শ্রেণীবিন্যাসের স্তর পর্যন্ত সাহসী সন্ধান, তাতে বিষ বা অমৃত যাই উঠুক না কেন। ভাবুক পাঠক অবশ্য তাঁর তৈরি অনেক মানুষের ব্যক্তিত্বের গোড়ায় শ্রেণীচিহ্ন পাবেন - এবং লেখকের আগ্রহ ও প্রীতির কেন্দ্রও। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে তা পুরোপুরি ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্যে সমর্পিত, এখানে সামাজিক সত্যের নিজস্ব চেহারা অনেক বেশি প্রত্যক্ষ।

মধুসূদন - কুমুদিনীর দাম্পত্য জীবন, তাদের জটিল মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এই নভেলের কেন্দ্রে। বিপ্রদাস তার আদর্শাদ আভিজাত্য প্রভৃতি নিয়ে কুমুর ব্যক্তিত্ব গঠনে সাহায্য করেছে। মধূসুদন - বিপ্রদাস, মধূসূদন-শ্যামা এইসব সম্পর্ক এবং মতির মা ও নবীনের ভূমিকা মূল পাত্রপাত্রীর জীবন ও মনের জট পাকানো, খোলা, খোলার চেষ্টা প্রভৃতি কাজ করেছে। অনেকে মনে করেন, উপন্যাসের শেষে কুমুর মাতৃত্বের জন্য আপনার তীক্ষ্ণ স্বাতন্ত্র্য সংবরণ বা বর্জন করে আত্মসমর্পনে পূর্ণতা

টিপ্পনী

পেয়েছে। সেক্ষেত্রেও দেখা দরকার বিষয়টা কতটা মনস্তাত্ত্বিক, কতটা আরোপিত এবং লেখকের সমাজবোধের কোন্ দিক তার মধ্যে প্রতিফলিত। এই দুটি প্রসঙ্গে সমাজ পটভূমির দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তাকাতে হবে। এটিই তাঁর একমাত্র উপন্যাস যেখানে অর্থনৈতিক শ্রেণীবিন্যাস তথা শ্রেণীদ্বন্দ্বের পটভূমি জীবন্ত ; এবং মুখ্য তিন নরনারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মধ্যেও তার প্রবেশ ঘটেছে। এ উপন্যাসে অর্থনীতির ভিতটা জরুরী - যেমন কেন্দ্রীয় সমস্যা ও মানুষগুলির জন্য, তেমনি দরকারি লেখকের মনের দিগন্ত চেনার কাজে।

যোগাযোগ উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করেন 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ১৯২৭ সালে, ঘরে বাইরে বই হয়ে ছেপে বের হওয়ার এগারো বছর পর। একবছর সাত মাস ধরে বেরিয়ে বই হয়ে যোগাযোগ প্রকাশিত হয় ১৯২৯ সালে। এতদিন পর উপন্যাস লিখতে গিয়ে মনের ভেতর থেকে কি ধরনের আগ্রহ অনুভব করেছিলেন সে তথ্য আমাদের কাছে নেই , শুধু অনুমান করা সম্ভব।

প্রথমত গোরা থেকে আরম্ভ করে করে সব উপন্যাসে সমাজে বৃহৎ পটভূমি তিনি ব্যবহার করেছেন, নানা দিকেই তাঁর দৃষ্টি পড়েছে। কয়েক বছর আগেই সদ্যাগত রাজনৈতিক আন্দোলনের ব্যপকতার ভিত্তিতে তিনি গল্প দাঁড় করিয়েছিলেন। এবারে তিনি এদেশের শিল্প ও পুঁজিপতি শ্রেণীর বিকাশকে আশ্রয় করতে চাইলেন। কোনো বৃহৎ আলোড়নের রূপ ধরে দেখা না দিলেও এই ব্যাপারটা যে দীর্ঘকাল ধরে বঙ্গসমাজে একটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ প্রসঙ্গ, রবীন্দ্রনাথের মতো অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন শিল্পীর পক্ষে তা অনুধাবন করা সম্ভব হয়েছিল। ১৯২৯সালে বিশ্ববাপী মন্দা দেখা দিয়েছিল। দু-তিন বছর আগে থেকে তার পূর্বাভাস অনুভব করা যাচ্ছিল। ইংলন্ডের উপনিবেশ হিসেবে তার দুঃখ এদেশবাসীকেও ভোগ করতে হয়েছিল। সামাজিক-অর্থনৈতিক ভাবনা কি এরই প্রতিক্রিয়ায় রবীন্দ্রমননে ধরা পড়ল ?

দ্বিতীয়ত ১৯২৩ থেকে বেশ কয়েক বছর 'কল্লোল' পত্রিকা বাংলা সাহিত্যে একটা আলোড়ন তুলে ছিল। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ঐ পত্রিকাগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ আক্রমণের বিষয়। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনায় এ সম্বন্ধে তাঁর মনোভাবের কিছু প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। কুমু চরিত্রের পরিকল্পনায় এ ধরনের ব্যাপার থাকা অসম্ভব নয়। কুমুতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যে বৈশিষ্ট্য তা প্রেমকে আশ্রয় করে মুক্তি খোঁজে নি। নারী নারীত্বেই স্বাধীন প্রতিষ্ঠা চেয়েছে। এটা একেবারে নতুন চেতনা, একেবারে বিংশ শতাব্দীর। কল্লোলের কথাসাহিত্যকে কন্টিনেন্টাল উপন্যাসের নকল করে এই স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তি দেখেছেন যৌনতায়। রবীন্দ্রনাথ তার উত্তর দিতে চাইলেন কুমুদিনীতে। অবশ্য শুধু কল্লোলের উত্তর দেবার তাগিদে এই চরিত্র ভাবনা নয়। তিনি বিনোদিনী - দামিনী - বিমলায় নারীচিত্তের স্বাতন্ত্র্যের যে সব সন্ধান করেছেন তা থেকে একেবারে অন্য কিছু

ধরতে চেয়েছেন এইবার। সঙ্গে কল্লোলপন্থীদের একটু জবাব দেওয়া হল।

যোগাযোগ প্রকাশিত হচ্ছে ১৯২৭ এ বিচিত্রা পত্রিকায়। কাহিনীর শুরু এভাবে - "আজ ৭ই আষাঢ়। অবিনাশ ঘোষালের জন্মদিন। বয়স হল বত্রিশ।' 'তিনপুরুষের কাহিনীর সম্ভাব্য বিস্তার থেকে 'যোগাযোগ' কে দুই পুরুষের কাহিনীতে নামিয়ে এনে রবীন্দ্রনাথ প্রথম পুরুষের আখ্যানকে স্থাপন করেছিলেন ইতিহাসের পটভূমিতে - অঈত উদ্ভাসনের পদ্ধতিতে।তাঁর মুখ্য মনোযোগ দ্বিতীয় পুরুষের কাহিনীতে নিবদ্ধ। সেখানে আছে দুটি জমিদার পরিবারের সমান্তরাল বৃত্তান্ত, একদা সম্পন্ন এবং ঘোষাল পরিবারের সঙ্গে বারবার প্রতিযোগিতায় জিতে যাওয়া চাটুজ্যে পরিবার আপাতত পূর্বপুরুষের দেনার দায়ে আর্থিক অবক্ষয়ের চূড়ান্ত সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে।

লেখক শুরুতেই জানিয়ে দিতে চেয়েছেন, মধুসূদন - কুমুদিনীর যে গল্প নিয়ে উপন্যাস তা ১৮৯৪ - ৯৫ সালের। মধুসূদনের বড় হয়ে ওঠা ঘটেছে অন্তত বছর পনের ধরে। সেই উন্নতির যে -ইতিহাস লেখক বলেছেন তাতে সময় কিছু লাগবার কথা। তাহলে অর্থনৈতিক পটভূমি ১৮৮০ থেকে ১৮৯৫ পর্যন্ত বিস্তৃত বলে মনে করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতি খুঁজে যে সময়টা ধরেছেন তাতে ভুল কিছু নেই । ঔপনিবেশিক শাসনের পাকে জড়ানো বঙ্গদেশে পুঁজিবাদ বিকাশের স্বাভাবিক সুযোগ ছিল না। ইংরেজ বণিকদের প্রয়োজনে তাদের অনুগামী সহযোগী হিসাবে বাঙালি ব্যবসায়ী শ্রেণীর দ্বিধাকম্পিত আবির্ভাব উনিশ শতকের মধ্যভাগে। বাণিজ্যিক পুঁজিবাদী বলে এদের উল্লেখ করা যেতে পারে। সমগ্রত দেশের সমাজ জীবনে এই নতুন ভূমিকা খুব বড় হয়ে ওঠে নি। আর সেটা সম্ভবও ছিল না।

ইংরেজ উপনিবেশ ব্যবস্থার সতর্ক কব্জা খুবই দৃঢ় ছিল। অন্যদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদারদের অনেকের আর্থিক অবস্থানে ফাটল ধরেছিল এই শতকের শেষ ভাগে। কিন্তু কিছু পুরনো বনেদি বংশে বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল। সময় এগিয়ে চলল। বাংলায় পুঁজিবাদের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটল না - সঙ্গে সঙ্গে কিছু বিকাশ তো ঘটল কয়লাখনি ও চটকলের ক্ষেত্রে, কলকাতার যন্ত্রশিল্পে। ব্রিটিশ শাসক কিন্তু জমিদারতন্ত্রকে জিইয়ে রাখল । সামগ্রিক সামাজিক প্রাধান্যের ক্ষেত্রে না হলেও সীমাবদ্ধ ছোটখাটো ব্যাপারে এই দুই ব্যবস্থার বিরোধ যে দেখা দিল না, তা নয়।

১৯২৭ -২৮ সালে বাঙালির অর্থনৈতিক দুর্দশা খুব বেড়ে গিয়েছিল। শিক্ষার প্রসার হওয়ার শিক্ষিত বেকার বাড়ছিল । বিহার ওড়িশা প্রভৃতি ভিন্ন প্রদেশ হয়ে যাওয়ায় সেখানে চাকরির সুযোগ কমে এল । স্বদেশী আন্দোলন - বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য সরকারী পৃষ্ঠপোষকতাও কমে গেল । মন্টেগু - চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার যেমন বাঙালির আর্থিক অসুবিধা ঘটিয়েছিল তেমনি আসন্ন আন্তর্জাতিক মন্দার প্রভাবও জাতিকে সমস্যায় ফেলল। রবীন্দ্রনাথ কি এই বিরূপ পরিস্থিতিতে এক

টিপ্পনী

টিপ্পনী

সফল বাঙালি ব্যবসায়ীর উত্থানের কাহিনী শোনাতে চাইলেন ? হয়তো সূচনায় এ রকম একটা ভাবনার বীজ তাঁর মনে ছিল। কাহিনী এগোতে তাতে নানা জটিল সূত্র এসে গাঁট বাঁধতে থাকে।

মধুসূদন - কুমুদিনীর দাম্পত্য জীবনের আরম্ভ বিশের (২০) অধ্যায়ে। তার আগে উপন্যাসের মোট ৫৬টি অধ্যায়ের মধ্যে ১৯টি অধ্যায়ে, রচনার একপঞ্চমাংশের কিছু বেশি জায়গা জুড়ে অন্য কাহিনী স্থান পেয়েছে। যেমন - চাটুজ্জে ও ঘোষাল বংশে বিবাদের এবং ঘোষালদের পতনের পুরনো কাহিনী। ঘোষাল পরিবারের সাম্প্রতিক তুচ্ছতা ও দারিদ্র্যের মধ্যে থেকে একক স্বাতন্ত্র্যে বণিক মধুসূদনের অভ্রভেদী আবির্ভাব। সংক্ষেপে এবং দ্রুতগতিতে বলা তাৎপর্যপূর্ণ সে-বিবরণ। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রায় প্রতিটি বাক্য শুধু মধুসূদনের ব্যক্তিগত উত্থানের পরম্পরা নয়, বাঙালি বুর্জোয়া শ্রেণীর আবির্ভাবের পদক্ষেপ।

মধুসূদনের ভাইরা গোমস্তাগিরিতে বসে গিয়েছিল। সে ছিল ভালো ছাত্র, কলেজের নাম রাখার মতো। কেরানি, স্কুলমাস্টার, মোক্তার বা উকিল হয়ে ভদ্রশ্রেণীতে ঠাঁই পাবার তার সম্ভাবনা ছিল। মধুসূদন সেসব অনায়াসে বাতিল করে দিল। পাঠ্য বইগুলি বিক্রি করা দিয়ে ব্যবসায়ের সূচনা প্রায় প্রতীকী ঘটনা। চাকরির নিশ্চয়তা, লেখাপড়ার ভদ্রতা কোনো ফাঁদে তাকে ধরা গেল না। জাহাজের ধ্বংসাবশেষ থেকে জন্ম হয়েছিল রবিনসন ক্রুশোর। ইংরেজি উপন্যাসের প্রথম ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে দীপ্ত এক উপনিবেশবাদীর। বাংলা উপন্যাসের বুর্জোয়া মনের অনেক ব্যক্তি বঙ্কিমের হাতে আবির্ভূত হয়েছিল, কিন্তু এই প্রথম দেখলাম বাস্তব সমাজে পা ঢুকিয়ে দাঁড়ানো এক পুরোদস্তুর বণিক - পুঁজিপতিকে।

মধুসূদনের প্রসঙ্গে লেখকের পর্যবেক্ষণ কত তীক্ষ্ণ ও অবিচল তার নিদর্শন দেওয়া যেতে পারে -

(১) ছাত্রমহলে সেকেন্ড -হ্যান্ড বই বিক্রি করে ব্যবসা হল শুরু।

(২) তার প্রধান ছাত্রবন্ধু কানাই গুপ্ত। ..... বাপ নামজাদা কেরোসিন কোম্পানীর আপিসে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। ..... তিনি কেজো মানুষ চেনেন, বুঝলেন এ ছেলের উন্নতি হবে। নিজের থেকে টাকা ডিপোজিট দিয়ে রজবপুরে কেরোসিনের এজেন্সিতে বসিয়ে দিলেন।

(৩) 'সৌভাগ্যের দৌড় শুরু হল ; সেই যাত্রাপথে কেরোসিনের ডিপো কোন্ প্রান্তে বিন্দু আকারে পিছিয়ে পড়ল। জমার ঘরে মোটা মোটা অঙ্কের উপরে পা ফেলতে ফেলতে ব্যবসা হু হু করে এগোল গলি থেকে সদর রাস্তায়, খুচরো থেকে পাইকিরিতে, দোকান থেকে আপিসে, উদযোগ পর্ব থেকে স্বর্গারোহণে। সবাই

বললে, 'একেই বলে কপাল।' ..... মধুসূদন নিজে জানত যে তাকে ঠকাবার জন্য অদৃষ্টের ত্রুটি ছিল না, কেবল হিসেবে ভুল করেনি বলেই জীবনের অঙ্ক ফলে পরীক্ষকের কাটা দাগ পড়েনি।

(৪) 'মধুসূদনের সতর্কতায় রজবপুরের পাটের নাম দাঁড়িয়ে গেল। হঠাৎ মধুসূদন সর্বপ্রথমেই নদীর পোড়ো জমি বেবাক কিনে ফেললে, তখন দর সস্তা, ইঁতের পাঁজা পোড়ালে বিস্তর, নেপাল থেকে বড় বড় শালকাঠ, সিলেট থেকে চুন, কলকাতা থেকে মালগাড়ি বোঝাই করোগেটেড লোহা। ..... দেখতে দেখতে রজবপুরের ব্যবসার একটা আওড় লাগল। তার ঘূর্ণিটানে দালালরা এসে জুটল, এল মাড়োয়ারির দল, কুলির আমদানি হল, কল বসল, চিমনি থেকে কুন্ডলায়িত ধুমকেতু আকাশে আকাশে কালিমা বিস্তার করলে।

(৫) আরও কিছু কাল যায়। উন্নতির জোয়ার বেয়ে কারবারের আপিস মফস্বল থেকে কলকাতায় উঠল। ঘোষাল কোম্পানির আজ দেশ বিদেশে ওদের ব্যবসা বনেদি বিলিতি কোম্পানির গা ঘেঁষে চলে ; বিভাগে বিভাগে ইংরেজ ম্যানেজার। লক্ষ্য করবার বিষয়, বণিক-ব্যবসায়ীর শ্রমশোষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গটির উল্লেখ নেই।

নায়িকা কুমুদিনীর পরিচয় দিতে গিয়ে প্রয়াত পিতা মুকুন্দলাল এবং জ্যেষ্ঠ বিপ্রদাসের মধ্য দিয়ে এক পুরনো জমিদার বংশের সাম্প্রতিক দুই পুরুষের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সংক্ষিপ্ত বর্ণনার অভ্রান্ত তর্জনী জমিদারী ভাবকায়দায় আর চরিত্রের মূল রূপটি ধরে দিচ্ছে। দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে -

(১) ..... সুকুমার শরীরে (মুকুন্দলালের) শ্রমের চিহ্ন নেই। পরনে চুনটকরা ফুরফুরে মসলিনের জামা, ফরাসডাঙা বা ঢাকাই ধুতির বহুযত্ন বিন্যস্ত কোঁচা ভুলুণ্ঠিত, কর্তার আসন্ন বাতাস ইস্তাম্বুল আতরের সুগন্ধ বার্তা বহন করে। পানের সোনার বাটা হাতে খানসামা পশ্চাদবর্তী, দ্বারের কাছে সর্বদা হাজির তকমা পরা আরদালি।

(২) বাড়ির আর এক মহলে বিলিতি বৈঠকখানা, সেখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর আসবাব। সামনেই কালো দাগ ধরা বাতিদান, তলায় টেবিল, সোনার জলে চিত্রিত কালো পাথরের ঘড়ি, আর কতকগুলো বিলিতি কাঁচের পুতুল।..... বিশেষ ক্রিয়াকর্মে জিলার সাহেব-সুবাদের নিমন্ত্রণোপলক্ষে এই ঘরের অবগুণ্ঠন মোচন হয়।

(৩) পুরাতন কালের ধনবাদের প্রথামত মুকুন্দলালের জীবনে দুই-মহলা। একপাশে গার্হস্থ্য, আর এক মহলে ইয়ারকি, অর্থাৎ এক মহলে দশকর্ম আর এক মহলে একাদশ অকর্ম। ঘরে আছেন ইষ্টদেবতা আর ঘরের গৃহিনী। সেখানে পূজা-

টিপ্পনী

টিপ্পনী

অর্চনা, অতিথি-সেবা, পালাপার্বন, ব্রত-উপবাস, কাঙালিবিদায়, ব্রাহ্মণ -ভোজন, পাড়াপড়শি, গুরু-পুরোহিত, ইয়ারমহল গৃহসীমার বাইরেই, সেখানে নবাবী আমল, মজলিসি সমারোহে সরগরম । এইখানে আনাগোনা চলত গৃহের পরত্যন্ত পুরবাসিণিদের।

জমিদারতন্ত্রের অনেক কথাই বলা হল ; নেই প্রজাপীড়ন, প্রজাশোষনের ইঙ্গিতও।

তিন-এর অধ্যায়ের শুরুতে চাটুজ্জেদের জমিদারির পড়ন্ত অবস্থার যে বিশ্লেষণ তার সঙ্গে দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ দিককার মধুসূদনের ব্যবসার উজ্জ্বল বিবরণের তীক্ষ্ণ বৈপরীত্য সচেতনভাবে পাঠকের চোখের সামনে মেলে ধরেছেন লেখক।

কুমুদিনী মধুসূদনের বিয়ের প্রস্তুতি এবং উৎসব - অনুষ্ঠানের বিস্তৃত আলোচনা অনেকটা স্থান জুড়ে আছে । একদিকে বর্তমান জমিদার বিপ্রদাস অন্যদিকে মধুসূদন। তাদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে লেখক দুই তন্ত্রের রুচি, অহমিকা জীবনবোধের দ্বন্দ্বের ছবিই এঁকেছেন। উপন্যাসের এই প্রথম অংশটা যেন নায়ক - নায়িকার বংশ পরিচয়, সমাজ-পটভূমির বিবরণ দিয়ে, তাদের বিয়ের কাহিনী বলে 'মূল প্রসঙ্গ' তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক ও সমস্যার গোড়ায় এনে পাঠকদের দাঁড় করিয়েছেন, যেন সব কিছুই অপরিহার্য দ্বিধায় এসেছে, লেখক যেন গল্পের মুঠি শিথিল করতে চাননি। কিন্তু এটা দেখা গেল যে উক্ত 'মূল প্রসঙ্গ' সংশ্লিষ্ট প্রয়োজন ছাপিয়ে লেখা অনেকটা ছড়িয়ে পড়েছে। তার মধ্যে দিয়ে অর্থনৈতিক দুই ভিন্ন কোটির সামাজিক অবস্থান যথেষ্ট স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত - নিজ নিজ ভূমিতে পা রেখে মধুসূদন-কুমুদিনী সামনে বেরিয়ে এল ব্যক্তিমূর্তিতে।

মধুসুদন এবং কুমুদিনীর সম্পর্ক স্বামী স্ত্রীর হলেও কাহিনীর শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত জটিল এবং পরস্পর প্রতিবাদী থেকে গিয়েছে। তার কারণ এই দুটি মানুষের একান্ত স্বতন্ত্র চরিত্র ব্যক্তিত্ব তো বটেই, অনেকটা সামাজিক এবং শ্রেণীগতও । মধুসূদন প্রতিবার মানসিক বাধা ও আঘাতের সময়ে, স্ত্রীর সঙ্গে সংঘাতের প্রতিটি ঘটনার কুমুর পেছনে দেখতে পেয়েছে ব্যক্তিগতভাবে বিপ্রদাসকে এবং শ্রেণীগতভাবে নুরপুরের জমিদারতন্ত্রের ছায়া। ব্যক্তি মধুসূদনের আক্রমণ প্রায়ই মধুসুদন নামক পুঁজিবাদী শ্রেণীসংগ্রামে পরিণত হয়েছে । বিপর্যস্ত জমিদারী মেজাজের মিথ্যা দম্ভ ও নিঃসম্বল বনেদিয়ানার চাল ভেবে ক্রোধে মধুসূদন আঘাত করেছে কুমুকে - আসলে মেরেছে বিপ্রদাসকে, জয় করতে চেয়েছে জমিদার তন্ত্রকে । আবার ঘুরিয়েও দেখা যায় শ্রেণীস্বার্থে জমিদারী গর্বের ভগ্নস্তম্ভকে ধুলিসাৎ করতে গিয়ে সে প্রতিক্ষণ ভেঙেছে। কুমুকে - যে একমাত্র নারী তার মধ্যের পুরুষকে

জাগিয়েছিল। এই আত্মক্ষয়ী যুদ্ধে তার ট্র্যাজেডি, কিন্তু এর ভিতে ঐতিহাসিক নিয়তি কাজ করে চলেছে । এই শ্রেণী সংগ্রাম তাকে করতেই হবে পুরনো মৃতপ্রায় সমাজবিধান - ফিউডালতন্ত্রকে সম্পূর্ণ মুছে দিয়ে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠার স্বার্থে। যত বড় দাপুটে ও শক্তিমান বলে তাকে মনে হোক সে ইতিহাসের ক্রীড়নক বা নায়ক হিসেবে এ কাজ করতে বাধ্য।

টিপ্পনী

মধুসুদনকে কাহিনীকার পুরানো ঘোষাল বংশের সঙ্গে যুক্ত করে কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছেন তা ভেবে দেখার। ঘোষাল - চাটুজ্জেদের জমিদারী কোন্দলের জের হিসেবে মধু-কুমু-বিপ্রদাসের সংঘাতকে দেখাবার তাৎপর্য কোথায় ? আসলে অতীতের সে লড়াই তো বহুকাল ফুরিয়ে গিয়েছে। এখানে অন্য রূপে নতুন লড়াই শুরু। তাতে বাইরের লাঠিবাজি নেই। কিন্তু ভেতরে অবিরাম রক্তক্ষয়, যে পর্যন্ত শত্রুর শেষ না হয়। মধুসূদন সেই প্রাচীন ঘোষালদের বংশধর মাত্র, সত্যিই তাদের বংশধর কি? বাংলার সমাজ-ইতিহাসে মধুসূদন পিতৃহীন কোন বংশের সন্তান, নতুন বংশের পিতা। যে দারিদ্র্য তুচ্ছতা বাঁচার অকুলীন চেষ্টার মধ্য দিয়ে ঘোষালরা চলেছে তা এদেশের অগণিত মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্তের বিধিলিপি। মধুসুদনের ছোটভাই নবীনের রক্তে তো ঘোষাল বংশের সেই প্রতিহিংসার চিহ্ন ও নেই। কি মন্ত্রে মধুসূদন তা জিইয়ে রেখেছিল ? আসলে রাখেইনি। পয়সা করে পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি কেনা কিছু অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু চাটুজ্জে - বংশের সঙ্গে পুরনো হিসেব মেটানো যদি কাহিনীর অভিপ্রায় হত তাহলে যোগাযোগ অন্য উপন্যাস হত। যা রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন তার থেকে পৃথক কিছু। তবুই মেনে নিতে হবে, ঘোষালদের বংশধর মধুসুদন বড়লোক হয়ে পুরনো হারের শোধ তুলেছে, এই সূত্রটা লেখক গল্পের মধ্যে রেখে দিয়েছেন। সেটা লেখকের আমদানি করা। উপন্যাসটি তীক্ষ্ণ চোখে দেখলে স্পষ্ট হবে, জমিদার হয়ে বসে মধুসূদন লড়েনি বিপ্রদাসের সঙ্গে। সে তার শ্রেণীধর্মে অটল থেকেছে। মহাজন হয়ে বিপ্রদাসকে ঋণে বেঁধে, তার বোনকে বিয়ে করে সে চাটুজ্জে জমিদারদের সঙ্গে যুদ্ধে নেমেছে। ঘোষাল জমিদার হিসেবে নয়, ব্যবসায়ী মধুসূদন নুরপুরের বনেদিয়ানা একেবারে ধসিয়ে দিতে চেয়েছে । বংশগত প্রতিহিংসার ক্ষণস্থায়ী ভাবণা এনে লেখক আরও কম বলতে পারতেন । বেশি বলে নিজের অভিপ্রায়কে কেন্দ্রচ্যুত করেছেন, যদিও এক্ষেত্রে বিভ্রমের মাত্রা অল্পই।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
119

যোগাযোগ উপন্যাসের প্রারম্ভে দেখতে পাই মধুসূদন ঘোষালের পুত্র অবিনাশ ঘোষালের জন্মদিন, সেই সূত্রে বহু অভিনন্দনপত্র পেয়েছে। অবিনাশের বাবা ও মায়ের দাম্পত্য জীবন কিরকম বিরুদ্ধতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, উপন্যাসের তাই মূল কাহিনী। এই বিরুদ্ধতা চরমে পৌঁছল যখন অবিনাশের মা কুমু তার স্বামীর ঘর করতে যেতে সম্পূর্ণরূপে অনিচ্ছুক হল এবং স্বামীকে ফিরিয়ে দিল। কিন্তু দেখা গেল পরম বিতৃষ্ণার মধ্যে কুমু যে দুই চার দিন স্বামী সহবাস করেছিল, তারই ফলে

টিপ্পনী

তার নিজের অজ্ঞাতসারে সে গর্ভবতী হয়েছে। তার স্বামীকে সে ফিরিয়ে দিতে পারে ; কিন্ত তাদের উভয়ের সন্তানকে সে বঞ্চিত করবে কোন জোরে ? সুতরাং সে পুনরায় স্বামীর ঘর করতে গেল এবং উপন্যাসের এখানেই পরিসমাপ্তি। অবিনাশই এই গর্ভের সন্তান, না পরে কুমুর আর কোন সন্তান হয়েছিল, তা উপন্যাসে স্পষ্ট করে বলা হয় নি। তবে উপন্যাসের মূল কাহিনী ও পরিণতি থেকে সহজেই অনুমান হয় যে কবি দেখাতে চেয়েছেন সন্তানের শুভ অভ্যাগমে স্বামী ও স্ত্রীর বিরুদ্ধতা কিভাবে পরাহত হয়।

লেখকের প্রতিপাদ্য বিষয় যাই হোক না কেন আর্টের দিক থেকে উপন্যাসে ত্রুটি রয়ে গেছে। মধুসূদন ও কুমুদিনীর মধ্যে যে বিরুদ্ধতা জেগে উঠেছিল, সন্তান সম্ভাবনায় তা কিভাবে লোপ পেল তার ছবি উপন্যাসে অনুপুঙ্খ দেওয়া হয় নি। কুমুদিনীর শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার পরই উপন্যাসের যবনিকা টানা হয়েছে। সুতরাং যা উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয় বলে মনে হয় - তা উপন্যাসে স্থান পায় নি। হয়ত যে পরিণতির কথা নিয়ে কাহিনীর আরম্ভ ও শেষ হয়েছে তা লেখকের মূল বক্তব্য নয়। ঔপন্যাসিক কি করতে চেষ্টা করেন নি তার কথা ছেড়ে দিয়ে তিনি কি করতে চেষ্টা করেছেন তারই বিচার করা উচিত। উপন্যাসের জায়গা জুড়ে আছে - মধুসূদন ও কুমুর বিরুদ্ধতার কথা, কুমুর মনের বিতৃষ্ণা ও নারী হৃদয় জয় করবার জন্য রাজাবাহাদুরের অদ্ভুত প্রয়াস। হয়ত শুধু এটাই লেকের বর্ণনীয় বিষয়। কিন্তু এই বিতৃষ্ণাও মধুসুদনের বর্বর চেষ্টার বর্ণনায় শিল্পের ধর্ম কিছুটা হলেও ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে মনে হয়।

বর্তমান যুগের প্রচারমূলক সাহিত্যের বিরুদ্ধে একটা আপত্তি অনেক সময় তোলা হয়ে থাকে। তাকে বলা হয় - Packing the cards অর্থাৎ আজকালকার সাহিত্যিকগণ চরিত্রের ও আবেষ্টনের এমন সমাবেশ করে উপন্যাস ও নাটক শুরু করেন যে, খেলোয়াড়ের ইচ্ছামত দান পড়ে। আর্টের ধর্ম অন্যরকম। লেখক যে আবেষ্টন নিয়ে কাহিনী শুরু করেন ও যেভাবে কাহিনীর শেষ হয় তার মধ্যে খানিকটা বৈপরিত্য থাকা চাই - যা সম্ভব বলে মনে হয় না তা কি করে সম্ভব হল, এটা দেখানোই শিল্পীর কাজ। আর্টের ধর্ম অজ্ঞাত রহস্যের উদ্‌ঘাটন। এই ধর্ম এই উপন্যাসে রক্ষিত হয় নি। মধুসূদনকে যেন মনে হয় যান্ত্রিকতার দানব। সে যেন রক্তমাংসে গড়া মানুষ নয় - আত্মপ্রতিষ্ঠা ও লোভের প্রাণহীন প্রতীক। তার শুধু একটি পুরুষোচিত প্রবৃত্তি আছে - নারীর প্রতি আকর্ষণ। কিন্তু তাও যথাযথ নয়। মনে হয় লেখক যেন যন্ত্রের মধ্যে ঐ ক্ষুধা পুরে দিয়েছেন, তাকে দেখে 'রক্তকরবী'র রাজার কথা মনে হয় - সেই যান্ত্রিকতা, রমণীর প্রতি সেই আকর্ষণ। কিন্তু রক্তকরবীর রাজা একটা রূপক, আর মধুসূদন একজন ব্যক্তি, রূপক রচনায় যা গ্রাহ্য , সাধারণ উপন্যাসে তা চলে না। এই প্রকারের যন্ত্র - মানুষের প্রতি কুমুর বিতৃষ্ণা হবে, এটাই

স্বাভাবিক। আবার কুমুর চরিত্র এমন ভাবে আঁকা হয়েছে যে, যে-কোন সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধেই তার মন বিরূপ হতে পারত। সে চাইত তার স্বামী হবে দেবতার মত পবিত্র, কবিতার মত সুন্দর, সঙ্গীতের মত মধুর। এইরকম প্রিয়কে মীরাবাঈয়ের গানে পাওয়া যায়, সংসারে নয়। তাই মধুসূদন যখন নম্র হয়ে ধরা দিতে এসেছে তখনও কুমুর মনের বিতৃষ্ণা মানে নি। স্বামী-স্ত্রী চরিত্রের মৌলিক বিরুদ্ধতার সঙ্গে উভয় পরিবারের বংশানুক্রমিক কলহের কথা যোগ দিতে হবে - এর পরে এই কাহিনীতে কোন রহস্য, কোন বিচিত্রতা থাকে না। নতুন ঘটনার সঙ্গে চরিত্রে নব বিকাশ দেখা যায় না।

এই উপন্যাসের সে সব গৌণ চরিত্রের সৃষ্টি করা হয়েছে তাতেও শিল্প পুরোপুরি রক্ষিত হয় নি। শ্যামাসুন্দরী ও মধুসুদনের প্রণয়ের যে চিত্র দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে একটু স্থূল বিষয় আছে। এই কাহিনীর প্রয়োজনীয়তা আছে ; কারণ এসবই বিপ্রদাস ও কুমুর মনকে কঠিন করে দিয়েছিল। কিন্তু একে বিস্তৃত করে বলবার প্রয়োজন ছিল না, মুকুন্দলালের পতনে কথা যেমন আভাসে জানান হয়েচিল সেইরকম করলেও ক্ষতি ছিল না। বিস্তৃত বর্ণনার কোন বৈশিষ্ট্য বা মাধুর্য্য নেই। নবীন ও মোতির মার চরিত্রে কবি অতিরিক্ত মাধুর্য্য ঢেলে দিয়েছেন। কুমুর প্রতি তাদের বিশেষতঃ নবীনের যে প্রীতি ও শ্রদ্ধার চিত্র দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে আতিশয্য আছে। তারা যেন মধু পরিবেষণের কল। শেষের দিকে মোতির মা কুমুদিনীর স্বামী-বিতৃষ্ণায় বিরক্ত হয়েছে। এটা হিন্দু গৃহস্থ ঘরের বধূর পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু তার এই স্বাভাবিক বিরক্তি তার স্বামীর অস্বাভাবিক ভক্তির মধ্যে চাপা পড়ে গিয়েছে।

ব্যবসায়ী মধুসূদন স্ত্রীকে ভোগের বস্তু, ইচ্ছামতো প্রণয় বা উপহার বিলোবার পাত্রী বলে মনে করে। ব্যক্তি হিসেবে কুমুদিনীর স্বাতন্ত্র্য সে মানে না, তার কোনরূপ মর্যাদার স্বীকৃতি মধুসূদনের কাছে নেই। বুর্জোয়াসুলভ রোমান্টিক প্রণয়ের নায়ক সে নয়, যদিও বাংলা সাহিত্যের সে-ই প্রথম খাঁটি বুর্জেয়া। তার এই বৈশিষ্ট্যকে মধুসূদনের একান্ত ব্যক্তিগত স্বভাব বলে মনে করা যেতে পারে। যেমন নাকি বাইজি-বিলাসী হলেও জমিদার মুকুন্দলালের অতি গভীর পত্নীপ্রেমও অনেকটাই ব্যক্তিগত ব্যাপার ঠিক ফিউডাল শ্রেণী স্বভাব নয়। এক শ্রেণীভুক্ত প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগতভাবে একই স্বভাবের হতে হবে, এমন জিদ ছেলেমানুষি। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের যুক্তিতে অনেক ব্যাপকতর সামাজিক ইঙ্গিত এড়িয়ে যাবারও নয়।

ঔপনাসিক জমিদারের মনোভাব মার্জিত অভিজাত্য এবং ব্যবসায়ী স্বভাবে হঠাৎ ধনীর স্থূল বর্বরতা এঁকেছেন। শুদ্ধ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর বরাত দেওয়া এখানে আর সম্ভব হচ্ছে না। এর উৎসে লেখকের শ্রেণীবোধও কাজ করেছে। যোগাযোগে আমরা কি দেখেছি :

টিপ্পনী

টিপ্পনী

মধুসূদন	ব্যবসায়ী	স্ত্রীর প্রতি মনোভাবে রূঢ়, আক্রমণাত্মক । যেন তার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য নেই, সে ভোগের পাত্রী-দখলী বস্তু।	নিজ পরস্ত্রীর সঙ্গে কামসম্পর্ক মনস্তাত্ত্বিক হলেও সামাজিক দৃষ্টিতে গ্লানিকর।
মুকুন্দলাল	জমিদার	স্ত্রীর প্রতি গভীর প্রেম।	বাইজী সংস্পর্শে মামুলি ও প্রথানুগ।
বিপ্রদাস	জমিদার	অবিবাহিত	সাধু প্রকৃতির, নারী বিষয়ে উদার ও তার স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী

মধুসূদন অন্যের নিজস্ব সত্তা, কাজ বা ভাবনার স্বতন্ত্রতা স্বীকার করে না। স্বাধীনতা শুধু তার, অন্যকে শাসন ও শোষণ করার । যারা তার উপরে অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল কিংবা যাদের কোনো সামাজিক সম্পর্কের সুবাদে হাতের মুঠোয় পাওয়া গিয়েছে তাদের সকলকে পায়ের তলায় রাখার তার অবিরত চেষ্টা । বুর্জোয়া স্বাধীনতার বোধ তো এরকমই । সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হয় বুর্জোয়া স্বাধীনতার চেতনা এবং উদারনীতিবাদের জন্ম দিয়েছিল। মধুসূদনের স্বভাবে এর প্রথম দিকটি সত্য করে তোলায় ঔপন্যাসিকের সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার স্খলন নেই। কিন্তু মধুসূদনের আচরনে এমন কি বর্বরোচিত রূঢ়, পীড়নে স্বেচ্ছাচারী । ব্যতিক্রম সাহেবদের প্রতি তার অনুগত ভদ্রতা।

"- এই মধুসূদনকে কুমু তার দাদা আর অন্যান্য আত্মীয়দের সঙ্গে ব্যবহার করতে দেখেছে - আজ তাকেই দেখলে ইংরেজ বন্ধুমহলে। ভদ্রতায় অতি গদগদভাবে অবনম্র আর হাসির আপ্যায়নে মুখ নিয়তই বিকশিত । ..... ইংরেজদের অভিমুখে তার মাধুর্য পূর্ণচাঁদের আলোর মতোই যেমন উজ্জ্বল তেমনি স্নিগ্ধ।"

পাশাপাশি বিপ্রদাসের সকলের প্রতি ভদ্র সুন্দর আচরণ, দরিদ্রে দয়া, প্রজাপালনে হৃদয়বত্তা । কুমুদিনীর বিয়ে উপলক্ষে প্রজাদের সানন্দ সহযোগিতার উল্লেখ আছে।

বেনেভোলেন্ট জমিদার হলে এমনটা হতেই পারে। কিন্তু লেখকের নির্বাচন নিয়েই প্রশ্ন জাগবে। তিনি একজন দম্ভী স্বৈরাচারী ব্যবসায়ী এবং একজন সদাশয় প্রজাবৎসল জমিদারকে কাহিনীকেন্দ্রে মুখোমুখি রেখেছেন। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেণীর

মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ভালোবাসা এবং সমর্থনের তারতম্য এই বাছাইয়ের পেছনে কাজ করেছে।

যোগ্য লেখকের রূপের বর্ণনা চিত্র নয়, চরিত্র, যোগাযোগে তিনটি পুরুষ - চরিত্রের ছবি আছে।

(১) জমিদার মুকুন্দলাল :

দীর্ঘ তাঁর গৌরবর্ণ দেহ, বারবি কাটা চুল, বড়োবড়ো টানা চোখে অপ্রতিহত প্রভুত্বের দৃষ্টি। ..... সুকুমার শরীরে শ্রমের চিহ্ন নেই।

(২) জমিদার বিপ্রদাস :

আহা কি সুপুরুষ। এমন কখনও চোখেও দেখে নি। ওই যে গান শুনেছিলাম কীর্তনে - গোরার রূপে লাগল রসের বান

ভাসিবে নিয়ে যায় নদীয়ার পুরনগরীর প্রাণ

আমার তাই মনে পড়ল।

(৩) ব্যবসায়ী মধুসুদন :

মধুসূদন দেখতে কুশ্রী নয় কিন্তু বড় কঠিন। কালো মুখের মধ্যে প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে সে হচ্ছে পাখির চঞ্চুর মতো মস্ত বড়ো বাঁকা নাক, ঠোঁটের সামনে পর্যন্ত ঝুঁকে পড়ে যেন পাহারা দিচ্ছে। বেঁটে, মাথায় প্রায় কুমুদিনীর সমান। হাতদুটো রোমশ ও দেহের তুলনায় খাটো, সবশুদ্ধ মনে হয় মানুষটা একেবারে নিরেট; মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বদাই কী একটা প্রতিজ্ঞা যেন গুলি পাকিয়ে আছে।

এখানে একটু লক্ষ্য করলে বর্ণনাকারীর মনোভাব পাঠ করা যায়। বিপ্রদাস বিষয়ে সশ্রদ্ধ মুগ্ধতা, মুকুন্দলাল সম্পর্কে সম্ভ্রম এবং মধুসূদনের প্রতি বিরূপকটাক্ষ। জমিদারী আভিজাত্য পিতা-পুত্রে-দুই পুরুষের কান্তিতে সমান উজ্জ্বল যাদের তুলনায় মধুসূদনের নিরেট রোমশতা পাঠককে অপ্রসন্ন করে তুলবেই।

যোগাযোগ (১৯২৯) যখন 'বিচিত্রা' পত্রিকায় (আশ্বিন ১৩৩৪ থেকে চৈত্র ১৩৩৫) প্রকাশিত হতে শুরু হয় তখন নাম ছিল 'তিনপুরুষ'। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল কাহিনী সূত্র তৃতীয় পুরুষ অবধি টানবেন। কিন্তু গল্প লেখবার পরে সে ইচ্ছা রইল না। যে অবিনাশ ঘোষালের তিরিশ বছরের জন্মদিনের কথা নিয়ে উপন্যাসের আরম্ভ হয়েছিল তার জন্মের ইশারা করেই তিনি কাহিনী শেষ করে দিলেন। দুই তিন সংখ্যায় বের হওয়ার পর প্রধানত এই কারণে রবীন্দ্রনাথ বইটির নাম পাল্টেছিলেন। যোগাযোগের ভূমিকায় এই নাম পরিবর্তন উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ কিছু মূল্যবান কথা

টিপ্পনী

বলেছেন। -

"গল্প জিনিষটা রূপ ; ইংরাজিতে যাকে বলে ক্রিয়েশন্ ! আমি তাই বলি গল্পের এমন নাম দেওয়া উচিত নয় যেটা সংজ্ঞা, অর্থাৎ যেটাতে রূপের চেয়ে বস্তুটাই নির্দিষ্ট। 'বিষবৃক্ষ' নামটাতে আমি আপত্তি করি। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' নামে দোষ নেই। কেন না ও নামে গল্পকের কোন ব্যাখ্যাই করা হয় নি।"

টিপ্পনী

যোগাযোগ উপন্যাসটির অধিকাংশ লেখা হয়েছিল বাঙ্গালোরে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের বাড়িতে। বাড়িটির নাম ছিল ব্যালাব্রুয়ি।

আমাদের দেশে যে বিবাহপ্রথা আছে তাতে স্বামী - স্ত্রীর অন্তরের মিল দৈবাধীন ঘটনা। তবুও স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে সচরাচর কোন দুর্ঘটনা দেখা যায় না তার একমাত্র কারণ এই যে উভয় পক্ষে, অন্তত স্ত্রীর পক্ষে, কোনরূপ পূর্বসংস্কার বাধা দেয় না। আগেকার দিনে মেয়েদের খুব অল্পবয়সেই বিবাহ হত, সুতরাং তাদের দাম্পত্য সংস্কার বিবাহের পরে শ্বশুরবাড়ীর আবহাওয়ায় অভ্যাস রূপে গড়ে উঠত। অতএব সেখানে স্বামী -স্ত্রীর পরস্পর সম্পর্কে মসৃণতাহানির সম্ভবনা কম ছিল। কিন্তু বেশি বয়সে বিবাহ হলে মেয়েদের মনে, পিতৃগৃহের স্নেহছায়ায় থেকে, গার্হস্থ্য সংস্কারের ধারণা দৃঢ়বদ্ধ হবার সম্ভবনা বেশি হয়। এই ধরনের কোন কোন মেয়ের পক্ষে স্বামীর সঙ্গে মনের মিল হওয়া সম্ভব এবং তা না হলে, অর্থাৎ তার সংস্কারের সঙ্গে স্বামীর সংস্কারের বিরোধ ঘটলে, সংসারে ট্র্যাজেডি ঘনায়, এরকম ট্র্যাজেডি হয়তো শুধু অন্তরেই আবদ্ধ থাকে, বাইরের ঝগড়াঝাঁটি গলায়-দড়ি ইত্যাদিতে প্রকাশিত ও পরিণত হয় না। তখন ট্র্যাজেডি হয় নিদারুন। বিবাহকালে কুমুর বয়স উনিশ না হয়ে যদি দশ হত, যদি নূরনগরের চাটুয্যে-বাড়িতে তার জন্ম না হত এবং দাদা বিপ্রদাসের তত্ত্বাধানে তার নবিন বয়স অতিবাহিতনা হত তবে মধুসূদন ব্যক্তিটি অশেষ স্থূলতা সত্ত্বেও তার সঙ্গে ঘর করতে কুমুর কিছুমাত্র বাধত না, এবং তার আঙ্গে মোতির মার দৃষ্টিভঙ্গিতেও কোন পার্থক্য থাকত না।

৪. কুমুদিনী :

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
124

কুমুদিনী ছাড়া রবীন্দ্রনাথের কোন উপন্যাসের কোন নায়িকাই 'পটের সুন্দরী' নয়। কুমুই এ বিষয়ে ব্যতিক্রম। এর কারণ আছে। প্রাচীন অভিজাত বংশের মেয়ে সে। বহু পুরুষ ধরে তাদের গৃহে বাছাই করা সুন্দরী মেয়ে বধূরূপে এসেছে। সুতরাং সে বাড়ির ছেলেমেয়ে অপরূপ না হওয়াই অস্বাভাবিক। লেখক জানিয়েছেন -

একরকমের সৌন্দর্য আছে তাকে মনে হয় যেন একটা দৈব

আবির্ভাব, পৃথিবীর সাধারণ ঘটনার চেয়ে অসাধারণ পরিমাণে বেশী-প্রতিক্ষণেই যেন সে প্রত্যাশার অতীত। কুমুর সৌন্দর্য এই শ্রেণির।

জন্মাবধি সে সংসারের উপর দুর্ভাগ্যের দৃষ্টি দেখে এসেছে। সংসারের পড়ন্ত দশা, আর মাতাপিতার মৃত্যুর নিদারুণতা কুমুর মনকে নিপীড়িত ও সংকুচিত করেছিল। সে-জন্য তার চিত্ত সবসময় কুণ্ঠিত ও শঙ্কিত থাকত এবং দৈব - ইঙ্গিত গ্রহনক্ষত্রের ফলাফল ইত্যাদিতে আস্থা রেখে সে মনে ভরসা আনতে চেষ্টা করত। তা ছাড়া তার মনে একটা স্বাভাবিক ভক্তিভাব 'একটি নিরবলম্ব ভক্তির স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস ছিল। তাছাড়া বিপ্রদাস তাকে সুরের দীক্ষা দিয়েছিল। কুমুর ভক্তি সুরের ধারায় প্রবাহিত হয়ে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তিকে ঘিরে মানসপটে ভবিষ্যৎ সার্থকতার এক অস্পষ্ট আলেখ্য এঁকেছিল। বিবাহের পূর্বে তার মনে যৌবনের বেদনা কোন সুস্পষ্ট রূপ নিয়ে জাগে নি। ভাইদের উপর যথাযোগ্য স্নেহ ও ভক্তি এবং সংসারের প্রতি প্রীতি তার হৃদয়ের খিদে মেটাত। যেটুকু বেশি সেটুকু সে যেন সুরের রণনে অন্ধভাবে অনুভব করত। সে জানত তাকে বিবাহ করতে হবে, এবং তাকে বিবাহ দিতে না পারায় দাদা উদ্বেগ ভোগ করেছেন। কিন্তু মনে মনে কুমু তার স্বামীর কোন কল্পনামূর্তি গড়ে রাখে নি। পুরাণকথায় গানে-সুরে রাধাশ্যামের যুগলরূপের মধ্যেই তার নিজের প্রেমের আদর্শ মিলিয়েছিল। মায়ের কাছ থেকে সে জেনেছিল, স্বামী ভক্তির রস মনকে কতটা ভরিয়ে রাখতে পারে। তাই কোন বাস্তব স্বামীর কল্পনা না করে স্বামী ভক্তি আদর্শটাকেই কুমু মনে মনে খাড়া করেছিল।

সে ছিল অভিসারিনী তার মানস বৃন্দাবনে, ভোরে উঠে সে গান গেয়েছে রামকেলী রাগিনীতে -'হমারে তুমারে সম্প্রীতি লগী হৈ শুন মনমোহন প্যারে' - যাকে রূপে দেখবে এমনি করে কতদিন থেকে তাকে সুরে দেখতে পাচ্ছিল।

এই সুরসাধনাই কুমুর মনকে স্পর্শকাতর করেছিল স্বামী মধুসূদনের সংস্পর্শে।

সংসারে কুমুর সমবয়সী সঙ্গিনী ছিল না। সে-রকম কেউ থাকলে কুমুর মন অবস্তু নিয়ে অতটা মাতামাতি করতে পারত না, তার স্বামীর আদর্শ দুই পাঁচটা জানাশোনা স্বামীর আদলে মাটিগড়াই হত। সে জেনেছিল, স্বামীকে ভালোবাসা শ্যামসুন্দরকে ফুলজল দিয়ে পুজো করার মতোই সহজ এবং গানের সুর যেমন অন্তর ভরিয়ে তোলে স্বামীর প্রেমও তেমনি তার ভক্তিকে উৎসারিত করে দেবে। স্বামীর আদর্শ সম্বন্ধে কুমুর কল্পনা তাদের সংসারের বাইরে প্রসারিত হতে পারে নি। সে দাদাকে বলেছিল -

"ছেলেবেলা থেকে আমি যা কিছু কল্পনা করেছি সব তোমাদের ছাঁচে। তাই মনে একটু ভয় হয় নি। মাকে অনেক সময় বাবা কষ্ট দিয়েছেন জানি,

কিন্তু সে ছিল দুরন্তপনা তার আঘাত বাইরে ভিতরে নয়।"

কুমু যখন শুনতে পেল যে ঘটক যার সঙ্গে তার সম্বন্ধ এনেছে তারসঙ্গে কোষ্ঠীর মিল হয়েছে, তখন সে প্রজাপতির নির্বন্ধ বলেই মানল। সেই সময় আবার তার বাঁ চোখ নেচে উঠে যেন কথাটাকে তার মনে পাকা করেছিল। বিপ্রদাসের কোন আপত্তিকেই সে আমলই দিল না। কিন্তু পরে তাকে অনেকবার ভাবতে হয়েছে - 'দেবতার চেয়ে দাদার বিচারের উপর ভর করলে এত বিপদ ঘটত না।'

টিপ্পনী

হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা ও ভক্তি নিয়ে কুমুর হৃদয় তার স্বামীকে বরণ করে নিতে প্রস্তুত হল।এর জন্য তার মন রঙিন হয়েই ছিল।

"সূর্য ওঠবার আগে যেমন আলো হয় আমার সমস্ত আকাশ ভরে ভালোবাসা তেমনি করেই জেগেছিল।"

সংঘর্ষ শুরু হল বিবাহের পূর্ব থেকেই । মধুসূদনের দাম্ভিকতা, তার ধনগৌরব, এ সবের পিছনে ছিল অবচেতন হীনতাবোধ। এইজন্যই মধুসূদন তার শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কে কখনই সহজ ব্যবহার করতে পারে নি। কুমু মনকে শক্ত করে ভক্তিকে আঁকড়ে রইল।

"মধুসূদন ব্যক্তিটিতে দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু স্বামীনামক ভাব পদার্থটি নির্বিকার নিরঞ্জন। সেই ব্যক্তিকতাহীন ধ্যানরূপের কাছে কুমুদিনী একমনে নিজেকে সমর্পন করে দিলে।"

ভক্তির যেখানে বাস্তব ভূমি নেই সেখানে সংসারের সংঘর্ষ থেকে তাকে অক্ষত রাখা কঠিন। আর যেখানে ভক্তির আলম্বনই আঘাত আনতে থাকে সেখানে তো কথাই নেই। মধুসূদনের স্থূল আচরণ কুমুর ভক্তির মূলে নাড়া দিতে থাকে।

যে একটি সহজ শুচিতাবোধ এই উনিশ বছরের কুমারী জীবনে ওর অঙ্গে গভীর করে ব্যাপ্ত ..... কর্ণের কবচের মতো।

তার মধ্যে কুমু নিজেকে সঙ্কুচিত করে রাখল। বিবাহের পরদিন স্বামীগৃহে যাবার পথে একটা সামান্য ঘটনায় তার ভবিষ্যৎ যেন প্রতিম্বিত হল। কুমু তার থলি উজাড় করে দশটাকা দিয়ে একটি মেয়েকে আড়কাঠির হাত থেকে উদ্ধার করল। কিন্তু যে আড়কাঠিটি তাকে নিয়ে যাচ্ছিল তার হাত থেকে উদ্ধার করবে কে ?

স্বামীগৃহে এসে কুমুর বিতৃষ্ণা বেড়েই চলে। এই সংসার মরুভূমির মধ্যে তার একমাত্র ছায়া দেবরপুত্র হাবুল। কিন্তু মধুসূদনের কঠোর শাসনে সেটুকু আশ্রয়ও সুলভ হল না। মধুসূদন কুমুকে দৈবলব্ধ বস্তুর মতো ভেবেছিল এবং কুমুর মন পাবার জন্য সে বুদ্ধিবিবেচনা মতো চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু কুমুর অন্তরের সবচেয়ে কোমল

স্থানে বারবার আঘাত করে সে বিচ্ছেদকে বাড়িয়েই চলল। বিপ্রদাসের প্রতি কুমুর অগাধ ভক্তি ও স্নেহ মনে পড়লে মধুসূদনের মনে মনে আগুন জ্বলে যেত। বিবাহের পরেই বশ্য কুমু বুঝেছিল তাঁর স্বামীর স্বভাবের জাতটাই আলাদা। মধুসূদনের কাছে পাওয়া অপমান তাকে আরও বেশি দাদা বিপ্রদাসের স্নেহের দিকে আকর্ষণ করেছিল। শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পর দিন বিপ্রদাসের কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেয়েছিল কুমু - 'ভগবান তোমাকে আশীর্বাদ করুণ।' কুমুদিনীর কাছে এ শুধু তাদের বার্তা নয়, যেন 'দাদার দক্ষিণ হাতের স্পর্শ।' তৃপ্তিবোধের সঙ্গে সঙ্গে একটা চিন্তাও ভিড় করে কুমুর মনে, দাদা কেন তাঁর শরীরের কথা জানালেন না। তাঁর কি শরীরের অসুস্থতা বেড়েছে। যে দাদার সান্নিধ্য এতকাল কুমুর সবচেয়ে বড় আশ্রয় ছিল, তার শ্বশুরবাড়ির পথটা সেই দাদার জন্য রুদ্ধ হয়ে গেছে। তাই ডাকের বার্তাই তাদের সংযোগের সেতু। আর মধুসূদন ভাবে -

> "কুমুদিনীর উনিশটা বছর মধুসূদনের আয়ত্তের বাহিরে, সেইটে বিপ্রদাসের হাত থেকে এক মুহূর্তেই ছিনিয়ে নিতে পারলে তবেই ও মনে শান্তি পায়। আর কোন রাস্তা জানে না জবরদস্তি ছাড়া।"

জবরদস্তি করে কুমুকে বশ করা বোধ করি বিধাতারও সাধ্যাতীত ছিল। বিপ্রদাসের কাছে সে ধৈর্য্যের দীক্ষা নিয়েছিল। সম্পূর্ণ আত্মদান করতে প্রস্তুত হয়ে কুমুদিনী স্বামীগৃহে এসেছিল, কিন্তু দান করবে যাকে সে তো তার আত্মার ও আত্মসমর্পনের কোন মূল্য জানে না। উপরন্তু বারবার কুমুর মর্মে বেদনা দিয়ে তার মনের আবরণকেই শক্ত করেছে।

মধুসূদনের পরিবারে গৃহস্বামীর একতরফা কর্তৃত্বের কাছে সবাই অনুগত। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সেখানে পদদলিত হয়েছে। আবাল্য স্বাধীন আবহাওয়ায় লালিত কুমু এর বিরুদ্ধে মনে মনে প্রতিবাদী না হয়ে পারে নি। নিজের চিঠি পাওয়ার অথবা চিঠি লেখার সহজ অধিকার থেকেও কুমু বঞ্চিত, সেখানেও মধুসূদনের ইচ্ছাই শেষ কথা। দাদার খবর পাওয়ার জন্য কুমু টেলিগ্রাম পাঠালে মধুসূদন সেকথা জানতে পেরে ক্রোধে ফেটে পড়ে। পরে অবশ্য ক্রোধ সংযত করে বিপ্রদাসের পাঠানো টেলিগ্রাম সে তুলে দেয় কুমুর হাতে। তাতে ইংরাজিতে লেখা আছে 'আমার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ো না, ক্রমশই সেরে উঠছি, তোমাকে আমার আশীর্বাদ।" অন্তরের গভীরে উদ্বেগের মধ্যে এই আশ্বাসের কথাগুলো কুমুর চোখে অশ্রু নামাল। চোখ মুছে টেলিগ্রামটা সে যত্ন করে বাঁধল আঁচলের প্রান্তে। কিন্তু তাতে অসূয়াপরায়ণ মধুসূদনের হৃৎপিন্ডে যেন মোচড় লাগল। টেলিগ্রামের সংক্ষিপ্ত কথায় অবশ্য কুমুর আগ্রহ মেটে নি। স্বামীকে তার পরবর্তী প্রশ্ন - 'দাদার কি চিঠি আসে নি।' এখানেও মধুসুদন লুকোচুরি খেলা চালিয়েছে। বিপ্রদাসের চিঠি এলেও মুহর্তের ঝোঁকে তা সে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

অস্বীকার করেছে। আর আর ফলেই কুমুর কাছে তার ক্ষমা প্রার্থনা। আসলে মধুসূদনের কঠিন আধিপত্যের চেতনালোকে ও কুমুদিনীর ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য এবং সেই আধিপত্যকে অস্বীকার করার শক্তি কখন যেন মধুসূদনের মনের গভীরে একটা বিপরীত টান তৈরি করেছিল। কখনো কখনও তার প্রকাশ ঘটেছে কুমুর কাছে দুর্বল আত্মসমর্পনে। মধুসূদনকে দুর্বল হতে দেখে কুমুও নিজেকে স্বামীর কাছে সমর্পণ করার জন্য ভেতরে ভেতরে প্রস্তুত হচ্ছিল। কিন্তু পরদিনই সে তার জা মোতির মার কাছে জানতে পারল দাদার চিঠির কথা, যে চিঠির প্রসঙ্গ মধুসূদন গোপন করে গেছে। অথচ মোতির মারও সাধ্য নেই সে চিঠি কুমুকে দেওয়ার। কেননা তা মধুসূদনের দেরাজে বন্দী। মোতির মা তাই পরামর্শ দেন মধুসূদন অফিসে বেরিয়ে গেলে কুমু যেন চিঠিটি পড়ে আবার দেরাজে রেখে দেয়। কিন্তু যে চিঠির উপর সঙ্গত অধিকার, সে চিঠিকে চুরি করে পাওয়ার দৈন্য স্বীকার করে নিতে কুমুর মন বিদ্রোহ করে। নিজের যাবতীয় ইচ্ছা-অনিচ্ছা গৃহকর্তার অনুমোদনে নিয়ন্ত্রিত হবে, এভাবনাটাই কুমুদিনীর নারীসত্তার নিজস্ব চাহিদার বিরোধী। তাই চুরির বদলে চুরি করে শোধ নেবার বাসনা সে পরিত্যাগ করল। দাদার চিঠি নিয়ে স্বামীর এই ক্ষুদ্রতায় কুমুর হৃদয় স্বামীর প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে। অথচ চিঠির মধ্য দিয়ে দাদার স্নেহ পাওয়ার আকাঙ্খাও কুমুর মনকে অশান্ত করে তোলে। ধৈর্য ধরতে না পেরে কুমু একাই যায় মধুসূদনের ঘরে। দেরাজ খুলে দেখে চিঠির লেফাফা খোলা। কুমুর বুকের ভিতরে যন্ত্রণা আরও অসহনীয় হয়ে ওঠে। যে বাড়িতে কুমু বড় হয়েছে সেখানে এমন অবমাননা কল্পনাই করা যায় না। তবু শেষ পর্যন্ত কুমু নিজের চিঠি চুরি করে না পড়ারই পণ করে।ঠিক এই মুহূর্তেই ঘরে মধুসূদনের প্রবেশ এবং বেসামাল অবস্থায় তার দুর্বল জবাবদিহি - 'এ চিঠি আসলে তোমার কাছে নিয়ে যাচ্ছিলুম, সে জন্য তোমার এখানে আসবার দরকার ছিল না।'এবার কুমুর ধৈর্যের বাঁধ সত্যিই ভেঙে যায়। সে বলে ওঠে -'এ চিঠি তুমি আমাকে পড়তে দিতে ইচ্ছা করনি, সেই জন্যই চিঠি আমি পড়ব না।এই আমি ছিঁড়ে ফেললুম, কিন্তু এমন করে আর কখনও কষ্ট দিও না, এর চেয়ে কষ্ট আমার কিছু হতে পারে না।'

এভাবেই ঔপন্যাসিক মধুসূদন ও কুমুদিনীর দাম্পত্য সংঘাতকে তীব্র করে তোলেন। স্বামীর হীনতা কুমুদিনীর অনুভূতিপ্রবণ ও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন চেতনাকে যতই আঘাত করে ততই নিজের চারপাশে আবরণ টেনে কুমুদিনী তার নিজেরই গড়ে তোলা দুর্গের মধ্যে আত্মরক্ষা করতে বাধ্য হয়। মধুসূদন ও কুমুর দ্বন্দ্ব এখানেই শেষ হয় না। মধুসূদনের প্রভুত্বমদমত্ত অসহিষ্ণু প্রবৃত্তির মধ্যে যেহেতু নিঃশব্দ সঞ্চারে জন্ম নিচ্ছিল কুমুর প্রতি আকর্ষণ, তাই তার চিঠিখানা ছিঁড়ে চলে যাওয়ার ছবিটাও তার মনের মধ্যে গভীরভাবে মুদ্রিত হয়ে যায়। চিরকালের সন্দিগ্ধ স্বভাবশত মধুসূদন একবার ভাবে কুমু হয়তো চিঠিটা আগেই পড়ে নিয়েছে। কিন্তু কুমুর মধ্যে

সত্যের এমন একটা নির্মল দীপ্তি ছিল, যে বেশিক্ষণ তাকে অবিশ্বাস করা মধুসুদনর পক্ষেও সম্ভব হয় নি।

এরপর যখন বিপ্রদাসের চিঠি এসেছে মধুসূদন তখন উদার হতে চেয়েছে। কুমুর মন জয় করার জন্য তাকে ঘরে ডেকে পাঠিয়ে তার হাতে চিঠিটা তুলে দিয়েছে। চিঠিতে প্রয়োজনীয় সম্বোধনের পর লেখা আছে -

> "চিকিৎসার জন্য শীঘ্রই কলিকাতা যাইতেছি, সুস্থ হইলে তোমাকে দেখিতে যাইব। গৃহকর্মের অবকাশমত মাঝে মাঝে কুশল সংবাদ দিলে নিরুদবিগ্ন হই।"

এবার কিন্তু আর সংক্ষিপ্ত চিঠি কুমুর মন ভরাতে পারে না, চিঠি পাঠের পর কুমুদিনী 'মনে মনে বললে, পর হয়ে গেছি,' কিন্তু অভিমান প্রবল হতে না হতেই ঘনিয়ে এল দুশ্চিন্তা, 'দাদার হয়ত শরীর ভালো নেই, আমার কী ছোটো মন, নিজের কথাটাই সব ধেকে আগে মনে পড়ে।'

কুমুর সংবাদ নেবার জন্য বিপ্রদাস নিজে তার শ্বশুরবাড়ীতে আসে নি। এসেছে তাদের বহুকালের পুরোনো কর্মচারী কালু। তার কাছ থেকে কুমু জানতে পারে বিপ্রদাস বোনের সংবাদ পাওয়ার জন্য বাকুল হয়ে উঠেছিল, ডাকের গোলমালের জন্য শেষকালে তিনটি চিঠি একসঙ্গে পেয়েছে। ডাকের গোলমাল হওয়ার কারণটা যে কোন্‌খানে কুমু তা আন্দাজ করতে পারে। এ বিষয়ে তার পূর্ব অভিজ্ঞতা সুখের নয়।

বিপ্রদাস শারীরিক অসুস্থতার কারণে কলকাতায় এসে আবার চিঠি পাঠায় কুমুদিনীকে। সে চিঠি কুমুর হাতে আসে দেওর নবীনের মারফৎ। বিপ্রদাস লিখেছে - দু-একদিন পরে তার আসবার কথা ছিল কিন্তু বিশেষ কারণে আগেই আসতে হয়েছে, চিঠির শেষ দিকে আরও বলা ছিল, একটু সেরে উঠলেই বিপ্রদাস কুমুকে দেখতে আসবে। কুমু যেন ব্যস্ত বা উদ্‌বিগ্ন না হয়।

চিঠি পড়ে অভিমানে বুক ভরে ওঠে কুমুর। এ যেন স্পষ্ট করেই কুমুর আসার পথে নিষেধাজ্ঞা জারি করা। কান্না চেপে পাধরের মতো বসে থাকে কুমু। তার এই কঠিন অভিব্যক্তি নবীনের নজর এড়ায় না। সে কুমুকে বোঝাবার চেষ্টা করে বিপ্রদাস হয়তো মনে করেছে মধুসূদন কুমুকে দাদার কাছে যেতে দিতে আপত্তি করবে। দাদার কাছে যাওয়ার চেষ্টায় পাছে কুমুকে অপমানিত তে হয়, কষ্ট পেতে হয় সেটা বাঁচাবার জন্য বিপ্রদাসের এমন চিঠি। কুমুর মনে হয় নবীনের কথাটা বোধহয় ভুল নয়, এমন একটা ভাবনায় কুমু আরাম বোধ করে। দাদার চিঠিকে ভুল ব্যাখ্যা করার জন্য তার নিজের উপর নিজের রাগ হয়। মনের মধ্যে একটা জোর খুঁজে

টিপ্পনী

পায় সে - দাদার কাছে ছুটে না গিয়ে তার আসার জন্য কুমু অপেক্ষা করতে পারবে। যোগা আর অযোগের বিচিত্র টানাপোড়েন এখানে অভিব্যক্ত।

আসলে 'মধুসূদন যা চায় তা পাবার বিরুদ্ধে ওর স্বভাবের মধ্যেই বাধা।' কুমু ভাবে, সহধর্মিনী যদি নাই হতে পারি তবে দাসী হয়ে কর্তব্য ধর্মে অটুট থাকব। কিন্তু সেখানেও গোল বাধল।

> "কুমুদিনকে নিজের জীবনের সঙ্গে শক্ত বাঁধনে জড়াবার একটিমাত্র রাস্তা আছে সে কেবল সন্তানের মায়ের রাস্তা।"

মধুসূদনের শেষ ভরসা ছিল এই রাস্তায়। তার মনের জবরদস্তি অবশেষে সেই অঘটনই ঘটাল। উৎপীড়িত তরুণীকে তার মনের আবরণ 'যাতে করে নিজের কাছে তার ভালোলাগা মন্দলাগার সত্যকে লুপ্ত' করে 'অর্থাৎ নিজের সম্বন্ধে নিজের চৈতন্যকে' আচ্ছন্ন করেছিল - তা কেড়ে নিয়ে নগ্ন করে দিল এবং তার যে-দেহকে সে দেবতার পুণ্য সম্মিলনের ক্ষেত্র বলে শ্রদ্ধা করত এবং যে দেহমাংসের স্থূলবন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে একটি পরম স্পর্শের অনুভূতিতে পবিত্র হয়ে উঠেছিল সেই দেহকে অশুচি করে দিল। এইখানেই দৈত্যের কাছে বন্দিনী রাজকন্যার পরাভব ঘটল। কুমুর মনের স্বাভাবিক ভক্তির উৎস নিরুদ্ধ হয়ে গেল।

> এতদিন কুমু বারবার বলেছে আমাকে তুমি সহ্য করো - আজ বিদ্রোহিনীর মন বলছে তোমাকে আমি সহ্য করব কি করে ? কোন্ লজ্জায় আনব তোমার পূজা ? তোমার ভক্তকে নিজে না গ্রহণ করে তাকে বিক্রি করে দিলে কোন্ দাসীর হাটে - যে হাটে মাছ মাংসের দরে মেয়ে বিক্রি হয়, যেখানে নির্মাল্য নেবার জন্য কেউ শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজার অপেক্ষা করে না, ছাগলকে দিয়ে ফুলের বন মুড়িয়ে খাইয়ে দেয়।"

এরপর কুমুর বেদনার পরিসীমা রইল না। শুধু তার নয়, নারীহৃদয়ের চিরকালের অসহয়তা কুমুর এই কটি কথায় করুণভাবে ফুটে উঠেছে -

> "ঠাকুরপো, সংসারে তোমরা নিজের জোরে কাজ করতে পার ; আমাদের যে সেই নিজের জোর ঘটাবার জো নেই, যাদের ভালোবাসি অথচ নাগাল মেলে না, তাদের কাজ করব কী করে ? দিন যে কাটে না, কোথাও যে রাস্তা খুঁজে পাই নে। আমাদের কি দয়া করবার কোথাও কেউ নেই ?"

যতদিন মধুসূদন তার সঙ্গে কঠিন ব্যবহার করেছিল ততদিন কুমুর সমস্যা সহজ ছিল। এখন মধুসূদন তার মন পাবার জন্য উৎসুক হয়েছে। কুমুর মনের দ্বন্দ্ব

তাকে ব্যাকুল করে তুলেছে -

স্বামীকে মন প্রাণ সমর্পন করতে না পারাটা মহাপাপ, এসম্বন্ধে কুমুর সন্দেহ নেই, তবু ওর এমন দয়া কেন হলো ?

'তাই যখন মধুসূদন ওর হাত চেপে ধরে নাড়া দিয়ে বললে,তুমি কি কিছুতেই আমার কাছে ধরা দেবে না ? তখন ব্যাকুল হয়ে কুমু মধুসূদনকে বলল, "তুমি আমাকে দয়া করো।' এই মুহূর্তে মধুসূদন কুমুদিনী হৃদয়ের সবচেয়ে কাছে আসবার সুযোগ পেয়েছিল। বিপ্রদাসের প্রেরিত তার এসরাজ এনে দেওয়াতে কুমুর মন আরও একটু নরম হল। তাই মধুসূদনের কাছে এসরাজ বাজিয়ে গান করতে যে সংকোচটুকু এসেছিল তা সে সহজেই জোর করে কাটাতে পারল। গানের সুরে তন্ময় হয়ে কুমু নিজের উপলব্ধিতে আগেকার দিনের মতো নিমগ্ন হয়ে গেল।

> "যে গানটি সে ভালোবাসে সেইটি ধরল, 'ঠাড়ি রহো মেরে আঁখনকে আগে।' সুরের আকাশে রঙীন ছায়া ফেলে এল সেই অপরূপ আবির্ভাব, যাকে কুমু গানে পেয়েছে, প্রাণে পেয়েছে, কেবল চোখে পাবার তৃষ্ণা নিয়ে যার জন্যে মিনতি চিরদিন রহে গেল - 'ঠাড়ি রহো মেরে আঁখনকে আগে।"

মধুসূদনের গৃহে কুমুর আত্মপ্রকাশ শুধু এই একদিন।

মধুসূদনের নিষ্ঠুরতার অপেক্ষা তার ভালোবাসাকে কুমুর বেশি ভয়। কেন না মধুসূদনের আকাঙ্ক্ষা মেটাবার মতো তার কিছু নেই। ভালোবাসা না থাকলেও স্বামী স্ত্রী সম্পর্কে ছেদ পড়তে পারে, কিন্তু যেখানে ভালোবাসা আশা করে শেষে বঞ্চিত হতে হয় সেখানে স্ত্রীর কর্তব্য সম্পাদন করে চলতে গেলে অত্যন্ত মনের জোর চাই। কুমুর মনে সেই জোর ছিল। ধর্মকে অবলম্বন করে মধুসূদন সম্পর্কে সে কর্তব্যের সম্মখীন হল।

> আজ বুঝতে পেরেছি সংসারে ভালোবাসাটা উপরি পাওনা। ওটাকে বাদ দিয়েই ধর্মকে আঁকড়ে ধরে সংসার ভাসতে হবে। ধর্ম যদি সরস হয়ে ফুল না দেয়, ফল না দেয়, অন্তত শুকনো হয়ে যেন ভাসিয়ে রাখে।

এবার মধুসূদনের মনের বিরুদ্ধতাই সংকট সংঘটন করল। কুমুর দিকে মন দেওয়াতে তার ব্যবসায়ের কাজে অমনোযোগ হচ্ছিল। কুমুর দিক থেকে মন ফিরিয়ে সে কাজে লাগিয়েছে এমন সময় নবীনের সদিচ্ছাপ্রণোদিত মিথ্যা কথা - "বৌরানী তোমার জন্য হয়তো জেগে বসে আছেন" - আবার তার মনে রঙের জোয়ার বয়ে আনল। সে গিয়ে সশব্দে বিছানায় উঠতেই কুমুর ঘুম ভেঙে গেল।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

অনপেক্ষিতভাবে মধুসূদনকে শয়নকক্ষে দেখে সে নিজের অজ্ঞাতসারেই এতটা বিবর্ণ ও উচ্চকিত হল যে তাতে মধুসূদনের মনের ঘোরও তখনই ভেঙে গেল।এই সংঘাতে মধুসূদন - কুমুদিনীর পরস্পরের প্রতি মনোভাবের জটিলতা অনেকটা কাটল । কুমুদিনী মনে মনে জানল, মধুসূদনের সঙ্গ 'এর পরে কড়া পড়ে গেলে কোনো একদিন হয়তো সয়ে যাবে, কিন্তু জীবনে কোনোদিন আনন্দ পাব না তো।'

বাপের বাড়ি ফিরে কুমু আর তার আগের স্থানটি সহজে খুঁজে পেল না, সে বুঝল,"সংসারের গ্রন্থি কঠিন হয়েছে, কিন্তু ভালোবাসার একটুও অভাব হয়নি।" কুমু স্থির করল "এই ভালোবাসার উপর সে ভার চাপাবে না।," সে মধুসুদনের সংসারে ফিরে যাবে । ইতিমধ্যে মধুসূদন শ্যামার সম্পর্ক বিপ্রদাসের কানে এল, কুমুর শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার প্রস্তাব আপাতত চাপা পড়ল। এবার আর দাদার বিচারের উপর হস্তক্ষেপ করতে কুমু ভরসা পেল না।

হস্তক্ষেপ করল মধুসূদন নিজে।বাপের বাড়িতে সাদাসিধা পোশাকে কুমুর অম্লানশ্রী দেখে তার দখল করবার প্রবৃত্তি জেগে উঠল। মধুসূদনের চোখরাঙানি ও হুমকি বৃথা যেত না যদি না কুমুর অদৃষ্টের ফাঁস শক্ত টান টানত। সন্তান সম্ভাবিত কুমুদিনীকে তার পিতৃগৃহের ভলোবাসা সংস্কার এবং মর্যাদাবোধ আর ধরে রাখতে পারল না। সে যে মধুসূদনের হাড়কাঠে নিজের দেহ পূর্বেই বলি দিয়ে এসেছে। কিন্তু ঠাকুর তাকে নিঃশেষে বঞ্চিত করেন নি। কুমু বুঝেছে, সে তার বিশ্বাসের কাছে, নিজের অন্তরাত্মার কাছে খাঁটি রয়ে গেছে, এবং তাই সংসারের সকল দাবির বাইরে তার যে আনন্দলোক সেখানে তার মুক্তি অপেক্ষা করে আছে। এই সুরের এই ভালোবাসার, এই আনন্দের দীক্ষা বিপ্রদাসের কাছে সে পেয়েছে।

> "দাদা তুমি ঠাকুর বিশ্বাস কর না, আমি বিশ্বাস করি, তিন মাস আগে যে রকম করে করতুম, আজ তার চেয়ে বেশি করেই করি। তোমার কাছে এসব কথা বলতে লজ্জা করে - কিন্তু আর তো কখনো বলা হবে না, আজ বলে যাই। নইলে আমার জন্য মিছিমিছি ভাববে। সমস্ত গিয়েও তবু বাকি থাকে এই কথাটা বুঝতে পেরেছি ; সেই আমার অফুরান, সেই আমার ঠাকুর। এ যদি না বুঝতুম তাহলে এইখানে তোমার পায়ে মাথা ঠুকে মরতুম, সে গারদে ঢুকতাম না। দাদা, এসংসারে তুমি আমার আছ বলেই তবে এ কথা বুঝতে পেরেছি।"

যাকে সে সবচেয়ে ভালোবাসে তাকে অমর্যাদা থেকে বাঁচাবার জন্যই তার কাছ থেকে সে নিজেকে চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন করল। যাবার আগে কুমু দাদাকে বলে গেল -

কিন্তু একটি কথা তোমাকে বলে রাখি, কোনদিন কোন কারনেই তুমি ওদের বাড়ী যেতে পারবে না। জানি দাদা, তোমাকে দেখবার জন্য আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠবে, কিন্তু ওদের ওখানে যেন কখনো তোমাকে দেখতে না হয়। সে আমি সইতে পারব না।

কুমুদিনী এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। নারী - পুরুষ দুয়ের মধ্যে তার দিকে লেখকের পূর্ণ দৃষ্টিপাত। তার চরিত্রের মুখ্য সূত্রগুলি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে, এভাবে -

টিপ্পনী

(১) বাবা মায়ের ঘটনা এবং মায়ের প্রায় স্বেচ্ছা মৃত্যু, বাবার প্রায় আত্মহনন কুমু দেখেছে। লেখক এর থেকে কুমুর চরিত্রে সঞ্চারিত হবার মতো একটি লক্ষণের উল্লেখ করেছেন - তার মায়ের দেবোপম সতীত্বের মহিমা। আর একটি প্রসঙ্গ লেখক খুব স্পষ্টভাবে না বললেও ছায়া ফেলেছে, সেটি হল - স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এবং সতী বিষয়ে কুমুর মনের অবচেতনায় কিছু অবসেসন তৈরি হয়ে থাকবে। স্বামীর অত্যাচারের প্রতিরোধ, স্ত্রীর অবিচল সতীত্বের দর্প, স্বামীর মৃত্যুতে অলৌকিক স্বেচ্ছামরণ কুমুর মধ্যে একটা সুরক্ষা কবচ বা 'ডিফেন্স মেকানিজম' তৈরি করেছিল যার অন্যতম ফল যৌন শীতলতা। রবীন্দ্রনাথ খানিকটা অস্পষ্টভাবে কুমু-চরিত্রে এই মনোবিকলনমূলক ব্যাখ্যার সুযোগ তৈরি করে রেখেছেন।

(২) বিপ্রদাসের কাছে কুমুর লেখাপড়া, দাদার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। অবিবাহিত বিপ্রদাসের হৃদয়বন্ধন মাত্র কুমুর সঙ্গে। দাদার কাছে সংস্কৃত পড়েছে, এস্রাজ শিখেছে, প্রকৃতির মধ্যে মুক্তি খুঁজতে শিখেছে। সম্ভবত পজিটিভিজমের কথাও শুনেছে। নিরীশ্বর বাদে তার রুচি হয় নি, তবে মানুষের স্বাধীনতার মন্ত্র সে ওখান থেকেই পেয়েছে। জীবনে গভীরভাবে সম্পৃক্ত না হয়ে পড়ার প্রবণতা দাদার প্রভবের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে পড়েছিল।

(৩) কুমু আধ্যাত্মিকতা দাদার কাছ থেকে পায়নি একথা ঠিক, আবার পুরো ঠিকও নয়। বিপ্রদাস এই আস্তিকতায় অস্বস্তি বোধ করত। কিন্তু বিপ্রদাসে নাস্তিকতার মধ্যেও এমন একটা নিষ্ঠা, সংসারের থেকে বিচ্ছিন্ন আত্মস্থ ভাব ছিল যাকে এক ধরনের আধ্যাত্মিকতাই বলতে হয়। তবে কুমুর আধ্যাত্মিকতা একান্তভাবে তার নিজের। তার চরিত্রের মূল উপাদানের অন্যতম।

(৪) তাছাড়া কুমুর আচরণে শালীনতা, কোমলতা চটুলতাহীন আভিজাত্য, পরিশীলিত রুচিবোধের একটা পরিমন্ডল ছিল। ফলে সংসারের সকলের মধ্যে সে যেন একটু উঁচুতে বিচরণ করত। তাকে ঘিরে যেন একটা দ্যুতি বিকীর্ণ হত।

(৫) কুমুদিনী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যে সত্য অন্তরে লাভ করেছিল তার সঙ্গে

টিপ্পনী

বাংলা সাহিত্যে উনবিংশ শতাব্দী থেকে চলে আসা নারীর ব্যক্তি-মুক্তির বোধের অনেকখানি পার্থক্য ছিল। নারী সংসার-সমাজের রীতি ও আদর্শকে ভেঙে আপনার চিত্তের নির্দেশে ভালোবাসতে পারে। প্রেমে ছাড়া মেয়েদের স্বাধীনচিত্ততা অন্য কোনভাবে প্রকাশ পেতে পারে, একথা ভাবা হয় নি। রবীন্দ্রনাথ প্রেমব্যতিরিক্ত স্বাতন্ত্র্যের বোধে 'গল্পগুচ্ছে' কয়েকটি স্ত্রী-চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন। কুমুদিনীর চরিত্র মুক্তি প্রেম নয়।

কুমুর ব্যক্তিগত ধর্মবোধ মীরাবাইয়ের আদর্শ অনুযায়ী। মীরার ভজন এদেশে আরও নানা ভজন-গানের মতো জনপ্রিয় হলেও বৈষ্ণব সাধন প্রণালী হিসেবে আদৌ গ্রাহ্য নয়। মীরাপন্থাই প্রাধান্য পেয়েছে কুমুর মনে - তাকে সঙ্কটের মুহূর্তগুলিতে মানসিক আশ্রয় দিয়েছে, সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস দিয়েছে।

কিন্তু এর দরকার হল কেন ? কুমুদিনী তার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের জোরে স্বামীকে সরিয়ে দিয়েছে, দাম্পত্যকে মেনে নিতে চায় নি, সংসার ও প্রথাকে অস্বীকার করেছে। রবীন্দ্রনাথ তার কারণ হিসেবে মধুসূদনের রূপ গুণ-চরিত্র, জীবনবোধ, প্রতিদিনের আচরণকে দায়ী করেছেন। কুমুর সূক্ষ্মসংবেনশীলতা, মার্জিত অভিজাত্য, বাক্তিগত রুচির সম্পূর্ণ বিপরীতে মধুসূদনের অবস্থান। এর ফলে যে দবন্দ্ব তার ক্রমবিকাশ লেখক উনচল্লিশ অধ্যায়ে জুড়ে খুঁটিনাটি বিশ্লেষনে নিপুনতা পরিবেশন করেছেন।

(৬) কুমুর স্বামীগৃহে না ফেরার সিদ্ধান্ত পূর্ববর্তী যাবতীয় ঘটনা ও চরিত্র সংঘাতের অনিবার্য পরিণতি। কিন্তু কুমু গর্ভিনী - এই ঘটনা প্রকাশ হওয়ায় সব কিছু বদলে গেল এরূপ পরিস্থিতি তৈরি করে সচেতনভাবে তত্ত্ববিদ্ রবীন্দ্রনাথ নারীর মাতৃত্বে স্ত্রীত্বের সব সঙ্কটের সমাধান দেখাতে চেয়েছেন। অনেকে সোৎসাহে 'জায়া-জননীবাদ' নাম দিয়েছেন এই তত্ত্বের। কিন্তু শিল্পী রবীন্দ্রনাথ এই সমাধানে কুমুর নারীত্ব ও ব্যক্তিত্বের যে আত্মসমর্পণ তার যন্ত্রনা ভোলেন নি।

কুমু বিপ্রদাসকে যা বলেছে,-

> একদিন ওদের ছেলেকে আমি ওদের হাতে দিয়ে দেব। এমন কিছু আছে যা ছেলের জন্য খোওয়ানো যায় না।

প্রথম বাক্যটি যে তার কথার বিপ্রদাসও বুঝেছিল। কিন্তু পরের বাক্যটি ট্র্যাজিক আর্তনাদ। এই 'এমন কিছু' চরিত্রের রহস্যকেন্দ্র এবং অস্তিত্ব। ছেলের জন্যই তা খোওয়াতে হল। এটাই ট্র্যাজেডি। শেষ বাক্যটি ডুবে যাবার পূর্বমুহূর্তের বুদ্বুদ।

কুমুদিনীর বিষয়টা ঔপন্যাসিকের সমাজবোধের বিভ্রান্ত জটিলতার ফল। কুমু দাদার কাছে নব্য জীবনবোধ যা পেয়েছিল তা জমা রইল তার মনের গভীরে।

কিন্তু খুব বেশি যে বিশ্বাসে তার বিচরণ সেসবই মধ্যযুগীয় প্রথায় বদ্ধ নির্বিচার সামাজিক ভাবনার ফল। রীতিমাফিক ধর্মাদর্শে ও সংশ্লিষ্ট মূল্যবোধগুলিতে তার অবিচল আস্থা। দাম্পত্যের যে আদর্শ সে স্বপ্নে সত্য বলে ভেবেচিল বাস্তবে কঠিন আঘাত এল একেবারে বিপরীত প্রান্ত থেকে। প্রতিরোধে মুক্তি পেল তার নারীত্ব। যে - শক্তি বিপ্রদাসের চিন্তা ও শিক্ষা থেকে সঞ্চারিত হয়েছিল চিত্তের গহনে তারই জোরে। ফিউডাল মূল্যবোধ থেকে বুর্জেয়া চেতনায় কুমুদিনীর উদ্বোধন। অসঙ্গতিটা এই যে জমিদার কন্যা এক জমিদার - ভাইয়ের মন্ত্রে লড়াই করতে লাগল বুর্জেয়া ব্যক্তি - স্বাতন্ত্র্য ও নারীর অধিকারের পক্ষে, একজন বণিক পুঁজিপতির বিরুদ্ধে, যার অন্তরে নারী ও পত্নী প্রসঙ্গে ফিউডাল ধারণা বাসা বেঁধে ছিল। কিন্তু অকস্মাৎ সব যুদ্ধশেষ হল। সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়ল বিদ্রোহিনী। সঙ্গে সঙ্গে সব মর্যাদাবোধ ও স্বাতন্ত্র্যের ধ্যান সংবরণ করে সে স্বামীগৃহে ফিরে এল। লেখক তত্ত্বকথা বলে মাতৃত্বের আবরণ দিয়ে এই আত্মসমর্পণকে গৌরব দিতে গিয়ে আসলে পূজো করেছেন কুমুর ফিউডাল ধ্যানে প্রত্যাবর্তনকে।

টিপ্পনী

মধুসূদন :

কুমুদিনীর সঙ্গে মধুসূদনের পার্থক্য শুধু জাতিতে নয়, ধাতুতে ও রঙে। কুমুর "স্বভাবটি জন্মাবধি লালিত একটি বিশুদ্ধ বংশ মর্যাদার মধ্যে অর্থাৎ এ যেন এর জন্মের পূর্ববর্তী বহু দীর্ঘকালকে অধিকার করে দাঁড়িয়ে", তাই "একটি আত্মবিস্মৃত সহজ গৌরব" সবসময় তাকে ঘিরে থাকত। মধুসূদনের বংশমর্যাদা তার জন্মের বহুপূর্বেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। বাল্যকালে সে ছিল "রজবপুরের আন্দো মুহুরির ছেলে মেধো"। তাই ঐশ্বর্যের আড়ম্বর দিয়ে হীনমম্মন্যতাকে ঢেকে দেবার এত প্রয়াস। মধুসূদনের চরিত্র যে ধাতুতে গড়া তার প্রধান গুণ কাঠিন্য। মনের কোমল বৃত্তি বলতে যা বোঝায় তার বালাই তার ছিল না। মধুসূদনের সর্বস্ব ছিল কর্ম, এবং ইষ্ট ছিল সর্ব বিষয়ে তার কর্তত্ব। মধুসূদনের পৌরুষ ইতর আচরণের কুশ্রীতা কুমুদিনীর মনে বারবার আঘাত ও লজ্জা দিয়েছে।

> "মধুসুদন দেখতে কুশ্রী নয় কিন্তু বড়ে কঠিন।..... সবশুদ্ধু মনে হয় মানুষটা একেবারে নিরেট। মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বদাই কী একটা প্রতিজ্ঞা গুলি পাকিয়ে আছে।"

মধুসূদনের বয়স যৌবনের প্রান্তে এসে ঠেকেছে। এর পূর্বে হৃদয়বৃত্তির চর্চার কোন সুযোগ সে পায় নি এবং সে প্রবৃত্তিও ছিল না। সুতরাং কুমুদিনীর মন পাবার জন্য আকাঙ্ক্ষা গভীর হলেও যোগ্যতা ও ধৈর্যের অভাব ছিল। উপরন্তু গোপন হীনতাবোধে, অন্তরের নিস্ফলতার জ্বালা ইত্যাদি কারণে বিপ্রদাসের প্রতি সুতীব্র ঈর্ষা তাকে উল্টোপথেই চালিত করেছিল। "যার প্রতি মমতা তার প্রতি ওর একাধিপত্য

চাই" - কুমু যে দাদা বিপ্রদাসকে অন্তর থেকে ভালোবাসে তাই তা মধুসূদনের এত অসহ্য।

'মধুসূদন যা চায় তা পাবার বিরুদ্ধে ওর স্বভাবের মধ্যেই বাধা ..... এই জাতের লোকেরাই ভিতরে ভিতরে যাকে শ্রেষ্ঠ বলে জানে বাইরে তাকে মারে।"

টিপ্পনী

অথচ কুমুর আকর্ষণ দিন দিন প্রবল হয়ে উঠেছিল। এই আকর্ষণ শুধু বাইরের সৌন্দর্য নয়, কুমুর স্বভাবের স্নিগ্ধতা এবং 'অনমনীয় আত্মমর্যাদার সহজ প্রকাশ'। কুমুর স্বভাব মধুসূদনের বিপরীত। এই বৈপরীত্যই তাকে প্রবল বেগে টেনেছে।

বিবাহের আগে পর্যন্ত মধুসূদনের জীবনে স্ত্রীলোক সংস্পর্শ ঘটেনি। শ্যামাসুন্দরী মধুসূদনের সংসারে 'ঐশ্বর্যের জোয়ারের মুখেই' প্রবেশ করিয়াছিল, তাই তার প্রতি মধুসূদনের একরকমপ্রসন্নতা ছিল, 'যৌবনের যাদুমন্ত্রে এই সংসারের চূড়ায় সে স্থান করে নেবে এমনো সঙ্কল্প" শ্যামার ছিল। মধুসূদনের অমনস্ক চিত্তও শ্যমার সম্বন্ধে অচেতন ছিল না। কেবল তার দিনরাত ব্যবসায়কর্মে এবং চিন্তায় ঠাসা ছিল বলে ওদিকে ওর মনে পড়ে নি।

> "এই কঠিন পরিশ্রমের মাঝখানে চোখের দেখায় কানের শোনায় শ্যামার যে-সঙ্গটুকু নিঃসঙ্গভাবে পেত তাতে যেন মধুসুদনের ক্লান্তি দূর করত।"

অতর্কিতে শয়নকক্ষে দেখে কুমুদিনীর আতঙ্ক যখন মধুসূদনকে দূরে ঠেলে দিল তখন শ্যামাসুন্দরীর সমাদর তাকে সহজেই টেনে নিতে পারল। শ্যামার প্রতি মধুসূদনের প্রকৃতিতে স্নেহপদার্থটির অংশ নিতান্ত কম ছিল। যেটুকু ছিল তা শুধু নবীনের ভাগেই পড়েছিল। এই ভাইটিকে সে ভালোবাসত বলেই মধুসূদন তার স্ত্রীকে ভালোচোখে দেখত না, কল্পনা করত মোতির মা যেন নবীনের মন ভাঙাতেই আছে। ছোট ভাইবের প্রতি ওর যে পৈতৃক অধিকার বাইরে থেকে এক মেয়ে এসে সেটাতে কেবলি বাধা ঘটায়। আকৃতি-প্রকৃতিতে শ্যামাসুন্দরী কুমুদিনীর সম্পূর্ণ বিপরীত।

> শ্যামাসুন্দরীর অনুজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মোটা বললে যা বোঝায় তা নয়, কিন্তু পরিপুষ্ট শরীর নিজেকে একটু যেন ঘোষণা করছে। একখানি সাদা শাড়ির বেশি গায়ে কাপড় নেই, কিন্তু দেখে মনে হয় সর্বদাই পরিচ্ছন্ন। বয়স যৌবনের প্রায় প্রান্তে এসেছে, কিন্তু যেন জৈষ্ঠের অপরাহ্নের মতো বেলা যায় তবু গোধূলির ছায়া পড়েনি। ঘন ভুরুর নীচে তীক্ষ্ণ কালো চোখ কাউকে যেন সামনে থেকে দেখে না, অল্প

> একটু দেখে সমস্তটা দেখে নেয়। তার টলটলে ঠোঁট দুটির মধ্যে একটা ভাব আছে যেন অনেক কথাই সে চেপে রেখেছে। সংসার তাকে বেশি কিছু রস দেয়নি তবু সে ভরা। সে নিজেকে দামী বলেই জানে, সে কৃপণও নয়, কিন্তু তার মহার্ঘতা ব্যবহারে লাগল না বলে নিজের আশেপাশের উপর তার একটা অহঙ্কৃত অশ্রদ্ধা।

শুধু বয়সে নয় প্রকৃতিতেও শ্যামাসুন্দরী ও মধুসূদনের মধ্যে বেশ মিল ছিল। মধুসূদনকে শ্যামা ভালোবাসত ঠিকই, তবে নিজের ধরনে। বিবাহের আগে মধুসূদন ছিল উদাসীন, অবসর -অভাবে, বিবাহের পর অপ্রত্যাশিতভাবে সুযোগ এসে পড়ল। বিচক্ষণ শ্যামা বুঝল, কুমুদিনীর রূপ ও বয়স মধুসূদনকে ক্ষণে ক্ষণে দুর্বল করবে বটে কিন্তু কুমুর প্রকৃতি মধুসূদনকে সহজে গ্রহণ করতে পারবে না। কুমুদিনীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই সে বয়সের তফাৎ লইয়া খোঁচা দিয়েছিল -

'সত্যি করে বলো ভাই, আমার বুড়ো দেওরটিকে তোমার পছন্দ হয়েছে তো ?' এরপর মধুসূদনের মনের গতিকের উপর শ্যামা সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলল। কুমুদিনীর সম্পর্কে মধুসূদন প্রথম ঘা খেতেই সে সাহস করে মধুসূদনের হাত ধরে ফেলল এবং বুঝল যে তার স্পর্শ মধুসূদনের খারাপ লাগে নি। দ্বিতীয় দিনে শ্যামার অভিসার অর্ধপথে চুকে গেল। তবে মধুসূদনকে ভাগ্যবান্ পুরুষ বলে তার মনকে সে একটু উসকে দিল। তৃতীয়বারে মধুসুদনের তর্জন লাভ করে তাকে ক্ষান্ত হতে হল, কেননা কুমুদিনী তখন মধুসূদনের মনকে রঙিন করে তুলছে।

> শ্যামাসুন্দরী কয়দিন থেকে একটু করে তার সাহসের ক্ষেত্র বাড়িয়ে চলছিল। আজ বুঝলো অসময়ে এসে অজায়গায় পা পড়েছে।

তার অশ্রুসজল সমবেদনা -

> চালাকি করব না ঠাকুরপো; যা দেখতে পাচ্ছি তাতে চেখে ঘুম আসে না। আমারা তো আজ আসিনি, কতকালের সম্বন্ধ, আমরা সইব কী করে ?

মধুসূদনের মনকে নাড়া দিয়ে গেল। চতুর্থবারে শ্যামার আত্মসমর্পন আর কুমুদিনীর কাছে মধুসূদনের আত্মমর্যাদার চরম পরাভব যুগপৎ ঘটে গেল। কুমুদিনী চলে গেল, সুতরাং তাদের মিলনে আর অন্তরালের আবশ্যকতা রইল না। শ্যামা বুঝল না যে ভালোবাসলেই বিশ্বাস করা যায় না। মধুসূদন তাকে অঙ্কলক্ষ্মী করল কিন্তু গৃহিণী করল না। অথচ কর্ত্রীত্বের লোভ শ্যামার মজ্জাগত। সুতরাং দুজনের সম্পর্কে বিরোধ দেখা দিল। কুমুদিনীর প্রতি শ্যামার বিদ্বেষ তাকে মধুসূদনের কাছে আরো অবজ্ঞেয় করল, মধুর-রসের সম্পর্কের মধুটুকু উবে গেল। মধুসূদন শ্যামাকে সুখী

টিপ্পনী

করতে পারল না।

ঔপন্যাসিক মধুসূদনের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার কিছু বিশ্লেষনে, কিছুটা ইঙ্গিতময় উপস্থাপনায় যথেষ্ট যত্ন নিয়েছেন। মধুসূদনকে তিনি কোথাও মহিমা দেন নি। শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ বিশ্বাসঘাতক, লোভী এবং হত্যাকারী হলেও বিশ্বের এক শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডির নায়ক। রবীন্দ্রনাথের মধুসুদনকে ট্র্যাজিক যন্ত্রনা চিত্তের গূঢ় স্তরে নিহিত, কিন্তু ট্র্যাজেডির নায়কের গৌরব তাকে দেওয়া হয় নি, যদিও তার অপরাধ সামাজিক বিচারে কতটুকু? তার প্রতি করুনা বা সহানুভূতি বিতরণের প্রশ্ন ওঠে না, কারণ আদ্যন্ত তার কঠিন প্রতিষ্ঠা অবিচল, কিন্তু এর চারধারে মর্যাদার বাতাবরণ তৈরি করা হয় নি। ব্যবসায়ে লোকটা যথেষ্ট যোগ্য ও উঁচু মাপের হলেও পারিবারিক - সামাজিক ক্ষেত্রে সে একান্ত ক্ষুদ্রচেতা। আসলে তার স্রষ্টা-বিধাতার অভিশাপের মধ্যেই তার বিচরণ বলে এমন ঘটেছে, ফলে গল্পের ভেতরের তাগিদে সে নায়ক হলে উঠলেও তাকেপ্রায় ভিলেনের স্তরে নামিয়ে দিলেন লেখক। জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আদর্শবাদী লেখকের সন্ধি হল না।

ভাগ্যের উপরে মূলেই অনাস্থা মধুসূদনের, ভরসা তার পুরুষকারে, হিসেবী ব্যক্তিত্বে। তাকেই লেখক অনায়াসে অতীত - ভবিষ্যৎ -বক্তা জ্যোতিষিতে বিশ্বাসী করে তুললেন। ভাগ্যে বা সংস্কারে নয়, পৌরুষে গভীর আস্থা এই বণিক-পুঁজিপতিকে যেটুকু মহিমা দিয়েছিল তাই লেখক ধসিয়ে দিলেন।

মধুসূদনের চরিত্র প্রসঙ্গে আরও কিছু জরুরী কথা বলা যেতে পারে -

(১) রবীন্দ্র-উপন্যাসে এমন বেশ কয়েকটি চরিত্র পাই যারা ভিলেন হয়েও নায়কের মতো, কিংবা নায়ক হলেও ভিলেনোচিত। প্রতাপ রঘুপতি সন্দীপ মধুসূদন। এদের সকলের মধ্যে যে উপাদানটি সাধারণ তাহল প্রচন্ড দাপট। সেটা বাইরের জোর, ভিতর থেকে আসা পৌরুষের শক্তিও হতে পারে। এদের মধ্যে মধুসূদন সর্বোত্তম। কারণ তার কর্মক্ষমতা এবং সামাজিক মহিমা লেখক সযত্নে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সে নিঃসংশয়ে উপন্যাসের প্রধান পুরুষ, প্রতাপ-রঘুপতি-সন্দীপ নয়। বিপ্রদাস লেখকের আদর্শ মানুষ হলেও কাহিনীর সংযত-সংকটে তার প্রত্যক্ষ স্থান নেই, ভূমিকা যা আছে কুমুর মনের মধ্য দিয়ে।

(২) প্রতাপ ছাড়া অন্য তিনজন প্লটে বিরুদ্ধ শক্তি হিসেবে নিয়ে এসেছে বিপর্যয়, কিন্তু তাদের ব্যক্তিচিত্তের গভীরে চকিত বা নিয়ত দৃষ্টিপাত এমন পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে যাতে 'ভিলেনে'র ফর্মটা ভেঙে তারা ব্যক্তি হয়ে উঠতে চাইছে - কখন বা নায়ক, ট্র্যাজেডির নায়ক। মধুসূদনের দিকে ঠিকভাবে যদি লেখক তাকাতেন, কুমুর দৃষ্টিকোণে শুধু পর্যবেক্ষণ না করে, কচ্চিৎ ঔপন্যাসিকোচিত নিরপেক্ষতা দেখাতেন, তাহলেও মধুসূদনকে তার দোষে-গুণে পাওয়া যেত, তার

নিজস্ব যন্ত্রণা, প্রেমে কামে তার নিজস্ব ভাব ও যুক্তির পরিমন্ডল সত্য হয়ে উঠত।

(৩) মধুসূদনের মনের এমন পরিচয় স্বয়ং লেখকই দিয়েছেন যা লেখকের কাছ থেকে শিল্পীজনোচিত সহানুভূতি তথা সম্যক বিশ্লেষণের অপেক্ষা করে। মধুসূদন তা থেকে বঞ্চিত থেকেছে। সে হয়ত নূরনগরের চাটুজ্জেদের ওপর একহাত নেবে বলেই তাদের বংশে বিয়ে করেছিল। কিন্তু কুমু তার হৃদয়ের প্রবেশ করেছিল। হয়তো শ্যামার সঙ্গে তার নীতিবিগর্হিত সম্পর্ক আগেই ছিল, কিন্তু তা দেহকে ডিঙিকে মনকে ছোঁয় নি। পরের শ্যামা-সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী দেখে তো তাই মনে হয়,এই মধুসূদনও কুমুকে ভালোবাসেন। তার মত মানুষ যেরকম ভালোবাসতে পারে। কুমুকে বোঝা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের জোরের অংশটা সে চিনেছিল - জিদ বলে বুঝেছিল। জগতে ওই বস্তুটায় একমাত্র তার অধিকার জেনে এতকাল বসে ছিল। এটা নতুন দেখল। যে অস্ত্রে মানুষ জিদ করে জয়ী হয়, কুমুর ক্ষেত্রে তার কিছুই ছিল না। সে দেখল আর অবাক হল, বিরক্ত হল। লোভের বস্তু পাওয়ার জন্য মানুষের জিদ - কুমুর লেভটা কিসে সে হদিশ পেল না। বেশি ভাবল না, এসব ভাবার স্বভাব তার নয়। কিন্তু ভেতরে ভেতরে মুগ্ধ হতে লাগল আর বাইরে ক্রুদ্ধ। এস্রাজের ব্যাপারটা নিয়ে সে একটা কিছু অনুমান করেছিল, কিন্তু স্বভাবের অন্য নানা দিকের টানে তা দানা বাঁধার সুযোগ পেল না।

কুমু এমনিই মধুসূদনকে বুঝত না, যেটকু বুঝতে চেয়েছিল তার কিঞ্চিৎ ফল দু-একবার চকিতে দেখা দিয়ে মিলিয়ে গিয়েছিল। কুমুর মধ্যে আধ্যাত্মিক ধ্যানলীনতার যে স্তর ছিল তা মধুসূদন কেন, কারুরই বোঝাবার ব্যাপার নয়। কুমুর হৃদয়ের বাধার কতকটা সেই সংসারোর্ধ্ব চেতনার উৎসে জন্মেছিল। এই দম্পতির অমোঘ নিয়তি যদি মীরাবাঈসুলভ অতীন্দ্রিয় তৃষ্ণার সমতুল্য কিছু বাধার মুখোমুখি হয় তো, সংসারের মানুষ মধুসূদনকে নিরেট দেওয়ালে মাথা ঠুকে ফিরে আসতে হবেই।

সাংসারিক অংশটায় ফিরে আসা যাক। মধুসূদন কুমুকে যতটা বুঝেছিল, বুঝতে চেয়েছিল, কুমু কিন্তু ততটা চায়নি। প্রতিদিন, মধুসূদনের কথা ও কাজ তাকে বিকর্ষণ করেছে। এমন কি এস্রাজ এনে দেওয়ার বিষয়েও কোনো সানন্দ প্রতিক্রিয়ার উচ্ছাস প্রকাশ পায়নি। মধুসুদন তার অবস্থান থেকে অনেকটা এগিয়ে ছিল। তার মতো লোকের পক্ষে যে গতিতে যতটা এগোন সম্ভব। কাছের অন্য লেকেদের চোখে তা ধরাও পড়েছিল। মধুসূদনের মতো দাম্ভিক মানুষ কুমুর ইচ্ছার কাছে একাধিকবার হার মেনেছে। কুমু তার প্রথম দিনের প্রতিক্রিয়ায় যেখানে সরে গিয়েছিল, মনের দিক থেকে তা থেকে একটুও এগোয় নি।

মধুসূদনের মধ্যে কুমুর প্রতি ভালোবাসা প্রবল হয়ে উঠেছিল। তার নিদর্শন,

টিপ্পনী

টিপ্পনী

কুমুর বাপের বাড়ী চলে যাবার পরেই শ্যামাকে নিয়ে সে বাড়াবাড়ি শুরু করেছে, পারিবারিক লজ্জা-সম্ভ্রমের তোয়াক্কা রাখেনি । এযেন কুমুর উপরে এক রকম প্রতিশোধ নেওয়া। এর মধ্যে কুমুর ছবি নিয়ে সে যে কান্ড করেছে তাতে স্পষ্ট সে জানিয়েছে - তার জীবনে কুমু এবং শ্যামার প্রকৃত স্থান কোথায়। তার মতো লোক কুমুকে ফিরিয়ে আনবার জন্য তার বাপের বাড়ি গিয়েছে, এ ঘটনা তার আগ্রহ প্রমাণ করে। সেজন্য প্রত্যাখ্যান অত কঠিন করে বিঁধেছিল, এবং কুমু ফিরবে না শুনে সে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে গভির্নী কুমুদিনী ফিরে এল। স্ত্রী শুধু নয়, সন্তানও আসছে । সম্ভবত মধুসূদন পূর্ণ তৃপ্তি পেল । এর পরে হয়তো নিয়মিত জীবনের আবর্তন চলবে। কিন্তু তাই যদি হয় তো অকালমৃত্যু ঘটল মধুসূদনের, যে দ্বিতীয় মধুসূদন জন্ম নিচ্ছিল প্রেমের মধ্যে তার। অন্যভাবে দেখা যাক। মধুসূদন যেভাবে স্ত্রীকে ফিরে পেল সেভাবে কি চেয়েছিল, রোশনচৌকির স্বাগতম এর পেছন থেকে সেই সূচীতীক্ষ্ম যন্ত্রণা তো তার পাবার কথা।

রবীন্দ্রনাথ ট্র্যাজেডির এক সম্ভাব্য নায়ককে হারিয়েছেন মধুসূদনের মধ্যে - যে সম্ভাবনার অজস্র চিহ্ন তিনি নিজেই গ্রন্থমধ্যে ছড়িয়ে রেখেছেন।

বিপ্রদাস :

বিপ্রদাসের ভূমিকায় বংলাদেশের অস্তায়মান অভিজাত সংস্থৃতির গোধূলিশেষের রক্তরাগ পাঠকের হৃদয়ে করুণমধুর শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম জাগিয়ে তোলে। বিপ্রদাসকে দেখে মোতির মার মনে হয়েছেল -

> আহা কী সুপুরুষ । এমন কখনো চক্ষে দেখেনি ; ঐযে গান শুনেছিলাম কীর্তে - গোরার রূপে লাগল রসের বান -
>
> ভাসিয়ে নিয়ে যায় নদীয়ায় পুরনারীর প্রাণ,
>
> আমার তাই মনে পড়ল। ..... যেন মহাভারত থেকে ভীষ্ম নেমে এলেন বীরের মত তেজস্বী মূর্তি, তাপসের মত শান্ত মুখশ্রী, তার সঙ্গে একটি বিষাদের নম্রতা।

বিপ্রদাস ছিলেন পজিটিভিস্ট । বাইরের থেকে কোন দেবতাকে মানতে তাঁকে দেখা যায় নি বটে কিন্তু অন্তরের দেবতা তাঁর জীবন পূর্ণ করে রেখেছিল। তাঁর অসীম ধৈর্যে, তাঁর মুখের শান্ত বিষাদের ছায়ায়, তাঁ অন্তরের তপস্যা যেন জ্যোতি ; বিকর্ণ করত। বিপ্রদাস ভীষ্মের মতোই নিঃসঙ্গ ও ধৈর্যশীল। তিনি জানতেন পৃথিবীতে ধৈর্য্যের সাধনাই কঠিনতম সাধনা, তাই চরম দুঃখের দিনে তিনি কুমুকে উপদেশ দিয়েছিলেন -

লক্ষ্মী হয়ে শান্ত হয়ে যাক, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা কর, মনে রাখিস সংসারে সেও মস্ত কাজ।

বিপ্রদাসের ধর্ম অন্তরের পরম উপলব্ধিরত গভীর আনন্দের এবং গভীর বেদনার ধর্ম - গানের সুরের ধর্ম -রবীন্দ্রনাথের নিজের ধর্ম। বিপ্রদাস বলেছিলেন -

> কুমু, তুই মনে করিস আমার কোনো ধর্ম নেই। আমার ধর্মকে কথায় বলতে গেলে ফুরিয়ে যায় তাই বলিনি। গানের সুরে তার রূপ দেখি তার মধ্যে গভীর দুঃখ, গভীর আনন্দ এক হয়ে মিলে গেছে ; তাকে নাম দিতে পারিনে।

বিপ্রদাসের কাছে কুমু এই গানের সুরের দীক্ষাই লাভ করেছিল। সুরের সাধনায় বিপ্রদাসের মন সহজে মুক্তিলাভ করেছিল, কিন্তু কুমুর পক্ষে তা সহজে ঘটে নি। বাধা ছিল তার বালিকা জীবনের শিক্ষা ও নারীজীবনের সংস্কার। তবে শেষ পর্যন্ত দাদার প্রতি শ্রদ্ধায় ও ভালোবাসায়, মনের সহজ ভক্তিতে এবং গানের সুরের মাধুর্যে দেবতার আনন্দ-আবির্ভাবের উপলব্ধি তার হয়েছিল।

মায়ের মৃত্যুর পর কুমুদিনী বিপ্রদাসের সেবার ভার নিয়েছিল। বিপ্রদাসও কুমুদিনীকে হাতে গড়ে মানুষ করেছিল। তাই ভাই-ভগিনী পরস্পরের প্রতি অন্তরঙ্গ স্নেহ - মমতা ও শ্রদ্ধা ছিল। কুমুর কাছে বিপ্রদাস একসঙ্গে বাপ-মা ভাই ও গুরু, বিপ্রদাসের কাছে কুমুদিনী একাধারে মা, বোন, কন্যা ও ছাত্রী। কুমু চিরকালের মতো বিপ্রদাসের সংসারের থেকে দূরে চলে গেলে বিপ্রদাসের বেদনার অন্ত থাকল না। কুমুদিনীর দুঃখের পার আছে, তার সন্তান ভূমিষ্ট হলে তার মন ক্রমশ ভরে উঠবে। কিন্তু বিপ্রদাসের মন ভরবে কি সে। কালিদাসের নাট্যকাব্যে কণ্ব-শকুন্তলার বিচ্ছেদ এমনি সুগভীর বিষাদময়। সংসারের দাবি নিঃস্বত্বভাবে ত্যাগ করে অথচ সকল দায় মাথায় নিয়ে এই যে রোগশীর্ণ একলা মানুষটি তাঁর স্নেহের একমাত্র পাত্রকে নিঃস্নেহ নির্মম লাঞ্ছনার মধ্যে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন, তার অন্তরের অতল স্পর্শ শূন্যতায় যোগাযোগের পরিসমাপ্তি সকরুণ অশ্রুত রাগে গুঞ্জরিত।

বিপ্রদাস যে জমিদারতন্ত্র - লালিত পরশ্রমজীবী বিশ্রামভোগী মানুষ, তার কুস্তির চর্চায়, এস্রাজবাদনে, সঙ্গীত সাধনায়, তার বন্দুকবিলাসে, মৃগয়ায়, অশ্বপালনে ঔপন্যাসিক সে পরিচয় ভালোভাবে রেখেছেন। কুমুর বিয়ের রাজকীয় আড়ম্বর তার সম্মতি ছাড়া ঘটে নি। ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনে ব্যয়ের মাত্রা কমানো, কলকাতায় বাসা নেওয়া -এসব কিছুর পিছনে তার পড়তি অবস্থাই দায়ী, জমিদারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধতা কোথাও নেই, আধুনিক শিক্ষার মর্মকে স্পর্শ না করেই কিন্তু 'হালদারগোষ্ঠীর' বনোয়ারিলাল ঐ বিরুদ্ধতা করেছিল নিজের সুখভোগের মূল্যে। বিপ্রদাস সে রকম কিছু ভাবেনি বলে আমাদের অভিযোগ নেই। বিপ্রদাস, বিপ্রদাস।

টিপ্পনী

সে জমিদারী ব্যবস্থার চাটুজ্জে বংশের অবক্ষয়িত পুরুষ, এর মহিমায় তার প্রশ্ন নেই। কাহিনীর শেষে সে কুমুকে বলেছে -

> খুব শীঘ্রই আমাদের কাল বদল হবে, আমাদের চালও বদলাবে। আমাদের থাকতে হবে গরীবের মতো।

টিপ্পনী

পারিবারিক অনিবার্য অবক্ষয়ের মধ্য দিয়ে এটা যে বুঝেছে। এর মধ্যে কালের যাত্রা অনুধাবনের বা তার স্বেচ্ছাসঙ্গি হবার কোন ইঙ্গীত নেই।

বিপ্রদাস তার শ্রেণী পরিচয় সুস্থিত। বিপ্রদাসের চিন্তার দিগন্ত কিন্তু জমিদারীর মধ্যযুগকে পেছনে রেখে অনেক পা এগিয়ে। তার কোনো সংস্কার নেই, শাস্ত্রবদ্ধ ধর্মে নেই আস্থা, উদার ও যুক্তিবাদী মানবধর্মে তার চিত্তের বিস্তার।

নারীমুক্তি বিষয়ে তার নবীন বোধ সাম্প্রতিক কালের ইংরেজি শিক্ষার ভূমিতে জন্মানো। সতীত্বের নাম করে মেয়েদের উপরে অসম্মানের বোঝা চাপানো - তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শোনা যায় বিপ্রদাসের কণ্ঠে। কাহিনীতে একটা গোটা অধ্যায় (৫০নং) এই কাজেই লেগেছে। অন্যত্রও আছে। লাঞ্ছিত বোন কুমুর সূত্র ধরে কথা উঠলেও গোটা নারী-জাতের অবস্থা ও ভাগ্য ছিল তার বিবেচ্য। মেয়েদের সম্বন্ধে ঐ মনোভাবটা বিশেষ করে মধ্যযুগের, তাতে অন্য স্তরের মানুষজন থাকলেও সমাজপ্রধান হিসেবে জমিদারদের ভূমিকাটাই ছিল বড়। বিপ্রদাসের ভাবনার ধারা একেবারে বিপরীত। বলা যায়, মানবমুক্তির যে ধারণা বুর্জোয়া সভ্যতার, তার অংশ হিসেবে নারীর প্রতি সম্মাননা অঙ্কুরিত। জমিদার বিপ্রদাস এখানে যে চিন্তার দায় বহন করেছে তা মধুসূদনের কৃত্য ছিল। শ্রেণীগত অবস্থানের দিক থেকে নারী প্রসঙ্গে চিন্তার ক্ষেত্রে এরা স্থান বদল করে নিয়েছে। উপন্যসের দুই প্রধান পুরুষই ব্যক্তিগতভাবে এমন ভাবনা-চেতনাকে আশ্রয় করেছে যা তাদের শ্রেণী-পরিচয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

এখানে আর এক জমিদারের কথা মনে পড়বে। লেখকের ঠিক আগের উপন্যাস 'ঘরে বাইরে'র নিখিলেশ বিপ্রদাসের থেকেও এক কদম এগিয়ে গিয়েছিল। সে তার স্ত্রীর প্রেমে পূর্ণতার স্বাদ পায় নি, কারণ সেটা দাম্পত্যের বাঁধা পথের বাধ্যতামূলক মনোভাব। বাইরের পৃথিবীতে বেরিয়ে তুলনা আর বিচারের মধ্য দিয়ে স্বাধীন নির্বাচনে নারী যদি স্বামীকে হৃদয়ের মধ্যে পায় তবেই তা সত্য ও সার্থক। রবীন্দ্র-উপন্যাসের দুই প্রধান জমিদারই মনোভাবের দিকে থেকে অত্যাধুনিক - আশ্চর্যভাবে সামন্ততন্ত্রবিরোধী।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
142

বিপ্রদাস কিন্তু গর্ভিনী কুমুকে স্বামীগৃহের অপমানের মধ্যে ফিরে যেতে পরামর্শ দিয়েছিলেন, যা তার পূর্বোক্ত ভাবনার দিক থেকে একেবারে অন্য কোটির।

তিনি বলেছেন - তোকে নিষেধ করতে পারি এমন অধিকার আর আমার নেই। তোর সন্তানকে তার নিজের ঘরছাড়া করব কেন স্পর্ধায় ?

এই বক্তব্য ব্যক্তিতন্ত্রের বিরুদ্ধে পারিবারিক আদর্শবাদের এবং সেই আদর্শবাদ লালিত সামন্তবোধের মহলে। রবীন্দ্রনাথের বিপ্রদাস জমিদার হয়েও বুর্জোয়া সুলভ স্বাধীনচিত্ততা ও নরনারীর ব্যক্তিমুক্তির মন্ত্রে বিশ্বাসী, এবং তা সত্ত্বেও নারীর জননীত্বকে চূড়ান্ত সত্য মনে করে ফিরে আসে পুরোন ধারণার আবর্তে।

বিপ্রদাসের চরিত্র একদিকে ক্ষয়িত জমিদারী আভিজাত্যের অনেক কিছুই অবশিষ্ট। চিন্তার ক্ষেত্রে সে বুর্জোয়া লিবারেল। নিজেকে মনে করে পজিটিভিস্ট। অবশ্যই চতুরঙ্গের জ্যাঠামশায়ের মতো নয়। তার মধ্যে হিতবাদের কর্মকান্ড বা মানসিকতার পরিচয় নেই। বিপ্রদাস সেই শ্রেণীর মানুষ, রবীন্দ্রনাথ কোনো আদর্শবাদের মূর্ত্তি হিসেবে যাদের গড়তে চাইতেন, এবং প্রায় প্রতিটি উপন্যাসে যাদের জন্য একটা জায়গা রেখে দিতেন। কোথাও তারা কাহিনীর কেন্দ্রে, কখনও বা প্রান্তে। এ জাতীয় চরিত্রে রক্ততরঙ্গবেগ কম থাকারই কথা। তবে বেশি নীরক্ত হলে মানব ব্যক্তি হিসেবে তার বিশ্বাসযোগ্যতা কমে যায়। বিপ্রদাস প্রাণোত্তাপহীন তত্ত্বমাত্র নয়।

বিপ্রদাস নিস্ক্রিয় নিরুপদ্রব মানুষ। নিষ্ক্রিয়তাকে সক্রিয়তার অভাব বলে গণ্য না করে, একটা ইতিবাচক ধর্ম বলে মনে করা যেতে পারে। আসলে সে ভাবুক প্রকৃতির। এককালে তার বন্দুক হাতে শিকার করাটা গল্প কথা মনে করা যায়। আর তার জানলার ফ্রেমে বহিঃপ্রকৃতি। প্রকৃতির যে কোনো মামুলি রূপ হলেও ক্ষতি নেই - হোক শূন্য আকাশ। আসলে সে থাকে মন নিয়ে। স্পষ্ট অর্থে ধরা দেয় না যে এস্রাজের সুর, তাই নিয়ে। ছোটগল্পে কিছু পেলেও উপন্যাসে এই প্রথম একটা 'একা' মানুষের ছবি পাওয়া গেল রবীন্দ্রনাথে।

কিন্তু একা (লোনার) মানুষ বিশ্ববিধানের জন্যই মাটিতে শিকড় ছড়াতে চায়। কুমু বিপ্রদাসের মনের শিকড় ছড়াবার বাসনা। ভাই বোনের স্বাভাবিক সাংসারিকতায় এই তাৎপর্য বিশিষ্টতা এনেছে।

বিপ্রদাস কুমুর কথায় সমাজে নারীর নিপীড়িত অবস্থানের প্রসঙ্গ তুলে উত্তেজনা প্রকাশ করেছে। বুর্জোয়া লিবারেল মন ইমানসেপেশন অফ উইমেনের কথা ভাবতেই পারে, বিশেষ করে নিজের ব্যাথার মধ্য দিয়ে যদি আসে। এর পরে স্বাভাবিক ভাবেই তাকে রায় দিতে হয়। কুমু স্বামী গৃহে না যেতে চেয়ে ঠিক কাজ করেছে, যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু কুমু গর্ভিনী শুনেই তার মত বদলে গেল। মারীচের তপোবনে সপুত্র শকুন্তলার দুখন্ড মিলন নিয়ে 'জায়া - জননী' সংক্রান্ত যে সব তত্ত্ব অনেককাল আগে তিনি তৈরি করেছিলেন তার প্রবক্তা হয়ে উঠল বিপ্রদাস। তবে

টিপ্পনী

এই তত্ত্বজ্ঞ একটা গাঢ় বিষণ্ণতার শিকার, নির্বিকার মহাপুরুষ নন - ফলে পরণতিতে মানুষটি কতকটা বাঁচল।

অপ্রধান চরিত্র :

টিপ্পনী

যোগাযোগের চরিত্রদের প্রাধান্য তথা গুরুত্ব বিবেচনার এইভাবে সাজানো যেতে পারে -

(১) প্রধান নরনারী : কুমুদিনী, মধুসূসদন

(২) মুখ্য সহযোগি চরিত্র : বিপ্রদাস

(৩) গুরুত্বপূর্ণ অন্য সহযোগীরা : মোতির মা, নবীন, শ্যামা।

পুরনো দুটি উজ্জ্বল মানুষ - মুকুন্দলাল এবং নন্দনারী।

(৪) অন্যান্য যারা কাহিনী ও অন্য প্রধান চরিত্রকে কিছু সাহায্য করেছে : কুমুর বিয়েতে দুপক্ষের লোকেদর দঙ্গল। মধুসূদনের কোম্পানীর লোকেরা। বিপ্রদাসের বিলেত পড়ুয়া ভাই, সাবেক কর্মচারী কালু, পিসি প্রমুখ আত্মীয়তা, অল্প হলেও মনে থাকার মতো ভন্ড জ্যোতিষী। খানিক জায়গা জুড়ে বালক গোপাল। এরা গল্পের প্রয়োজন শুধু মেটায়নি, চরিত্র হিসেবেও একেবারে ঠিকঠাক। জীবনও সমাজ থেকে নেওয়া এবং ভাষায় তাদের ধরে রাখা। এ জাতীয় চরিত্রগঠনে রবীন্দ্রনাথ কখন স্খলিত হননি। বহুলতায় এদের বৈচিত্র্য চাপা পড়েনি। অনেক সময়েই স্বভাবের এমন জায়গা স্পর্শ করেছেন যাতে লোকটি যেন কথা বলে উঠেছে। বিশেষভাবে এই উপন্যাসের বেলায় নয়। সাধারণত 'চোখের বালি' থেকে শুরু করে কোথাও ছোট পাত্র-পাত্রীরা সৃষ্টি সাফল্যকে বিচলিত করে নি। ছোটগল্প রচনাকালীন তাঁর জীবনের বৈচিত্র্যে ব্যাপক দৃষ্টিপাত এই সাফল্যের উৎসে বলে মনে করি।

গৌণ পাত্রপাত্রীর মধ্যে নভেলের অর্থনেতিক পটভূমি আলোচনার সূত্রে মুকুন্দলালের কথা অনেকটা বলা হয়েছে। তার পত্নীর প্রতি প্রবল অভিমানে নির্জল মদ্যপানে অসুস্থ হয়ে মারা যাওয়াও অবিশ্বাস্য নয়। কিন্তু সেই মৃত্যুর বর্ণনা বানিয়ে তোলা মনে হয়। নন্দরানীর দর্পিত ব্যাক্তিত্ব প্রেম অভিমান, এমন কি স্বামীর বাইজী নাচানো মেনে নেওয়া এবং না-নেওয়া সব মিলে একটা সঙ্গত পূর্ণতা থাকলেও তার পতন ও মৃত্যু অতিনাটকীয়।

তবে 'যোগাযোগ' উপন্যাসে প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ যার মধ্যে প্রথম দেখা যায় তিনি নন্দরানী, কুমুর মা। যাকে 'আত্মবিসর্জন' বলাই শ্রেয়।'পুনরাগমনায়চ' এর কোনো সম্ভবনা শেষ পর্যন্ত সেখানে ছিল না। পাতিব্রত্যে প্রতিবাদের জায়গায়

নিজেকে শেষ করলেন। কুমুদিনীর বাবা মুকুন্দলাল টিপিক্যাল অভিজাত জমিদার - 'মুকুন্দলালের জীবন দুই মহলা। এক মহলে গার্হস্থ্য, আর এক মহলে ইয়ারকি। অর্থাৎ এক মহলে দশকর্ম আর এক মহলে একাদশ অকর্ম। ঘরে আছেন ইষ্ট দেবতা আর ঘরের গৃহীনি। সেখানে পূজা - অর্চনা, অতিথি সেবা, পালা-পার্বণ, ব্রত উপাস, কাঙলি বিদায়, ব্রাহ্মণ ভোজন, পাড়াপড়শী, গুরু-পুরোহিত,। ইয়ার মহল গৃহস্বামীর বাইরেরই, সেখানে নবাবি আমল, মজলিসি সমারোহে সরগরম । এইখানে আনাগোনা চলত গৃহের প্রত্যন্ত পুরবাসিনীদের। তাদের সংসর্গকে তখনকার ধনীরা সহবত শিক্ষার উপায় বলেই গণ্য করত । দুই বিরুদ্ধ হওয়ার দুই কক্ষবর্তী গ্রহ-উপগ্রহ নিয়ে গৃহিণীদের বিস্তর সহ্য করতে হয়।'

নন্দরানী তার স্বামীর টিপিক্যাল জমিদারিক স্বভাবের তথাকথিত সামাজিক রীতি নীতির মধ্যে মান্য যতটুকু একটা সময় পর্যন্ত ততটা মান্য করেছেন। অন্তর্লীন দাম্পত্য না থাকলেও সামাজিক দাম্পত্যকে মেনে নিয়েই চলেছিলেন। কিন্তু যখন বিষয়টি আত্মসংযমের অভাবে অসামাজিকতার যে রীতি-নীতি তার অতিরেকে গিয়ে পৌঁছয় তখনই নন্দরানী আত্মসম্মানের উপর চরম আঘাত হানেন , এবং চূড়ান্ত পরিণামে গিয়ে তা পৌঁছয়। বস্তুত নন্দরানীর মৃত্যু থেকে কুমুদিনীর বিবাহ পর্যন্ত সময়কাল;এর মধ্যে ব্যবধান 'ন' বছরের থাকা স্বাভাবিক। সুতরাং নন্দরানীর সময় কাল পিছিয়ে যায় ১৮৮৫ তে। এই কালগত প্রেক্ষাপটকে মনে রাখা প্রয়োজন এই কারণেই যে নন্দরানী যে সময় তার স্বামীর লাম্পট্যকে নীরবতায় প্রতিবাদ করেছেন প্রশ্নটা এইখানেই ওঠে, সেই সময়ের কোন নারীর এই প্রতিবাদের মন ছিল কিনা - সচেতনতা ছিল কিনা। কারণ যে আচরণ বলতে গেলে সামাজিক প্রথার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে তাকে প্রতিবাদের প্রশ্নটাইতো তখন অবান্তর। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তো গড় মানুষের কথা নিয়ে ভাবিত ছিলেন না। তিনি যে নিভৃত প্রাণের দেবতা সন্ধানী, যে গড় অতিক্রান্ত সচেতন ব্যাক্তিত্বের সন্ধানী সেখানেই তোক তাঁকে পৌছতে হবে। তাছাড়া নন্দরানী -মুকুন্দলাল উপকথা আমাদের মনে করিয়ে দেয় দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং দিগম্বরী দেবীর জীবনকথা । তিনিও নিশ্চয়ই নিজের পরিবারে শুনেছেন পিতামহী দিগম্বরী দেবীর প্রতিবাদকে। সুতরাং এই আচরণের চৈতন্য তথা বাস্তবতা নিয়ে তাঁর তো আলাদা ভাবনার দরকারই ছিল না।

'যোগাযোগ' উপন্যাসের সুবোধ বিপ্রদাসের ভাই হয়েও প্রকৃতিতে একেবারেই আলাদা। একদা সম্পন্ন চাটুজ্যে পরিবার আপাতত পূর্বপুরুষের দেনার দায়ে আর্থিক অবক্ষয়ের চূড়ান্ত সীমায় দাঁড়িয়েছে। পরিবারের বর্তমান অধিকর্তা বিপ্রদাস সেই আর্থিক দৈন্যের দায় বহন করেছেন। অন্যদিকে তাঁর ছোটোভাই সুবোধ বিলেতে পাড়ি দিয়ে নিজের আকাঙ্ক্ষার সোপানগুলো ধীরে ধীরে উত্তীর্ণ হতে চাইছে। নিতান্তই বিবেকহীন তার অর্থনৈতিক চাহিদা। উপন্যাসের নবম পরিচ্ছেদে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

আমরা বিপ্রদাসকে লেখা সুবোধের একটি চিঠি পাই যেটি বিপ্রদাসের মাথায় ব্রজাঘাত করেছে। বিলেতে গিয়ে প্রথম প্রথম সুবোধ হিসেব করেই খরচা চালাত, বাড়ির দুঃখের কথা তখনও তার মনে সজাগ ছিল। কিন্তু যতই দিন গেছে ততই পারিবারিক সঙ্কট তার মনের মধ্যে ফিকে হয়েছে। আর ততই তার চাহিদা বেড়েছে। চিঠিতে সুবোধ জানিয়েছে - "বড় রকম চালে চলতে না পারলে বিদেশে সামাজিক উচ্চশিখরে পৌঁছানো যায় না। আর তা না গেলে বিদেশে যাওয়াটাই অর্থহীন।" ইতিপূর্বে বিপ্রদাস কয়েকবার ভাইয়ের আর্থিক দাবি পূরণ করেছেন। এবার দাবি এসেছে - হাজার পাউন্ডের জরুরি দরকার। অনেক ভেবেচিন্তে বিপ্রদাস ভাইকে জানালেন - টাকা পাঠাতে হলে কুমুর বিবাহের জন্য সংরক্ষিত অর্থে টান পড়বে। সুতরাং তা করা অসম্ভব। উত্তরে সুবোধ জানায় - কুমুর পণের টাকা সে চায় না। কিন্তু পারিবারিক সম্পত্তিতে তার নিজের প্রাপ্য অংশ বিক্রি করে যেন টাকা পাঠানো হয়। সঙ্গে সুবোধ পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি পাঠাতেও ভুল করে নি। বিপ্রদাসের পরিবারে মানবিক মূল্যবোধের একটা প্রশস্ত আঙিনা বিছানো ছিল। ঔপন্যাসিকের নৈতিক সমর্থনও ঔদিকেই নিবদ্ধ। কিন্তু সময়ের ভাঙনকে তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি। প্রবাসী সুবোধের এই আচরণ সেই ভাঙনের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। বিপ্রদাসের জীবন কর্তব্যের যাবতীয় বোধে পরিপূর্ণ। আধুনিক সভ্যতার ভাগ্যান্বেষী আত্মপরায়ণ সুবোধ তাঁর মূল্য বুঝতে চায় নি। তাই তার ফ্যাশানের চাহিদা পূরণের জন্য সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারায় তার হিসেবিপনার অন্ত নেই। সাবেকি মর্যাদাবোধের চেয়ে নিজের সুখ এবং সমৃদ্ধির মূল্য তার কাছে অনেক বেশি। সুবোধের এই চিঠি বিপ্রদাসের স্নেহপ্রবণ হৃদয়ে বাণের মতো বিঁধল। নিজের তালুক বিক্রি করে তিনি টাকা পাঠালেন সুবোধকে। কুমুর গায়ের গয়না বিক্রি করার প্রস্তাব স্বাভাবিক কারণেই তাঁর কাছে অগ্রাহ্য হয়েছে। আসলে বিপ্রদাসের মধ্যে আদর্শ আর সুবোধের মধ্যে আদর্শচ্যুতি প্রকাশ পেয়েছে এভাবেই।

মধুসূদনের পরিবারের আশ্রিত নারী শ্যামাসুন্দরী। শ্যামার মতো পারিবারিক মূল্যবোধহীন কামবিকারগ্রস্ত নারীর চরিত্রাঙ্কনে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ এবং সাফল্য এই প্রথম। বিনোদিনী - দামিনীর সঙ্গে এর অনেক পার্থক্য। শ্যামার হৃদয়হীন দেহসর্বস্বতা, মধুসূদনকে আয়ত্ত করে সুখভোগ, সাংসারিক কতৃত্ব পাওয়া যাবে - এরূপ ধারণা তার ছিল। অবশ্য অল্পদিনে সে বুঝেছিল মধুসূদন নেহাত বিকারে তাকে প্রশ্রয় দিলেও সুখ বা কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ তারই নিয়ন্ত্রণে, শ্যামাকে পরিণত হতে হয়েছে তুচ্ছ ক্রীড়নক। মধুসূদন সম্পর্কে শ্যামার দেওর। পরিণত বয়সী আঁটোসাঁটো গড়নের শ্যামবর্ণ সুন্দরী বিধবা। মধুসূদনের প্রতি শ্যামার আসক্তির কথা রবীন্দ্রনাথ বেশ স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন। যা মধুসূদনের বোধগম্য ছিল।কঠিন পরিশ্রমের মাঝখানে চোখের দেখায় কানের শোনায় শ্যামার যে সঙ্গটুকু নিঃসঙ্গ ভাবে পেত

তাতে যেন মধুসূদনের ক্লান্তি দূর করত। ক্রিয়াকর্মের পার্বনী উপলক্ষ্যে শ্যামাসুন্দরীর দিকে তার পক্ষপাতের ভাবটা একটু যেন বেশি করে ঝুঁকত বলে বোঝা যায়' - কিন্তু হয়তো বা নৈতিক বিবেচনার বৃত্ত থেকে কিংবা বলা ভাল চারিত্রিক অহং থেকেও উপেক্ষা করেছিল সেই আসক্তিকে। কিন্তু কুমুদিনীর সঙ্গে দাম্পত্য যাত্রায় ক্রমাগত পরাভূত হতে হতেই মধুসূদন নিজেকে যে আধিপত্যের ভূমিতে দেখতে চাইছিল তার একমাত্র মাধ্যম তখন শ্যামাসুন্দরী - 'কুমুর কাছ থেকে যে উপেক্ষা পেয়েছে তার ক্ষতিপূরণের ভান্ডার অন্য কোথাও জমা আছে এটুকু সে বুঝে নিলে। ভালোবাসার ভিতর দিয়ে মানুষ আপনার যে পরমমূল্য উপলব্ধি করে, আজ রাত্রে সেই অনুভব করবার প্রয়োজন মধুসূদনের ছিল। শ্যামাসুন্দরী সমস্ত জীবন মন দিয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করে আছে সেই আশ্বাসটুকু পেয়ে মধুসূদন আজ রাত্র কাজের জোর পেলে, যে অমর্যাদার কাঁটা ওর মনের মধ্যে বিঁধে আছে তার বেদনা অনেকটা কমিয়ে দিলে।'

শ্যামাসুন্দরীর দিক থেকে কিন্তু প্রতিবাদের ভাষ্য অনেক বেশী তীব্র। পরিস্থিতি তার পক্ষে প্রতিকূল, কারণ এই ক্রিয়াকান্ডের ধারায় পারিবারিক বৃত্তে চরম ভাবে আক্রান্ত হবে, অপমানিত হবে শ্যামাসুন্দরীই - "এ বাড়িতে শ্যামার স্থান পূর্বের চেয়ে আরো সংকীর্ন হয়ে গেছে। কোথাও একটুও স্বচ্ছন্দতা নেই।" কিন্তু শ্যামাসুন্দরীর দিক থেকে এই প্রতিবাদ ছাড়া তার আর কোন গত্যন্তর যেন বা ছিল না। তার কারণ সংসার বৃত্তে যথার্থভাবে তার আশ্রয় একমাত্র মধুসূদনেরই অনুগ্রহ বা আনুগত্য। তাকে একটি নিশ্চয়তার বা নির্ভরতায় পৌঁছে দেবার জন্য এবং বৈধব্যশাসিত জীবনে তার নিজেরও প্রাপ্তিযোগের অধিকারের প্রশ্নে শ্যামাসুন্দরী যে সিদ্ধান্তে এগোল তা ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি শাসিত সমাজ বিধানের বিরুদ্ধে এক দুর্মর প্রতিবাদ। শাস্ত্র দেখিয়ে বা যুগযুগ ধরে চলে আসা মেয়েদের সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে যেমন কিছু সম্পাদক সমাজের গতিকে থামিয়ে রাখতে চেয়েছেন, পাশাপাশি যেন কিছু মানুষ কিন্তু কলম ধরেছিলেন মেয়েদের বিভিন্ন কামনা বাসনাকে স্বীকৃতি জানাতে। বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত অথবা নয় - এ নিয়ে বহু তর্ক হয়েছে। শাস্ত্র নিয়ে বাদানুবাদের ফাঁকে আর একটি প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে সমাজকে। বিধবা হলেই তো মেয়েদের শারীরিক কামনা বাসনা উবে যায় না। তা হলে ? "বিজ্ঞ লোকেরা বিধবাদের বিবাহের জন্য বারম্বার উপদেশ প্রদান করিতেছেন। বিশেষত শস্ত্রে আছে বিধবারা বিবাহ করিতে পারেন, তথাপি একগুয়াঁ হিন্দুরা শাস্ত্রের অভিপ্রায় গ্রহণ করিবে না, তাহারা মহাল ইন্দ্রিয় দলকে হাত বুলাইয়া শান্ত রাখিবে ....." (সম্বাদ রসরাজ, ১৫.৫.১৮৪৯)।

বিদ্যাসাগরও একই কথা শুনিয়েছিলেন - "তোমরা মনে কর পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়, দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না;

টিপ্পনী

টিপ্পনী

দুর্জয় রিপুগণ এককালে নির্ম্মূল হইয়া যায়। কিন্তু তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছে।'- বিধবার এই সামাজিক অধিকারহীনতার প্রতিই যেন শ্যামাসুন্দরীর প্রতিবাদ। শেষ পর্যন্ত শ্যামা বৈধব্যের সেই সীমা লঙ্ঘন করেছে তার গন্ডী থেকে সে বেরিয়ে গেছে। শ্যামার লাল শাল ব্যবহার প্রতিবাদের একটা ধরন হতে পারে। বুঝতে হবে যে মধুসূদন-শ্যামাসুন্দরীর সম্পর্কের মধ্যে অধিকার ও আত্মতোষের বৃত্তটি কুমুদিনীর ব্যক্তিত্বের কাছে পরাভবের কারণজনিত আশ্রয়। রবীন্দ্রনাথ খাঁটি শিল্পীর মতো শ্যামাকে আশ্রয় করে খানিকটা স্খলনের ছবি এঁকেছেন এবং সাফল্যের সঙ্গে।

নবীন সপরিবারে রূঢ়কঠিন দাদার অন্নদাস। রজবপুরে নিজস্ব সামান্য জমি চাষ করিয়ে খুব দুঃখে জীবন কাটাবার কষ্টটা এড়াতে গেলে এভাবেই তাকে চলতে হবে, সে বোঝে। দোর্দন্ডপ্রতাপ দাদাকে চটিয়ে সেখানেও রেহাই মিলবে না - এ সত্য তার অজানা নয়। তার কালিদাস - পড়া প্রাণ হাঁফিয়ে উঠলেও বাস্তবে মুক্তি নেই। তাই বাক্যে কৌতুকের ফুলঝুরি উড়িয়ে সে খাঁচাটাকে রঙিন করে তোলে। সে দাদার স্বভাবের দুর্বলতা জানে বলেই মাঝে মাঝে সেখানে খোঁচা দিয়ে শক্তিমানকে নিয়ে খেলা করার আনন্দ পায়। কুমুদিনী তাদের সংসারে এলে নবীন যেন মূর্তিমতি মুক্তিকে সামনে দেখতে পেল। তার দাদার অত প্রচন্ড জোরও তাকে বাঁধতে পারে নি। কুমুর প্রতি নবীনের শ্রদ্ধার উৎস এখানে, সে-কারণে মামুলি দেবর-বউদির সম্বন্ধ ছাপিয়ে তা উপরে উঠছে।

নবীন এবং নিস্তারিনী ওরফে মোতির মা'র দাম্পত্যকে 'অ্যাভারেজ' দাম্পত্য বলা যায় না। তারা মধুসূদনের পরিবারে আশ্রিত হয়েও কুমুদিনীর জীবনের চাওয়া-পাওয়া সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে ফেলে কখনো কখনো মধুসূদনের বিপক্ষে প্রতিবাদী হতে দ্বিধাবোধ করে নি একথা জানা সত্ত্বেও যে 'মধুসূদনের কথার অন্যথা ঘটলে তাদের নিরাপদ জীবনযাত্রায় ইতি পড়তে পারে।' মধুসূদনের একনায়ক তন্ত্রের সরাসরি প্রতিবাদ তাদের পক্ষে সম্ভব না হলেও তার সমস্ত চিন্তাভাবনার শরিক হয়নি তারা। প্রচ্ছন্ন কৌশলে প্রতিবাদ করে চলেছে নবীন।

মোতির মায়ের চোখ মন সাধারণ সাংসারিকতায়, বিশেষ করে মধুসূদনের সংসারের নিরতিশয় সংকীর্ণতায় পুরো মরে যায় নি, বিপ্রদাসের ব্যক্তিত্বের দেবোপম ঔজ্জ্বল্য কিছুটা অনুভব করার শক্তি তার ছিল। কুমু ঘরে এলে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের লড়াইটার পুরো তাৎপর্য যদি সে নাও বোঝে, এইটুকু দেখেছিল - শক্তির অন্যায়, যাতে সে নিজেও পীড়িত তা কুমুর প্রতিস্পর্ধায় বিচলিত হয়ে পড়েছে। মমত্বে ও সখীত্বে তাকে কুমুর কাছে নিয়ে ফেললেও কখনও তাকে মনস্তত্ত্বের বাস্তবভূমি থেকে সরিয়ে স্রষ্টার কাছাকাছি এনেছেন, যখন সে অনুভব করেছে এই দেবীকল্প

নারীর সঙ্গে মধুসূদনের মতো মানুষের মিলন একটা দুর্ঘটনা ছাড়া কিছু নয়, তখন কিন্তু চরিত্রটির বাঁধুনি আলগা হয়ে পড়ে। কুমু যখন স্বামীগৃহে ফিরবে না স্থির করল, মোতির মা কিন্তু তাকে দেমাকের বাড়াবাড়ি মনে করেছে, স্বামীর সঙ্গে তার বোধের পার্থক্য ঘটেছে। সে কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ বধূর মতোই এর বিচার করেনি - তার বক্তব্যের সঙ্গে পরমপ্রিয় কুমুর সান্নিধ্য হারাবার শঙ্কাজনিত ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। সে পুরো না বুঝলেও অনুভব করেছিল বড়বউ তারও জীবনে এনেছে বুকভাবে নিশ্বাস।

টিপ্পনী

কুমু এবং মোতির মায়ের Tuning এর নয়, তথাপি মধুসূদনের বাড়িতে কুমুর সামান্যতম বাঁচবার অবকাশ ছিল এই যুগলের সাহচর্য এবং সখ্যের মধ্যেই। মোতির মা'র অনুভবী মন প্রথমেই অনুভব করে কুমুর স্পর্শকাতর হৃদয়ের সবচেয়ে কাছের মানুষ তার দাদা বিপ্রদাস। আবার সে বিপ্রদাস সম্পর্কে মোতির মা তার অনুরাগকে কুমুর কাছে অন্তরঙ্গতায় প্রকাশও করে - "আহা কী সুপুরুষ। এমন সুপুরুষ কখনো চক্ষে দেখিনি। ওই যে গান শুনিয়েছিলাম কীর্তনে -'গোরার রূপে লাগল রামের বাণ / ভাসিয়ে নিয়ে যায় নদীয়ার পুরনারীর প্রাণ।' কিংবা যখন শোনা যায় - "এই ভালোবাসার পূর্ব ভুমিকা হয়েছিল স্টেশনে যখন সে দেখেছিল বিপ্রদাসকে যেন মহাভারত থেকে ভীষ্ম নেমে এলেন। বীরের মত তেজস্বী মূর্তি, তাপসের মতো শান্ত মুখশ্রী, তার সঙ্গে একটা বিষাদের নম্রতা। মোতির মা'র মনে হয়েছিল কেউ যদি কিছু না বলে তবে একবার ওর পা দুটো ছুঁয়ে আসি। সেই রূপ আজও সে ভুলতে পারেনি।' অকপটে মোতির মা'র 'পরপুরুষ' সম্পর্কে এই মনোভাবের স্বীকারোক্তি কি ঔপন্যাসিকের নারীর স্বাধীন মতামত প্রকাশের সপক্ষেই রায় দেয়?

কুমুর সঙ্গে মধুসুদনের মানসিক অসহবস্থানের মূলে কোন্ সত্য অন্তর্নিহিত, মোতির মা'র মুখেই এসেছে এই অন্তর্নিহিত অমোঘ সত্য - 'এরকম জাতিভেদ আছে যা সমাজের নয়, যা রক্তের - সে জাত কিছুতে ভাঙা যায় না।' ফুল শয্যার দিনেও কুমুকে সেই আড়াল করে, শক্তি জোগায় 'ভয় করিস না ভাই,ভয় করিস নে।' মধুসূদনের বাড়িতে থেকে মধুসূদনের কাজের প্রতিবাদ করতে থাকে শুধুমাত্র কুমুকে ভালোবেসেই।

নবীন সেই পুরুষ যে, নারীকে সম্মান করে, সংকটে পাশে রাখে। মোতির মা যাকে শ্লেষে 'স্ত্রৈণ' বলে উপহাস করে, সমাজের দিকেই যেন আঙুল তোলে। নবীনের প্রতিবাদ মধুসূদনের একদেশদর্শিতার প্রতি। দক্ষ সফল ব্যবসায়ী হিসাবে মধুসূদনের বুদ্ধিকে সে শ্রদ্ধা করে। আবার তার বিচক্ষণতা নিয়ে মনে প্রশ্নও জেগে ওঠে নবীনের মনে গুরুজির কাছে যাওয়ার প্রসঙ্গে মধুসূদন বিশ্বাসী হয়ে ওঠে তার

টিপ্পনী

সংকটের মূলে, সর্বনাশের মূলে আছে কুমুদিনী। কিন্তু তার নিজের কাজের মধ্যে যে গলদ লুকিয়ে আছে সেগুলোকে নিয়ে সে কোনো প্রশ্ন করে না। সেই ঘাটতিগুলো দূর না করে ফেলে রাখে। অথচ সেই মধুসূদনই বাইরে agent দিয়ে বিপ্রদাসের জমিদারির অবস্থা সর্ম্পকে জেনে নেয়। উপন্যাসে শোনা যায় প্ল্যান করে সে সমস্ত কাজ করে, তা সত্ত্বেও হিসাবে ভুল হয় কি করে ? এখান থেকেই নবীন মধুসূদনের সমস্ত ভাবনা-চিন্তা মানতে রাজি হয় না, প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদী হয়ে ওএ। যদিও তার এই আচরণের পিছনে মুখ্য ভূমিকায় থেকে যায় নিস্তারিনী। মধুসূদনের কথার অন্যথা হলে তার জরিমানা স্বরূপ 'রজবপুরে চালান' করে দেবার কথা যখন নবীন বলে, তখন মোতির মা'র দৃঢ় প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শোনা যায়, 'ভয় পাও বলেই ভয় দেখান।' বণিক মধুসূদনের হিসাবী মনটিকে সে ব্যাখ্যা করে সুচারুভাবে - 'তোমার দাদা রেগেও হিসেবে ভুল কেন না। জানেন আমাকে ঘরকন্না থেকে বরখাস্ত করলে সেটা একটুও সস্তা হবে না। আর যদি কোথাও এক পয়সাও লোকসান হয় সে - ঠকা ওর সইবে না।' অথচ এই মানুষটির বিপরীতে সে কুমু সম্পর্কে ভাবে 'এ বাড়িতে ওকে কেমন করে মানাবে ?' - স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে পারস্পারিক শ্রদ্ধা আবশ্যক তা থেকে বহুদূর অবস্থান কুমু-মধুসূদনের। যে কাঙ্খিত ভক্তি বা শ্রদ্ধা দেখা যায় নবীন নিস্তারিনীর জীবন যাপনে 'মেজো বউয়ের প্রতি নবীনের ভক্তি সুগভীর।'

মোতির মায়ের কুমুদিনীর পক্ষ নেওয়া, তার ভাবনার শরিক হয়ে ওঠা - কুমুকে সাময়িক স্বস্তি দিলেও শেষরক্ষা হয় নি। মোতির মায়ের প্রতিবাদ ততক্ষণ পর্যন্ত কার্যকরী ছিল যতক্ষণ সে অনুভব করেছিল কুমু স্বামীগৃহে অসহায়। কিন্তু কোথাও যেন মোতির মায়ের চরিত্রায়নের যে স্বরবৈচিত্র্য শেষের দিকে শোনা যায় তার সঙ্গে তার পূর্বের স্বর মেলে না। 'একরকম জাতিভেদ আছে যা সমাজের নয়, যা রক্তের সে জাত কিছুতে ভাঙা যায় না'- এই ভাবনার সাথে মেলে না। শেষ পর্যন্ত মোতির মা কুমুর বিপন্নতা বুঝে উঠতে পারে না, বিশেষ করে যখন তারই ইচ্ছায় নবীনের চেষ্টায় মধুসুদন তার 'গৃহলক্ষ্মীর প্রতি নতুন করে প্রসন্ন হয়ে ওঠে। কুমুর প্রকৃতিগত বিতৃষ্ণা যে একান্ত অকৃত্রিম, এটা যে অহংকার নয়, এমন কি এইটি নিয়ে যে কুমুর নিজের সঙ্গে নিজের দুর্জয় বিরোধ, সাধারণ মেয়েদের পক্ষে এটা স্বীকার করে নেওয়া কঠিন। ঘোষাল বাড়ির যার ভালোবাসা কুমু প্রথম থেকেই পেয়েছিল তাও সে হারাল। শেষ পর্যন্ত কি মোতির মা'র সত্তা 'নিস্তারিনীর সত্তা কে অতিক্রম করে গেল, বা চিন্তার সীমাবদ্ধতা টেনে দিল ? এইখানেই কি ঔপন্যাসিকের প্রতিবাদ - 'নিস্তারিনীর'র ব্যক্তিসত্তার নিষ্পেষণ মাতৃসত্তার কাছে ? সে কারণে কি 'নিস্তারানী' পিতৃদত্ত নামটি একবার-দুবার মাত্র উচ্চারিত ? তার প্রথম ও শেষ পরিচয় সে 'মোতির মা'। মোতির মা'র প্রতিবাদ এখানে এসেই থেকে যায় - "ভালো না বাসলেও ভালো স্ত্রী হওয়া যায়, নইলে সংসার চলবে কি করে ?" - কিংবা 'কোনো

মেয়ের এত মূল্য থাকতে পারে যে তার গৌরব স্বামীকে ছাপিয়ে যাবে একথা মোতির মা'র কানে ঠিক লাগল না। সংসারের স্বামীর সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি চলুক, স্ত্রীর ভাগ্যে অনাদর অপমানও না হয় যথেষ্ট ঘটল তার থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য স্ত্রী আফিম খেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরে সেও বোঝা যায়, কিন্তু তাই বলে স্বামীকে একেবারে বাদ দিয়ে স্ত্রী নিজের জোরে থাকবে এটাকে মোতির মা স্পর্ধা বলেই মনে করে।' - আসলে কি বিপ্রদাসের বোন হিসেবে যে কুমুকে সে সমীহ করত, যখন সে উপলব্ধি করে কুমু গর্ভিনী তখন কি কুমু এবং সে যে একই পরিবারের উত্তরাধিকারের মা - সে বোধে নিজেকে এবং কুমুকে সমাসনে প্রতিষ্ঠিত করে ? সেখান থেকে সমস্ত সমীহ ঝরে পড়ে। মোতির মা'র প্রতিবাদ ভিন্ন পথে ভিন্ন মাত্রা পায়। এ প্রতিবাদ কুমুদিনীর প্রতি -'প্রতিকূল ভাগ্য যখন বরদান করতে আসে তখন তার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে যে মেয়ে অবিলম্বে সে বর গ্রহণ করতে না পারে, তাকে মমতা করা মোতির মা'র পক্ষে অসম্ভব - এমনকি মার্জনা করাও।' অসাধারণ হয়ে ওঠার যে সূক্ষ্ম অনুভূতি উপন্যাসের শুরুতে দেখা যায় শেষ পর্যন্ত তা সাধারণত্বের সীমার মধ্যেই আটকে পড়ে।

টিপ্পনী

যোগাযোগের গঠন - বৈশিষ্ট্য :

যোগাযোগ উপন্যাসের গঠন-বৈশিষ্ট্যের প্রধান দিকগুলি সূত্রাকারে বলা যেতে পারে -

(১) চতুরঙ্গ এবং ঘরে বাইরের পর লেখক এই উপন্যাসে কতকটা পুরনো রীতিতে ফিরে এসেছেন-অবশ্যই পুরোপুরি নয়। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যে ক্রমভঙ্গ রীতির প্রবর্তন তিনি করেছিলেন এবং পরেও তা ব্যবহার করেছেন এখানে তার ব্যত্যয় ঘটেছে। প্রধান দুটি চরিত্রই প্রায় পূর্বাপর তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ ওপুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণে থেকেছে। এই বইয়ে মহাকাব্যিক প্রতিরূপ সৃষ্টির যে লক্ষ্য ঔপন্যাসিকের ছিল, তাতে প্রত্যক্ষ বাচন কৌশল সর্ববিধ প্রয়োজন বলে তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত করেছিলেন। ঐ একই কারণে তিনি আগের দুটি নভেলের মতো বিশেষ এক বা একাধিক চরিত্রের দৃষ্টির ফ্রেমে বইটিকে ধরে দেননি। যোগাযোগ অনেকটা নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা। সবটা নয়। গল্পের মধ্যের অংশ, যেটি এই রচনার দীর্ঘতম, সেখানেই নায়িকার একক দৃষ্টিকোণকে আশ্রয় করা হয়েছে। যদিও কুমুদিনী সবকছু বলে গিয়েছে এভাবে নয়, কুমুর মধ্য দিয়ে তাকে নিজেকে এবং মধুসূদনকেও দেখতে হয়েছে। অবশ্য মধুসূদন যা কিছু করেছে বা ভেবেছে তার সবকিছু কুমুর জানা - সে অর্থে নয়। কুমুর উপরে সব আলো ফেলার জন্য। মধুসূদন সেই আলোক-বৃত্তের বাইরে গিয়ে স্বাধীন হয়ে উঠতে পারে নি। এই বিশেষ কলাকৌশলকে আমরা সাপেক্ষ - নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণের মিশ্র পদ্ধতি বলে উল্লেখ

টিপ্পনী

করেছি।

(২) এই উপন্যাসটি কতক যেন মহাকাব্যের মতো। গোরার পরে এতবড় ক্যানভাসে কাহিনী দাঁড় করাবার চেষ্টা তিনি করেন নি। ঘরে বাইরের রাজনৈতিক পটভূমিতে সম্ভাবনা থাকলেও বিরূপ দৃষ্টির কৌণিকতা তার বিস্তার ও গভীরতাকে কার্যকর হতে দেয়নি বরং চতুরঙ্গকে মধুসূদনের ভাষায় 'এপিকলিং' অর্থাৎ ক্ষুদ্র মহাকাব্য বলা চলে। যোগাযোগে রবীন্দ্রনাথ মহাকাব্যোচিত একটি অবয়ব তৈরি করবার কথা সম্ভবত ভেবেছিল - এর আদি নাম 'তিন পুরুষ' সেদিকেই ইঙ্গিত করে। হয়তো তিন পুরুষে বিস্তৃত কাহিনীতে মধুসূদন কুমুর মনস্তাত্ত্বিকতাকে এত জটিল টানাপোড়নে দেখানো যেত না মনে করে তিনি উপন্যাস লিখতে আদি অভিপ্রায় ছেড়ে দেন। তবুও এ গল্পে পুরনো দুই জমিদার-পরিবারের যে বিবাদের কথা এবং তার বংশবাহিত রূপান্তরের বিবরণ আছে তাতে সময়ের বিশাল বিস্তারের ভুমিটি তৈরি হয়েছে, অন্যদিকে ব্যবসায়ী শ্রেনীর উদ্ভব এবং জমিদার শ্রেনীর সঙ্গে তার বিরোধের প্রসঙ্গটি কাহিনীর মনস্তাত্ত্বিক অভ্যন্তর ভেদ করেও খানিকটা ছড়িয়ে পড়েছে। গোরার চেয়ে এখানে ঔপন্যাসিক কিছুটা স্বতন্ত্র পদ্ধতি নিয়েছেন। গোরায় যেমন যূথবদ্ধ জনতার কতকগুলি প্রসঙ্গ, তর্ক-বিতর্কের ব্যাপ্তি এবং নায়ক-চরিত্রে যুগকে ধারণ করার ক্ষমতা মহাকাব্যাপম করে তুলেছে উপন্যাসটিকে, যোগাযোগ তেমন ঘটেনি। (ক) এ উপন্যাসে যূথবদ্ধ মানুষের চিত্র অল্পই কুমুর বিয়ের সময়ে প্রজা সমাবেশ ছাড়া, (খ) তর্ক-বিতর্ক নেই, (গ) নায়ক চরিত্রে অবশ্য যুগধারণক্ষম গৌরব আনার সুযোগ ছিল। আসেনি - তাও নয়, কিন্তু নায়ককে নায়ক না করে আধাভিলেন করে তোলায় কিছু সমস্যা হয়েছে। তবুও সব মিলে মহাকব্যোচিত একটা পরিমন্ডল অংশত এই উপন্যাসের চারধারে গড়ে উঠেছে।

(৩) আটান্ন অধ্যায়ে বিন্যস্ত উপন্যাসটি তিনটি অংশে ভাগ করা যায় :

(ক) ১ - ১৯ অধ্যায়। ৩৫ পৃষ্ঠা। নায়ক নায়িকের পূর্বপ্রসঙ্গ। এই সূত্রে বনেদী জমিদার বংশ এবং নবোত্থিত ব্যবসায়ীর কাহিনী এসেছে। সমগ্র গ্রন্থে এর তাৎপর্য একটু আগে বিস্তৃত ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

(খ) ২০ - ৪৫, মোট ২৬ টি অধ্যায়। ৮৫ পৃষ্ঠা। কুমু - মধুসূদন দ্বন্দ্বের সূচনা, ক্রমবিকাশ এবং একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছল - কুমুর বাপের বাড়ি যাবার মধ্য দিয়ে।

(গ) ৪৬ - ৫৮, মোট ১৩ টি অধ্যায়।৪০ টি পৃষ্ঠা। বাপের বাড়িতে দাদার সংস্পর্শে কুমু। এই পর্যায়ের সমাপ্তি এবং উপন্যাসেরও। কুমুরও স্বামীর গৃহে প্রত্যাবর্তন। এই অংশে ৪৮, ৫২, ৫৪ এই চার

অধ্যায় জুড়ে আরও বিশেষভাবে শেষ তিনটিতে মধুসূদন শ্যামার কাহিনী আবর্ত । (পৃষ্ঠা সংখ্যা সরকারী শতবার্ষিকী সংস্করণ অনুযায়ী)

(ক) অংশটি এই কাহিনীর পূর্বকথা - একই সঙ্গে পটভূমিতে এবং গল্পের উপরে তা একটি ব্যাপক সামাজিক তাৎপর্য বিকীর্ণ করেছে। ২নং অংশ এবং ৩নং অংশ মিলে যে আভ্যন্তর কাহিনী তার গঠনে এক ধরনের আদি-মধ্য-অন্ত যুক্ত পূর্ণতা-দ্বন্দ্বের সূচনা বিকাশ-পরিণতির নিটোল আকার আছে। কুমু - মধুসূদনের সম্পর্কের ইতিহাসটাও আসল ব্যাপার। তাতে মোতির মা ও নবীনকে নিয়ে একটি এবং শ্যামাসুন্দরীকে আশ্রয় করে আর একটি উপ-প্রসঙ্গ আছে । প্রথমটি মূল ঘটনাবর্তের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত থেকেছে - উত্তেজনাহীন প্রত্যহের ছোট-বড় সব ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে। দ্বিতীয়-তৃতীয় অংশে প্রয়োজন মাফিক তাকে চারিয়ে দিয়েছেন লেখক। শ্যামার কথা আগে অল্প থাকলেও ঘোষাল বাড়ি থেকে কুমুর অনুপস্থিতির সুযোগে খুব বেড়ে গিয়েছে। আবেদনের দিক থেকে এই উপ প্রসঙ্গ তীব্র এবং মধুসূদনের মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উপন্যাসের পরিণতি যথেষ্ট স্পষ্ট এবং এক অর্থে চূড়ান্ত, কারণ সন্তানবতী রমণী আবার ব্যক্তি মুক্তির কথা ভাববে - লেখক তা কল্পনা করেন নি। কিন্তু নাটকীয় ধরনের কোনো ক্লাইম্যাক্স আছে কিনা তা নিশ্চয় করে নির্দেশ করা যায় না।

কুমু-মধুসূদন সংঘাত আদ্যন্ত তরঙ্গিত। কিন্তু কোন মুহূর্তটি বেশি বিক্ষুব্ধ, কোন্‌টি কম তা বোঝা যায় না। এদিক থেকে চোখের বালির চেয়েও যোগাযোগ সমতল মনে হয়। মুখোমুখি আদর্শের ব্যক্তিত্বের ও অধিকারবোধের দ্বন্দ্ব সমানে চলেছে। মধুসূদনের প্রভুত্ব ও জোরের মুখের উপর কুমুদিনী যে অস্ত্র নিয়ে লড়েছে তা অবশ্যই সত্যাগ্রহ - শব্দটা না হয় গান্ধিজীর কাছ থেকে ধার করেই নেওয়া হল। রবীন্দ্রনাথ সূত্রটা সেখান থেকেই পেয়ে থাকবেন। সে যাই হোক, এই দম্পতির মতো এত প্রত্যক্ষ এবং তীব্র যুদ্ধ তাঁর আগের কোনো উপন্যাসে বিপরীত পক্ষের মধ্যে দেখিনি। এখানে তো মানুষের সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্ব - আইডিয়ার মহাশূন্যে অস্ত্রচালনা নয়। কিন্তু যেসব ঘটনাকে আশ্রয় করে এই বিরোধ তার বাইরের মাপ খুব ছোটো। বিপ্রদাসের দেওয়া হীরের আঙটি ঈর্ষার বশে নিয়ে নিল মধুসূদন, টেবিলের কাচের চাপা ভেঙে ফেলল গোপাল, দাদার চিঠি সরিয়ে রাখল মধুসূদন রোগের খবর বা কলকাতায় আসা জানতেই পারল না কুমু। মেজবউ দেশের বাড়ীতে চলে যেতে বলায় তোরঙ্গ গুছিয়ে কুমুও সঙ্গে যাবার জন্য তৈরি হওয়া, একতলার ঘুপটি ঘরে বাড়ির যাবতীয় লণ্ঠন পরিষ্কার করার কাজ নেওয়া। ধীরে ধীরে এই বিরোধ বেড়েছে, সংঘাত উত্তেজনা ক্রমে তীব্রতর হচ্ছে - এ উপন্যাসে তেমন কিছু

টিপ্পনী

টিপ্পনী

ঘটেনি। তবে অবিরাম দুজনের ঘাত-প্রতিঘাতে চতুর্দিকে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে উঠেছে। এমন কি যে ঘটনাকে বলা যায় কাহিনীর পর্বান্তর, সেই কুমুর দাদার কাছে চলে যাওয়াকে লেখক এত মৃদু বর্ণপাতে এঁকেছেন যাতে নাট্য -ক্লাইম্যাক্সের ধার কোথাও নেই। তৃতীয় পর্যায়ে সামনা সামনি দ্বন্দ্ব আর নেই। কিন্তু তার বিরাম নেই। একদিকে বিপ্রদাসের সঙ্গে মধুসূদনের দেনা-পাওনা সম্পর্কটা ওদের নারী-পুরুষের সম্বন্ধের মধ্যে ঢুকে পড়তে চাইছে বিপ্রদাসের কাছ থেকে কুমু জীবনের পথ সম্পর্কে শক্তি সংগ্রহ করতে চাইছে। দ্বন্দ্বজীর্ণ চিত্তে শান্তির প্রলেপ চাইছে - এটাও তো ঐ লড়াইয়ের অঙ্গ। ওদিক শ্যামা-মধুসূদনের ঘটনা কুমু -মধুসূদনের দ্বন্দ্বের একটা মানস প্রতিক্রিয়ার ফল। এইবার কিন্তু সংঘাত তীব্রতর হয়ে উঠেছে। এর পরেই বিপ্রদাসের উপদেশ এবং কুমুর সিদ্ধান্ত। স্বামীগৃহে সে আর অপমানের মধ্যে ফিরে যাবে না। মধুসূদনের সঙ্গে কুমুদিনীর শেষ সাক্ষাৎ এক পক্ষের সংযত দৃঢ়তায় এবং অন্যপক্ষের ক্রোধে ও উত্তেজনায় বেশ নাটকীয়, যদিও কুমুর শ্বশুরবাড়ি না ফেরার সিদ্ধান্ত আগেই পাঠক জেনেছে, তা কোনো আকস্মিক সিদ্ধান্তরূপে প্রকাশ পায়নি। এ নিয়ে আগে বিপ্রদাস - মোতির মায়ে এবং কুমু-নবীনে কথা হয়েছে। তবুও কুমু - মধুসূদনের এই শেষ সাক্ষাৎকে যথেষ্ট নাট্য - তীব্রতা দেওয়ার একটা ক্লাইম্যাক্স - জাতীয় অবস্থা তৈরি হয়েছে। কিন্তু তার পরেই অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স, কুমুর গর্ভবতী হবার সংবাদে তার স্বামীগৃহে ফিরে যাবার সিদ্ধান্তে। ভেতরে যত টেনশন থাক, খুব শান্ত সংযমে তা পরিবেশিত।

(৪) ঘরে বাইরে উপন্যাসে কয়েকটি কবিতা বা কবিতার অংশ ব্যবহার করা হয়েছিল। যোগাযোগে গীতা উপনিষদ থেকে কিছু শ্লোকের অংশ, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের নানা লেখায় যা ব্যবহৃত - নায়িকার মুখে বসানো হয়েছে। তাছাড়া মীরার ভজনের অনেক কলি। এই উদ্ধৃতিগুলি উপন্যাসে কুমুকে কেন্দ্র করে অনেকটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে আছে। লেখক নায়িকার চরিত্রে একটা আধ্যাত্মিক বাতাবরণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এ কাজ করেছেন। এগুলির সাহায্য ছাড়া তাঁর কল্পিত কুমু ঠিক ধরা পড়ত না।

সহায়ক গ্রন্থাবলী :

১। বঙ্গসাহিত্য উপন্যাসের ধারা - শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর - সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। রবীন্দ্র উপন্যাস : ইতিহাসের প্রেক্ষিতে - ভূদেব চৌধুরী।

৪। আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ - আবু সয়ীদ আইয়ুব।

৫। নির্মাণ আর সৃষ্টি - শঙ্খ ঘোষ।

৬। আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস - অশ্রুকুমার সিকদার।

সহায়ক প্রশ্নাবলী :

১। 'যোগাযোগ' উপন্যাসের নামকরণের সার্থকতা বিচার কর।

২। 'যোগাযোগ' উপন্যাসের কুমুদিনী চরিত্রটি বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দাও।

৩। 'যোগাযোগ' উপন্যাসের উপসংহার বা পরিণতি কতদূর যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা কর।

৪। 'যোগাযোগ' উপন্যাসের মধুসূদন চরিত্র সার্থকতা বিচার কর।

৫। 'যোগাযোগ' উপন্যাসের বিপ্রদাস চরিত্রটি বিশ্লেষণ কর।

৬। যোগাযোগ উপন্যাসের অপ্রধান চরিত্রগুলির সার্থকতা বিচার কর।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

চতুর্থ একক

ছোটগল্প

ভূমিকা :

টিপ্পনী

পাশ্চাত্য সাহিত্য আলোচকদের মতে কল্পিত -গদ্য কাহিনীগুলি দুই শ্রেণীতে পড়ে - এক - নভেল অর্থাৎ উপন্যাস। দুই - শর্ট স্টোরি অর্থাৎ ছোটগল্প। আমাদের সাহিত্যেও এই বিভাজন চলে। ছোটগল্পের কাহিনী ঘিরে একটা অখন্ড ইমোশান বা ভাবরস জমাট বেধে উঠে, অর্থাৎ এক অখন্ড ভাবরস পাঠকের চিত্ত অভিষিক্ত করে তোলে এবং ছোটগল্পের আয়োজনে ভাবরসের একটি ঘনীভূত একাগ্রতায় কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে। এটাই ছোটগল্পের বিশিষ্ট লক্ষণ। গীতিকবিতার সঙ্গে ও ছোটগল্পের মিল এইখানে । একটি ঐক্যবদ্ধভাব ঘনরসতায় পর্যবসিত হয় বলে ছোটগল্পের কাহিনী শেষ হয়ে গেলেও পাঠকের চিত্তে তার রেশ লেগে থাকে এবং তাতেই যেন গল্পের যথার্থ বিরাম গুঞ্জরিত হয়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষাযাপন' কবিতার অংশ উদ্ধারযোগ্য -

ছোটপ্রাণ, ছোট ব্যথা, ছোট ছোট দুঃখকথা,
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি,
তারি দু-চারটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা, ঘটনার ঘন-ঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।

লেখক থেমে গেলেন কিন্তু পাঠকের কৌতূহল যেন থেকেই যায় একান্তভাবে রসের ঐক্যের উপর ছোটগল্পে সার্থকতা নির্ভর করে। সহযোগী রসের মধ্যে কৌতুকই ছোটগল্পের বিশেষ উপযোগী । স্মিত ও করুণ এই দুই রসের পাশাপাশি প্রবহমান স্রোতের সংকীর্ণ সীমারেখার মধ্যে ছোটগল্পের রস জমে উঠে। ছোটগল্প এই রসের অবতারণা তাই সহজ স্বাভাবিক।

টিপ্পনী

গীতিকাব্যের মতো ছোটগল্পের রসের সার্থকতা লেখক পাঠকের সমরসানুভূতির উষ্ণতায়। তাই গীতিকবিতার মতো ছোটগল্পেরও রূপ বিচিত্র। প্রণয়, কৌতুক, অতিপ্রাকৃত ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ছোটগল্প রচিত হতে পারে। মানবজীবনের জটিলতা অনন্ত, মানবচরিত্রের বৈচিত্র্যও অপরিমেয়। বহুবিচিত্র টানাপোড়নে যে বাণীশিল্প সৃষ্টি হয়, তাতে কোনরকম মার্কা মারা যায় না, রঙের যেমন রসের ও তেমনি অসংখ্য 'শেড'। সুতরাং রসবিচার করলে ছোটগল্পের শ্রেনীর অন্ত নেই।

ছোটগল্প আয়তনে ছোট। সুতরাং তার মধ্যে সুদীর্ঘ মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ বা বহু ঘটনার সমাবেশের স্থান নাই। অথচ ছোটগল্প বা উপন্যাসের প্রাণ হচ্ছে আখ্যাণ, তাতে দুই - একটি ঘটনা থাকতেই হবে। মনস্তত্ত্বের গভীর ও ব্যাপক বিশ্লেষণের স্থান নেই বলে যে ক্ষুদ্র ঘটনাকে আশ্রয় করে ছোটগল্প গড়ে উঠে তাকে খুব বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হতে হবে। 'লিরিক' কবিতা যেমন একটি ভাবকে আশ্রয় করে, ছোটগল্প তেমনি একটি আখ্যানকে কেন্দ্র করে ঘটনা একমুখী হবে থাকে এবং ছোটগল্পের উপসংহারে একটা Climax বা anti climax থাকে। পূর্ববর্তী সমস্ত ঘটনাকে এরকমভাবে সাজান হয় যেন তারা একটা বিশেষ সিদ্ধান্তের উপকরণ মাত্র হয় অথচ উপসংহারটি যদি সেই পূর্ববর্তী ঘটনার শেষ সিদ্ধান্তমাত্র হয় তবে তা জ্যামিতির প্রতিপাদ্যের মত সহজ ও নির্ধারিত হয়ে দাঁড়ায়, তার মধ্যে বিস্ময়কর কিছুই থাকে না। তাই ছোটগল্পের উপসংহারে খানিকটা অপ্রত্যাশিত অংশও থাকে।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প :

রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা ছোটগল্প প্রথম পূর্ণাঙ্গতা পেয়েছিল। তাঁর হাতেই ছোটগল্পের সিদ্ধি। গল্পগুচ্ছের যুগের মধ্যেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জীবনভূমি পরিবর্তিত হয়েছে - শিল্পীর জীবনদৃষ্টি পেয়েছে এক অনাবিষ্কৃতপূর্ব জগতে প্রথম প্রবেশাধিকার। সাহিত্যের ইতিহাসে এইটেই শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। স্বয়ং কবি এই জীবন পরিচায়নের প্রসঙ্গে বলেছেন -

"আমি যে ছোট ছোট গল্পগুলো লিখেছি, বাঙালি সমাজের বাস্তব জীবনের ছবি প্রথম তাতেই ধরা পড়ে।"

[সাহিত্য, গান ও ছবি (প্রবাসী, ১৩৫৮ বাংলা, আষাঢ়)]

রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতাগুলির পরেই রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশেষ প্রকাশ হিসাবে তাঁর ছোটগল্পগুলির স্থান। একথা খুব সহজেই বলা যায় যে, ছোটগল্পগুলিকে রবীন্দ্রপ্রতিভার বিশেষ ধর্ম যেমন প্রকাশ পেয়েছে এমন তাঁর অন্য সব নাটকেও নয়।

বিপিনচন্দ্র পাল বা অন্যান্য সমালোচক একদা রবীন্দ্রনাথের রচণা সম্বন্ধে এই

অভিযোগ তুলেছিলেন যে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি "বস্তুতন্ত্রতাবিহীন" । এর মানে রবীন্দ্রনাথের রচনা - কবিতা ও গল্প - একান্তভাবে কল্পনার সৃষ্টি সুতরাং বাঙালী নরনারীদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার দুঃখসুখ ও আশা - আকাঙ্খা বেদনার সঙ্গে সম্পর্কবিরহিত। রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টি সম্বন্ধে এই বিচার অর্থহীন এবং তাঁর ছোটগল্প সম্বন্ধে এ অভিযোগ একেবারেই ঠিক নয় । রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প কিছুতেই কল্পনাবিলাসের রঙিন ফানুস নয়, প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা এবং গভীর অনুভূতির সমবায়ে কবির মানসে যে গভীরতর সত্যদৃষ্টির আয়োজন সঞ্চিত হয়েছিল তারই অভিনব প্রকাশ তার ছোটগল্পগুলিতে। সমসাময়িক একখানি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন -

> "আমি সমস্ত জিনিসের বাস্তববিকতাটুকু স্পষ্ট দেখতে পাই, অথচ তারই ভিতরে তার সমস্ত ক্ষুদ্রতা এবং সমস্ত আত্মবিরোধের মধ্যেও আমি একটা অনির্বচনীয় স্বর্গীয় রহস্যের আভাস নাই।"

পাঠকের হয়তো এ কথাতেই বিভ্রান্তি হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প যথার্থভাবে বাস্তব, কেননা তাতে মানুষের কোন টাইপ আঁকা হয়নি, কেবল ব্যাক্তিমানুষের নিজস্ব প্রকাশিত। তবুও রবীন্দ্র ছোটগল্পে বাস্তবতাই শেষ কথা নয়। গল্পের গল্পত্ব ছাড়িয়ে একটা অনুভূতি অন্তরকে নাড়া দিতে থাকে । চোখে দেখা মানুষের সুখ-দুঃখময় যে জীবনখন্ড আবহমান প্রাণপ্রবাহের ভঙ্গ-তরঙ্গমাত্র, রবীন্দ্রনাথের গল্পে জীবনের ক্ষণলব্ধ ভালোবাসা ভালোলাগা ও তুচ্ছতা -ব্যর্থতা-অচরিতার্থতা সবই যেন অতিলৌকিক অনির্বচনীয় সার্থকতায় পৌঁচেছে, জীবনের অসার্থকতায় ব্যথা যেন বিশ্বব্যাপী বিরহবেদনার তান হয়ে মিলিয়ে গেছে, প্রেমের দুঃখদহন বিশ্ব-চৈতন্যের শান্তিজলে নির্বাপিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে নগর ও নগরবাসী এবং জনপদ ও জনপদবাসী সমান স্থান পেয়েছে, পেয়েছে সমমর্যাদা। মানুষের মানবত্ব অবশ্য সর্বত্রই এক, কি নগর কি জনপদ এবং রবীন্দ্রনাথ যে মৌলিক ও জটিল মনোবস্তু নিয়ে কারবার করেছেন তাতে নাগরিক - গ্রাম্য বিভাগ চলে না। তবে একথা স্বীকার করতেই হয় যে পল্লীজীবনের অবকাশে মানুষের ভাবপরিমন্ডল সরল ও সুস্থ থাকবার সুযোগ পায় এবং এটাও ঠিক যে পল্লীর পরিবেশ ও পল্লীর জীবন রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল । রবীন্দ্রনাথের পল্লীপ্রীতি শহরবাসের প্রতিক্রিয়াজনিত নয়, এর কারণ অনেক গভীর । বৃহৎ অট্টালিকায়, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির এককোণে বন্দী শিশুচিত্ত জানলার ফাঁক দিয়ে বহিঃপ্রকৃতির যে সংকীর্ণ রূপটুকু দেখে নিজের কল্পনাকে দিগ্‌বিদিকে উদাত্ত করে দিত তার মধ্যে কুটীরমন্ডিত তরুশ্যাম পল্লীজীবনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণের মূল খুঁজতে হবে। বহুদিন পরে বাঁকুড়ার জনসভার অভিনন্দনের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন তার মধ্যে এই

টিপ্পনী

টিপ্পনী

ইতিহাসটুকুই ইঙ্গিত আছে -

> "আমার মরাইয়ে আজ যা কিছু ফসল জমেছে তার বীজ বোনা হয়েছে সেই প্রথম বয়সে। ..... বাল্যকালে দিন কেটেছে শহরে খাঁচার মধ্যে, বাড়ির মধ্যে। শহরবাসীর মধ্যেও ঘুরে ফিরে বেড়াবার যে স্বাধীনতা থাকে আমার তাও ছিল না। ..... বহির্জগতের এই স্বল্প-পরিচয় আমার মধ্যে একটা সৌন্দর্যের আবেগ সৃষ্টি করত। জানলার ফাঁক দিয়ে যা আমার চোখে পড়ত তাতেই যেটুকু পেতুম তার চেয়ে যা পাইনি তা বড়ো হয়ে উঠেছে কাঙাল মনের মধ্যে। সেই না - পাওয়ার একটা বেদনা ছিল বাংলার পল্লীগ্রামের দিগন্তের দিকে চেয়ে। আমার যে নিরন্তর ভালোবাসার দৃষ্টি নিয়ে আমি পল্লীগ্রামকে দেখেছি তাতেই তার হৃদয়ের দ্বার খুলে দিয়েছে। আজ বললে অহংকারের মতো শোনায়, তবু বলব - আমাদের দেশের খুব অল্প লেখকই এই রসবোধের চোখে বাংলাদেশকে দেখেছেন ; আমার রচনাতে পল্লীপরিচয়ের যে অন্তরঙ্গতা আছে, কোনো বাঁধাবুলি দিয়ে তার সত্যতাকে উপেক্ষা করলে চলবে না।"

যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ গল্পরচনার প্রথম এবং প্রধানতম আবেগ অনুভব করেছিলেন তার একটি অত্যন্ত সাদাসিধা বাস্তব ছবি তিনি বিসর্জনের উৎসর্গ কবিতায় (১৮৯০) দিয়েছেন। ছোটগল্প রচনার সময়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনার মূল্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন এবং ঈর্ষালু সমালোচকরা কি ভাববেন বা মন্তব্য করবেন সে সম্বন্ধেও তিনি সম্পূর্ণ জ্ঞাত ছিলেন। বিসর্জন নাটকের উৎসর্গ কবিতাব তাই তিনি প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথকে এই কথা লিখেছিলেন -

তার পরে দিনকত কেটে যাব এই মতো
তারপরে ছাপাবার পালা।
মুদ্রাযন্ত্র হতে শেষে বাহিরায় ভদ্রবেশে
তারপরে মহা ঝালাপালা।
রক্তমাংস -গন্ধ পেয়ে ক্রিটিকেরা আসে ধেয়ে,
চারি দিকে করে কাড়াকাড়ি।
কেহ বলে, 'ড্রামাটিক বলা নাহি যায় ঠিক,
লিরিকের বড়ো বাড়াবাড়ি।'

শির নাড়ি কেহ কহে, 'সব-সুদ্ধ মন্দ নহে,
ভালো হত আরো ভালো হলে।'
কেহ বলে, 'আয়ুহীন বাঁচিবে দু-চারি দিন,
চিরদিন রবে না তা বলে।'
কেহ বলে 'এ বহিটা লাগিতে পারিত মিছে
হত যদি অন্য কোনোরূপ।"
যার মনে যাহা লয় সকলেই কথা কয়,
আমি শুধু বসে আছি চুপ।.....

বাংলাদেশের নিভৃত অন্তরটি রবীন্দ্রনাথের প্রবেশের তুলনা করা যেতে পারে ভগীরথের গঙ্গাবতারণের সঙ্গে। দাদাদের সঙ্গে বোটে ও স্টীমারে গঙ্গায় ভ্রমণ করবার সময় রবীন্দ্রনাথ কলকাতা ও শান্তিপুরের মধ্যবর্তী ভাগীরথীতীরে যে পল্লীদৃশ্য দেখেছিলেন তাই তাঁকে গল্পরচনার প্রেরণা দেয় এবং তাতেই তাঁর প্রথম গল্প দুটি 'রাজপথের কথা' এবং 'ঘাটের কথা' লেখা হয়। তারপর প্রায় ছয় - সাত বছর পরে শিলাইদহের সাজাদপুরে পদ্মাতীরে বাস করে গল্পরচনার তীব্রতর প্রেরণা অনুভব করেছিলেন।

কিন্তু এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে ইতিপূর্বে তিনি কাব্য, কবিতা, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রভৃতি বিবিধ শ্রেণীর রচনায় হাত দিয়েছেন, কিন্তু ছোটগল্প রচনায় হাত দেন কেন ? একটি সহজ উত্তর এই যে নাটক, উপন্যাস, কাব্য, কবিতা ও প্রবন্ধ এ সবের ধারা বাংলা সাহিত্যে বহমান ছিল, তিনি সহজেই তা গ্রহণ করেছিলেন, ছোটগল্পের ধারা ছিল না, সে ধারা তাঁরই সৃষ্টি, কাজেই কিছুটা দেরি হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এটা আংশিক সত্য মাত্র। কবিকর্তৃক ভিখারিণী গল্পটি বাদ দিলে, ঘাটের কথা ও রাজপথের কথা লিখিত হয় ১৮৮৪ সালে, তখন কবির বয়স তেইশ বছর, ঘাটের কথাকে তাঁর প্রথম ছোটগল্প বলে স্বীকার করলেও একথা স্বীকার করতে হয় যে, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প বলতে যা বুঝি, কি বিষয়ে, কি বাচনরীতিতে এটা তা থেকে স্বতন্ত্র। এ গল্প তাঁর লেখা, কিন্তু স্বক্ষেত্রে নয়। এ সত্য রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন, সেইজন্যই তার পরে সাতবছর ছোটগল্প এর জন্য কলম ধরেন নি। ১৮৯১ - এ যখন তাঁর বয়স ত্রিশ বছর তখন তিনি ছোটগল্পের স্বক্ষেত্রে পদার্পন করলেন। যে পদচারণ জীবনের শেষতম বৎসর পর্যন্ত সচল ছিল।

এ বিষয়টা লক্ষ্য করার মতো যে রবীন্দ্রনাধের ছোটগল্প ও উপন্যাসের মধ্যে ক্ষেত্রের ভেদ আছে। উপন্যাসগুলির ক্ষেত্র মূলত নাগরিক জীবন, প্রধান পাত্রপাত্রী

টিপ্পনী

প্রায় সকলেই নাগরিক নরনারী। আর তার অধিকাংশ ছোটগল্পের ক্ষেত্র পল্লীজীবন প্রধান অপ্রধান প্রায় প্রায় সকলেই পল্লীবাসি অবশ্য শেষ জীবনের ছোটগল্প কিন্তু ব্যাতিক্রম আছে।

রবীন্দ্রনাথ খাস কলকাতার মানুষ। কিন্তু তার পৈতৃক জীবিকার উপায়টির অবস্থায় সুদূর পল্লীবঙ্গে। ইতিপূর্বে তিনি অনেকবার গেছেন সেখানে সে কথা ঠিক কিন্তু সে যাওয়া এবং সে দেখা নিতান্ত বাইরে থেকে। জমিদারীর পরিদর্শনভার গ্রহণ করে সেখানে রবীন্দ্রনাথ গেলেন ১৮৯১ সালে। এর ফলেই সোনার ফসল ফলেছে ছোটগল্পের ক্ষেত্রে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রজীবনী ১মখন্ড (পৃ ২৩২) - এ লিখেছেন -

> বিলাত হইতে ফিরিবার কয়েক মাসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে কার্যভার গ্রহণ করিয়া উত্তরবঙ্গে যাত্রা করিতে হইল। গত কয়েক বৎসর হইতে মাঝে মাঝে জমিদারী পরিদর্শনেদর জন্য স্থানে স্থানে যাইতে হইতেছিল বটে, কিন্তু পরিচালনের ভার কখনো তাঁহার উপর ন্যস্ত হয় নাই। জমিদারীর তদারক ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার অবশেষে রবীন্দ্রনাথের উপর আসিয়া পড়িল। তখন ঠাকুর এস্টেট সমস্তই এজমালিতে ছিল, সুতরাং খুবই বড় জমিদারী। ..... ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথকে জীবনের কোন কঠিন দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয় নাই। সাহিত্যজীবনের বিচিত্র মাধুর্যর মধ্যে হঠাৎ আসিয়া পড়িল বিপুল জমিদারী তদারকের কাজ। কিন্তু কবি হইলেও তাঁহার সহজ বুদ্ধিই শুধু মানাইয়া লইলেন না, তাহাকে ণিপুন ভাবে সুসম্পন্ন করিতে লাগিলেন, যেমন নিজের পারিবারিক জীবনের প্রত্যেকটি ছোটখাটো খুঁটিনাটি কাজকর্ম করিতেছিলেন, তেমন ভাবেই জীবনের দিক হইতে এই ঘটনাটি খুব বড়। বাস্তবকে প্রকৃতির সহিত জীবনে মিশাইয়া এমন নিবিড়ভাবে পাইবার সুযোগ ইতিপূর্বে হয় নাই। প্রকৃতি ও মানুষে মিলিয়া বিশ্বের সৃষ্টিসৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বালকাল হইতে প্রকৃতিকে অন্তরঙ্গভাবে জানিয়েছিলেন, মানুষকে তেমন নিবিড়ভাবে জানিতে সুযোগ লাভ করেন নাই। জমিদারী পরিদর্শন ও পরিচালনা করিতে আসিয়া বাংলার অন্তরের সঙ্গে তাঁহার যোগ হইল - মানুষকে তিনি পূর্ণদৃষ্টিতে দেখিলেন। তাঁহার কাব্যের মধ্যে হৃদয়াবেগের আতিশয্য এযুগে বহুল পরিমাণে মৃদু হইয়া আসিল ; পদ্মা তাঁহার কাব্যে ও অন্যান্য রচনায় নূতন রস, নূতন শক্তি,, নূতন সৌন্দর্য দান করিল।"

টিপ্পনী

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প বললে বুঝতে হবে তিন খন্ডে সম্পূর্ণ গল্পগুচ্ছ, সে, গল্পসল্প তিনসঙ্গী। রচনাকাল ১৮৮৪ সাল থেকে ১৯৪১ সাল অর্থাৎ কবিজীবনের সাতান্ন বৎসর কাল। এর মধ্যে গল্প সংখ্যা ১১৮, ভিখারিনী ধরলে ১১৯।

টিপ্পনী

১৮৭৭ সালে প্রকাশিত হয় ভিখারিনী গল্পটি। ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত মুকুট গল্পটি গল্পগুচ্ছে সন্নিবেশিত না হলেও এটিকে ছোটগল্প বলেই ধরা হয়।

১৮৯১ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প রচনার রীতিমত সূত্রপাত। তার আগে ১৮৮৪ সালে ঘাটের কথা, রাজপথের কথা লেখা হয়।

১৮৯১ সাল থেকে ১৮৯৫ সালের মধ্যে পাওয়া যায় চুয়াল্লিশটি গল্প, সমগ্র গল্পগুচ্ছের অর্ধেকের কিছু বেশি, প্রায় প্রত্যেক মাসে একটি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধনা পত্রিকার জন্য রচিত।

তারপর ১৮৯৮ সালে পাওয়া যায় সাতটি গল্প। গল্প লেখার তাগিদ আবার ফিরে এসেছে কারণ সাধনা পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাবার আড়াই বছর পরে ভারতীয় সম্পাদনার ভার রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন। তাই ভারতীয় জন্য গল্পের যোগান দিতে হল।

১৮৯৯ সালে ছোটগল্প আর পাই না, তার বদলে পাই কথার অনেকগুলি কাহিনীমূলক কবিতা। ১৯০০ সালে পাওয়া যাচ্ছে আটটি গল্প। এখন কবিকে নানা পত্রিকায় গল্প যোগান দিতে হয়েছে।

১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথের বয়স চল্লিশ। ১৯০১ থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে সবসুদ্ধ আটটি গল্প লেখা হয়েছে।

১৯১৪ সালে সবুজপত্র প্রকাশিত হয়েছে প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায়। তাতে রবীন্দ্রনাথ গল্প লিখেছেন। পাওয়া যাচ্ছে সাতটি গল্প।

১৯১৭ সালে তিনটি গল্প লেখা হয়। এটা পলাতকা কাব্যের সময়। এরপর পাঁচটি গল্প লেখা হয়েছে। ১৯২৫ সালে একটি, ১৯২৮-এ দুইটি, ১৯২৯ - এ আর ১৯৩৩ - এ একটি করে।

কিন্তু এখানেই গল্পধারার শেষ নয়, আছে বিভিন্ন সময়ে লিখিত আরও তিনখানা বই - সে, গল্পসল্প ও তিনসঙ্গী।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

সে-র কিম্ভুত রসের গল্পগুলিকে তাঁর অঙ্কিত ছবির সঙ্গে মিলিয়ে বুঝতে হবে। গল্পসল্পের পরিপ্রেক্ষিত ছেলেবেলা নামে জীবন কথা, আর তিনসঙ্গীকে বুঝতে হলে তার চিত্রাবলী ও বৈজ্ঞানিক সাহিত্য বিশ্বপরিচয়ের সাহায্য নিতে হবে।

টিপ্পনী

বোষ্টমী :

বোষ্টমী প্রকাশিত হয় সবুজপত্রে আষাঢ় ১৩২১ । এই গল্পের শব্দসংখ্যা আনুমানিক চারহাজার। প্রেমের এক অপূর্ব রূপ এ গল্পে উদ্ভাসিত। প্রেম যখন একাগ্র হয় তখন কোন কিছু ত্যাগ করা কঠিন নয়। এই অত্যন্ত বাস্তব গল্পটিতে নিরতিশয় সংযত ও সংক্ষিপ্ত রেখায়, বোষ্টমীর নিতান্ত অসাধারণ নিজত্বের পরিচয় ফুটে উঠেছে। গল্পটিতে বোষ্টমীকে উপলক্ষ্য করে বৈষ্ণব রসতত্ত্ব ও সাধনার যে সুগভীর তাৎপর্য ইঙ্গীতে ব্যক্ত হয়েছে তাতে রবীন্দ্রনাথের নিজের অধ্যাত্মভাবনার মিল আছে। বৈষ্ণব সহজসাধনার মূল কথা হল - "কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাহার স্বরূপ।" বোষ্টমীর এবং তার মতো সাধকদের সাধনা ও সেই মতো। স্বামীর নীরব ভালোবাসা ও শিশুপুত্রের ব্যাকুল অনুরক্তি - আর চিত্তে ফলকামনাহীন ভালোবাসার পথ দেখিয়েছিল। তাই এই দুজনের ভালবাসাই তার গুরু। আর যা তাকে ঘর ছেড়ে পথে বের করেছিল, সে ভালবাসা নয় - মোহ। এ মোহকাহিনী রবীন্দ্রনাথ উহ্য রেখেছেন - কেননা সেহ বাহ্য। মোহ মিলিয়ে গেলে ছেড়ে আসা দুজনের সত্য ভালোবাসা তার অন্তরে আপনিই ফুটে উঠেছিল।

> পৃথিবীতে দুটি মানুষ আমাকে সবচেয়ে ভালবাসিয়াছিল, আমার ছেলে আর আমার স্বামী। সে ভালোবাসা আমার নারায়ণ, তাই সে মিথ্যা সহিতে পারিল না। একটি আমাকে ছাড়িয়া গেল, একটিকে আমি ছাড়িলাম। এখন সত্যকে খুঁজিতেছি, আর নয়।

বোষ্টমীর স্বামীর ছবিটুকু বড় মধুর, বড় করুণ -

> আমার স্বামী বড় সাদা মানুষ। কোনো কোনো লোক মনে করিত তাঁহার বুঝিবার শক্তি কম। কিন্তু আমি জানি, যাহারা সাদা করিয়া বুঝিতে পারে তাহারই মোটের উপর ঠিক বোঝে। .... আমার স্বামী মাথার উপরে একজন উপরওয়ালাকে নাবসাওয়া থাকিতে পারিতেন না। এমন কি, বলিতে লজ্জা হয়, আমাকে যেন তিনি ভক্তি করিতেন। তবু আমার বিশ্বাস, তিনি আমার চেয়ে বুঝিতেন বেশি, আমি তাঁহার চেয়ে বলিতাম বেশি।..... রাত্রে স্বামীর সঙ্গে সঙ্গ হইবে। তখন তিনি নীরব এবং অন্ধকার। তখন আমার স্বামীর মন যেন তারার মতো ফুটিয়া উঠে। সে আধারে এক একদিন তাঁহার মুখে একটা আধটা কথা হঠাৎ শুনিয়া বুঝিতে পারি এই সাদা মানুষটি যাহা বোঝেন তাহা কতই সহজে বুঝিতে পারেন।

গুরুদেবের চরিত্র - চিত্রনে রবীন্দ্রনাথ অদ্ভুত সংযম দেখিয়েছেন। অল্পস্বল্প

বাস্তব চরিত্র অথবা ঘটনা রবীন্দ্রনাথের অনেক গল্পের সূত্র যুগিয়েছে, কিন্তু সে বাস্তব বস্তুর সঙ্গে কাহিনীর সম্পর্ক সাক্ষাৎ ও ঘনিষ্ট নয়। দুই একটি সে ব্যাতিক্রম আছে। বোষ্টমী তার মধ্যে একতি। বোষ্টমী মানুষটি রবীন্দ্রনাথের চিত্ত বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তাই বহুদিন তিনি বোষ্টমীর কথা ভোলেন নি। গল্পটিতে রবীন্দ্রনাথ নিজের কথা অনেকখানি বলেছেন। এমন স্বচ্ছন্দ আত্মপ্রকাশ জীবনস্মৃতি ছাড়া অন্যত্র পাইনা।

বোষ্টমি লেখা পড়ার শিক্ষা পায় নি, বেদবেদান্ত - উপনিষদ্ শোনেনি, যোগাভ্যাস করেনি। তার মানে সত্যের যে আবির্ভাব, সে তো আপনিই ঘটেছে। যিনি বর - 'যমেবৈষ বৃণুতে তেল লভ্যঃ"। সে সুন্দর বরণীয়কে বোষ্টমীর ভালোবাসাই প্রত্যক্ষ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন -

> আমি গীতা পড়িয়া থাকি এবং বিদ্বান লোকেদের দ্বারস্থ হয়ে তাদের কাছে ধর্মতত্ত্বের অনেক সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা শুনিয়াছি। কেবল শুনিয়া শুনিয়াই বয়স বহিয়া যাইবার যো হইল, কোথাও তো কিছু প্রত্যক্ষ দেখিলাম না। এতদিন পরে নিজের দৃষ্টি অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া এই শাস্ত্রহীনা স্ত্রীলোকের দুই চক্ষুর ভিতর দিয়া সত্যকে দেখিলাম। ভক্তি করিবার ছলে শিক্ষা দিবার একী আশ্চর্য প্রণালী।"

বোষ্টমী গল্পের বোষ্টমী গুরুর একটুখানি লালসার ইঙ্গিত স্বামী ও সংসার ত্যাগ করে বের হয়ে গেছে। কিন্তু কেন ? যে সমাজে লোকে বংশ - পরম্পরায় গুরুর কাছে নারীত্ব বিসর্জন করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে, সেখানে বোষ্টমীর ব্যবহার বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে। কিন্তু এ যে নূতন আবহাওয়া। বোষ্টমী নিজেকে বংশলতিকার একটি ফুল বলে মনে করতে পারে নি, পারলে সংসার ত্যাগ করত না ; সে নিজেকে স্বতন্ত্র একটি সত্তারূপে, নারীরূপে দেখেছিল ; তাই যখন ঐ লালসার আগুনে তার আশ্রয় পুড়ে গেল, তখন সংসার ত্যাগ করা ছাড়া আর উপায় নেই।

'নষ্টনীড়ে'র জীবন - জিজ্ঞাসা বিরাট প্রশ্ন-চিহ্নের সামনে থমকে দাঁড়িয়েছে। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে লেখক সেই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। তাই এই পর্যায়ের গল্পগুলি যেখানে এসে থামলো সেখানে জিজ্ঞাসা - চিহ্নের রহস্য ব্যঞ্জনা নেই - আগে পিছে আছে অন্তহীন পথ - চিহ্নের অসীম সংকেত। 'বোষ্টমী' গল্পে সেই সংকেত আরও স্পষ্ট, উজ্জ্বল। বোষ্টমী যে খাঁচা ভেঙেছে সে গুরুবুদ্ধি ও অন্ধ সংস্কারের - অন্ধ আত্মদরেরও। অপরূপ সুন্দরী ছিল আনন্দী, তাছাড়া স্বামীর মৌল-গভীর প্রাণের অজস্র দাক্ষিণ্য লাভ করেছিল যৌবনের নব উন্মেষিত প্রভাতে, অত-পাওয়া, মূল্য না দিয়ে পাওয়া তার নিজের মনকে কেবল নিজের ভেতরই ঠেলে দিচ্ছিল। ডিমের কুসুম খোলসের ভেতর জমে জমে যাচ্ছিল। বাইরেকে দেখবার, তাকে যোগ্য মূল্য

টিপ্পনী

দেবার সাধ এবং সাধ্য আচ্ছন্ন হয়েছিল সেদিন আনন্দীর মধ্যে; - তার -

> "গোপাল আসিয়া দেখিল, তখনো তাহার জন্য ননী তৈরি নাই, তাই সে রাগ করিয়া চলিয়া গেছে।"

ছেলেকে কোলে পেয়ে আনন্দী মা হতে পারেনি; ছেলেকে অনাদরে হারিয়ে তার অতৃপ্ত মাতৃত্ব উদ্বাহু দুরন্ত শিশুর মত লাফিয়ে উঠেছিল। আনন্দীর ছেলেই নিজের মৃত্যু দিয়ে তার আত্মাদরের ডিমের খোলস বিদীর্ণ করে দিয়ে গেল। তাই, গুরু যেদিন আনন্দীর ম্লান-সিক্ত দেহসৌন্দর্যের উল্লেখ করেছিলেন, সেদিন আর সে ঘরে থাকতে পারে নি। তার স্বামী তার মনটা একরকম করে দেখে নিয়েছিল - তবু হয়তো তারা একসঙ্গে ঘর করতে পারত ; কিন্তু সে ঘর সে নিজে হাতে ভেঙে দিয়ে এসেছে। কারণ, পৃথিবীতে দুটি মানুষ তাকে ভালবেসেছিল - ছেলে আর স্বামী। আনন্দী বলেছে -

> "সে ভালবাসা আমার নারায়ণ, তাই সে মিথ্যা সহিতে পারিল না। একটি আমাকে ছাড়িয়া গেল। একটিকে আমি ছাড়িলাম। এখন সত্যকে খুঁজিতেছি, আর ফাঁকি নয়।

রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তি থেকেই জানা যায় এই বোষ্টমী তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার সৃষ্টি। আনন্দী কবির শিলাইদহ জমিদারির অধিবাসিনী সর্বক্ষেপি। বোষ্টমী কবিকে 'গৌর' বলত - প্রণাম করতো, তাঁর 'প্রসাদ' ও পেত। অপর কেউ তার জীবনের ইতিহাস জানত না।

লেখক নিজে বলেছেন - "বোষ্টমী অনেকখানিই সত্যি। ..... শেষ অংশটায় কিছু বদল করেছি। সন্ন্যাসী গুরুকে যে ত্যাগ করেছিল সেটা সত্য নয় - সংসার ত্যাগ করেছিল বটে।"

এই চোখে দেখা বাস্তবে - জানা ঘটনাকে কবি মনের মাধুরি মিশিয়ে রচনা করেছেন - কিছুটা পাল্টে নিয়ে। বোষ্টমী গল্পটি সৃষ্টি হিসাবে অনবদ্য। বলা যেতে পারে এ যেন কবির আত্ম-সৃষ্টি। প্রতীচ্য প্রাবন্ধিক মন্‌টেইন তাঁর বিচিত্র বিষয়ক Essais গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছিলেন, "আমিই আমার গ্রন্থের বিষয়বস্তু।" আলোচ্য গল্পের স্রষ্ঠা রবীন্দ্রনাথও একথা বলতে পারেন।

সবুজপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের একটিমাত্র গল্পেই শিলাইদহের পটভূমিতে শিলাইদহের একটি চরিত্র নবজন্ম পেয়েছে। সেটি বোষ্টমী কালানুক্রমিক বিচারে 'বোষ্টমী' গল্পগুচ্ছের শেষ গল্প যে - গল্পে গ্রামের মাটিতে বিকশিত হয়ে উঠেছে গ্রামের একটি চরিত্র। শুধু তাই নয় শিল্পরূপের দিক থেকেও 'বোষ্টমী' দুটি বিষয়ে সবুজপত্র অদ্বিতীয়। এক, ভাবসত্যের ভিত্তিতে এখানে গল্পের বস্তুসত্য গড়ে উঠেনি,

টিপ্পনী

বিশেষ অভিজ্ঞতার বস্তুসত্যের ভিত্তিতেই গল্পের ভাবসত্য নিষ্কাশিত হয়েছে ; আর দুই, লেখকের উত্তমপুরুষকে সবচেয়ে বেশি প্রশ্রয় দিয়েই এই গল্পে লেখকের খবরদারি থেকে সবচেয়ে বেশি মুক্ত হয়েছে চরিত্রের উত্তমপুরুষ।

বোষ্টমী রচনার প্রেক্ষাপট :

টিপ্পনী

তৃতীয়বার পাশ্চাত্যভ্রমণে বেরোলেন রবীন্দ্রনাথ ১৯১২ খ্রীঃ ২৭শে মে। আসলে আরো দুমাস আছে ১৯ মার্চ যাত্রার দিন স্থির হয়েছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ হয়ে পড়ায় সেবার যাত্রা পন্ড হয়। রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীকে সঙ্গে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ২৪ মার্চ বিশ্রামের জন্য শিলাইদহ রওনা হন এবং সম্ভবত ১২ এপ্রিল শিলাইদহ থেকে যাত্রা করেন শান্তিনিকেতনে। নির্জন কুঠিবাড়িতে আত্মমগ্ন একাকিত্বে অতিবাহিত হল চৈত্র মাসের কুড়িটি বসন্তের দিন । পিতার শিলাইদহবাসের এই দিনগুলি প্রসঙ্গে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ তাঁর অন দি এজেস্ অফ টাইম' বইতে লিখেছেন -

> "There was no one is disturb the quiet of such peaceful pastoral surrounding except an occasional visit from vaishnavi .... The case with which this illiterate woman talked about philosophy and religion and her simple and devout faith moved Father deeply."

সবুজপত্রে বোষ্টমী গল্প বেরোবার আগে শিলাইদহের এই বোষ্টমীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই দেখাটাই শেষ দেখা, কিন্তু এটাই প্রথম দেখা নয়।

'শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে শচীন্দ্রনাথ অধিকারী এই বোষ্টমীর ইতিবৃত্ত লিখেছেন। তাঁর সেই রচনা থেকে প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্য এখানে সংকলিত হল।

বোষ্টমীর নাম সর্বখেপি। শিলাইদহের একটি বিশাল তমালগাছের তলায় তাঁর কুটির। গেরুয়া শাড়ি পরে, এক আঁচল ফুল নিয়ে, তিনি মাঠে আলপথে খঞ্জনি বাজিয়ে 'গৌর গৌর' গান গেয়ে যেতেন। এই অঞ্চলের নিম্নশ্রেনীর হিন্দুদের মধ্যে তাঁর বারো-চোদ্দজন শিষ্য। সকাল বিকাল তিনি নামগান করতেন আর আলাপ চলত শিষ্যদের সঙ্গে। একবার বোষ্টমী অষ্টপ্রহর মহোৎসবের আয়োজন করেন তাঁর কুঠির সংলগ্ন জমিতে - পাশ্ববর্তী গ্রামগুলি থেকে অনেক বোষ্টম-বোষ্টমী দলবল নিয়ে ওই মহোৎসবে এসে কীর্তনে যোগ দেন ; বোষ্টমী তাদের ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করেন। গ্রামের ভদ্রপড়ায় বোষ্টমী কারোর সঙ্গে মিশতে পারতেন না, কারণ তাঁর 'সহজিয়া ধর্মমত ও ক্রিয়াকান্ড' ভদ্রসমাজের অসহ্য ছিল। মহোৎসবের ভূরিভোজ

দেখে তাঁর সন্দেহ হল, খ্যাপাখেপির কান্ড, ভিক্ষে করে খায়, এত টাকা পায় কোথায় ? সর্বখেপিকে তাঁরা শিলাইদহ থেকে তাড়িয়ে তবে ছাড়লেন।

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে থাকলে বোষ্টমী দু'বেলা কুঠিবাড়িতে গিয়ে তার পাতের প্রসাদ পেতেন। তিনি ফুলের মালা গেঁথে রবীন্দ্রনাথকে দিতেন। রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ উঠলেই তিনি ভক্তিতে 'গৌর গৌর' বলে মাথায় হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করতেন আর গুণগুণিয়ে গেয়ে উঠতেন, 'গৌরসুন্দর মোর'। বোষ্টমীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই ঘনিষ্টতায় আশ্চর্য হবারই কথা । দুজনের এই অন্তরঙ্গতায় শিলাইদহের ভদ্রলোকেরাও খুব মাথা ঘামান । "জনসাধারণের বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ এঁর জীবিকা নির্বাহের জন্য নাকি কুড়ি-বাইশ বিঘা জমি দিয়েছিলেন বিনা নজরে।"

সবুজপত্র পত্রিকায় বোষ্টমী প্রকাশ পায় ১৩২৩ বঙ্গাব্দের আষাঢ়। সর্বখেপির বিষয়ে এর পরেও রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন গদ্য রচনায় লিখেছেন বহুবার।

১৯২২ খ্রী প্রকাশিত 'ক্রিয়েটিভ ইউনিট' গ্রন্থের "অ্যান ইন্ডিয়ান ফোক রিলিজন" প্রবন্ধে লিখেছেন -

> One day in a small village in Bengal, an ascetic woman from the neighborhood came to see me. She had the name 'Sarva-Khepi' given to her by the village people, the meaning of which is the women who is mad about all things." She fixed her star-like eyes upon my face and startled me with the question,'when are you coming to meet me underneath the treas ?'Evidently she pitied me who lived (according to her) prisoned behind walls, banished away from the great meeting place of the All, where she had her dwelling. Just at that moment my gardener came with his basket, and when the woman understood that the flowers in the vase on my table were going to be thrown away from the great meeting - place of the All, where she had her welling. Just at that moment my gardener came with his basket, and when the women understood that the flowers in the vase on my table were going to be thrown away, to make place for the fresh ones, she

টিপ্পনী

looked pained and said to me, 'you are always engaged reading and writing; you do not see.' Then she took the discarded flowers in her palms, kissed them and touched them with her for ahead, and reverently murmured to herself, 'Beloved of my heat.' I felt that this woman, in her direct vision of the infinite personality in the heart of all things, truly represented the spirit of India."

১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দের ১১ ফ্রেব্রুয়ারি আর ১৫ ফেব্রুয়ারি পরপর দুদিন পশ্চিম - যাত্রীর ডায়েরি বইতে রবীন্দ্রনাথ সর্বখেপিকে স্মরণ করলেন । ১১ ফ্রেব্রুয়ারি লিখলেন, -

"বৈষ্ণবী আমাকে বলেছিল, "কার বাড়িতে বৈরাগীর কখন অন্ন জোটে তার ঠিকানা নেই; সে অন্নে নিজের জোর দাবি খাটে না, তাই তো বুঝি এ অন্ন এ অন্ন তিনিই জুগিয়ে দিলেন।"

পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরির পরিশিষ্ট অংশে সন্নিবিষ্ঠ ১৫ ফ্রেব্রুয়ারির ডায়েরিতে রবীন্দ্রনাথ আবার লিখলেন -

একদিন আমার মালী ফুলদানি থেকে বাসি ফুল ফেলে দেবার জন্য যখন হাত বাড়ালো, বৈষ্ণবী তখন ব্যথিত হয়ে বলে উঠল, "লিখতে পড়তেই তোমার সমস্ত মন লেগে আছে, তুমি তো দেখতে পাও না।" তখন চমকে উঠে আমার মনে পড়ে গেল, হাঁ তাই তো বটে। ওই 'বাসি' বলে একটা অভ্যস্ত কথার আড়ালে ফুলের সত্যকে আর আমি সম্পূর্ণ দেখতে পাই নে। সে আছে সেও আমার কাছে নেই ; নিতান্তই অকারণে, সত্য থেকে, সুতরাং আনন্দ থেকে বঞ্চিত হলুম । বৈষ্ণবী সেই বাসি ফুলগুলিকে অঞ্চলের মধ্যে সংগ্রহ করে তাদের চুম্বন করে নিয়ে চলে গেল।"

১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ সেপ্টেম্বর 'বোষ্টমী' গল্প সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ হেমন্তবালা দেবীকে লেখেন -

"বোষ্টমী অনেকখানি সত্যি। এই বোষ্টমী স্বয়ং আমার কাছে এসে গল্প বলতো। শেষ অংশটায় অল্প কিছু বদল করেছি। বোষ্টমী যে গুরুকে ত্যাগ করেছিল সেটা সত্য নয় - সংসার ত্যাগ করেছিল বটে। একদিন আমাকে এসে বললে, কাল রাত্রে স্বপ্নে তোমার পা

টিপ্পনী

দুখানি বুকের উপর পেয়েছিলুম - মোজা ছিল না - ঠান্ডা। এই তো দূরে থেকেও তোমাকে পেয়েছি। কাছে আসবার এই আকাঙ্ক্ষা এ তো মোহ - এই বলে সে চলে গেল, আর তাকে দেখি নি।"

টিপ্পনী

হেমন্তবালাকে লেখা এই চিঠির শুরুর দিকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'একটা কথা মনে রেখো, গল্প ফোটোগ্রাফ নয় তা 'বোষ্টমী' গল্প সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য এই স্বীকারোক্তি থেকেই ধরা পড়েছে। প্রথমত, সর্বখেপি সংসার ত্যাগ করলেও গুরুকে ত্যাগ করেনি, অন্যদিকে আনন্দী গুরুকেও ত্যাগ করেছিল সংসারকেও ত্যাগ করেছিল। দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথের পা দুখানি রাত্রের স্বপ্নে বুকের উপর পেয়ে সর্বখেপি বলেছিল যে, দূরে থেকেও যখন পাওয়া গেল তখন কাছে আসবার এই আকাঙ্ক্ষা, এ তো মোহ ; অন্যদিকে আনন্দী ভোরে বিছানায় যেমনি উঠে বসেছে অমনি রবীন্দ্রনাথের চরণ পেয়ে বলেছে, কতক্ষণ মাথায় ধরিয়া রাকিলাম। সে তো খুব হইল তবে আর আমার এখানে আসিবার প্রয়োজন কী ? প্রভু এ আমার মোহ নয় তো ? ঠিক করিয়া বলো।" লক্ষ করবার বিষয় সর্বখেপির রাত্রের স্বপ্ন আনন্দীর ভোরের স্বপ্নেও ঠিক নয়, বরং বললা যায় ভোরের একটি রহস্যময় সত্যোপলব্ধিতে রূপান্তরিত হয়েছে, তাছাড়া সর্বখেপি রবীন্দ্রনাথের পা দুখানি পেয়েছে বুকের উপর, আর আনন্দী তা ধরে রেখেছে মাথায়। সর্বখেপি নিশ্চয়াত্মক ভঙ্গিতে বলেছে যে, এ তো মোহ, আর আনন্দী প্রশ্নাত্মক ভঙ্গিতে বলেছে, "প্রভু এ আমার মোহ নয় তো ? আনন্দীর এই প্রশ্ন আসলে রবীন্দ্রনাথকে নয়, নিজেকে। সর্বখেপি মোহ জেনেই রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য পরিত্যাগ করেছে, আনন্দী মোহ নয় বুঝেই গল্পের শেষে রবীন্দ্রনাথকে গড় করে প্রণাম করে আসলে প্রণাম করেছে তার আরাধ্যকে , মনে হয় সর্বযোগি গুরুকে ত্যাগ করেনি বলেই নিজের প্রতি সন্দেহে রবীন্দ্রনাথকে ত্যাগ করেছিল। কিন্তু আনন্দী গুরুকে ত্যাগ করতে পেরেছিল বলেই নিজের প্রতি সাময়িক সন্দেহকে কাটিয়ে উঠে রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করেই রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করেছে। এর এই ভাবেই সর্বখেপির বস্তুসত্যকে অবলম্বন করেও তাকে শেষ পর্যন্ত অতিক্রম করেই আনন্দীর ভাবসত্য 'বোষ্টমী' গল্পে শিল্পিত হয়ে উঠেছে।

১৩২১ বঙ্গাব্দের আষাঢ়ে সবুজপত্রে 'বোষ্টমী' প্রকাশিত হবার পর প্রমথ চৌধুরীকে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন -

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
170

যাই হোক আমার এই লেখাগুলিকে গল্পপিপাসু পাঠকদের বেশ ঢক্ ঢক্ করে খাবার মত হচ্ছে না - এগুলো গল্প না বল্লেই হয়।"

বিশেষভাবে বোষ্টমী গল্পের দিকে তাকালে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। 'বোষ্টী' গল্পের প্রথমার্ধে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের আত্মকথন এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বোষ্টমীর কথোপকথন। এই সব কথাবার্তার মধ্যে

কোনো ঘটনার বিবরন নেই, শুধু বোষ্টমীর চরিত্রটিই তৈরি হয়ে উঠেছে। এর আগেও রবীন্দ্রনাথ অনেক চরিত্রমুখ্য গল্প লিখেছেন যেখানে ঘটনা গৌণ হয়ে চরিত্রের আঁতের কথা প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু 'বোষ্টমী' গল্পের প্রথমার্ধে ঘটনাকে গৌণ করে নয়, ঘটনাকে একেবারে শূন্য করে দিয়ে গল্প হয়ে উঠেছে শুধুমাত্র সংলাপগ্রথিত চরিত্রায়ন - এই দিকে দিয়ে বোষ্টমী রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের শিল্পশালায় সম্পূর্ণ অভিনব। কবির ভাষায় একে 'গল্প না বল্লেই হয়'।

টিপ্পনী

সবুজপত্র পর্বের রবীন্দ্র গল্পমালায় 'বোষ্টমী' আরো একদিক দিয়ে স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জল। এই গল্পগুলির অধিকাংশ উত্তমপুরুষে বিন্যস্ত এইসব গল্পে লেখকের উত্তমপুরুষ গল্পের উত্তমপুরুষ থেকে নিজেকে বেশিরভাগ সময়েই নির্লিপ্ত রাখতে পারে নি। কিন্তু 'বোষ্টমী' গল্পে গল্পলেখক স্বয়ং গল্পের একটি চরিত্র হয়ে ওঠার ফলে বোষ্টমী চরিত্রটি গল্পলেখকের আত্মপ্রক্ষেপ থেকে সম্পূর্ণভাবে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে। সবুজপত্রের একমাত্র এই গল্পটিতেই দুটি উত্তমপুরুষের স্বচ্ছন্দ সহাবস্থান। গল্পের প্রথমার্ধে গল্পলেখকের 'আমি' বোষ্টমীর কথা বলেছেন, আর গল্পের শেষার্ধে বোষ্টমীর 'আমি' তার নিজের কথা বলেছে। অপরের চোখে দেখা আর নিজের চোখে দেখা - এই দুই দেখা একসঙ্গে মিলিত হওয়ার বহিরঙ্গ আর অন্তরঙ্গের ভারসাম্যে বোষ্টমীর চরিত্রটি সামগ্রিক একটি সম্পূর্ণতা পেয়েছে। বোষ্টমী যেখানে নিজেই নিজেকে দেখেছে সেখানে ভাষায় এসেছে বিশ্লেষণের তীক্ষ্ণতা, আর গল্প লেখক যেখানে বোষ্টমীকে দেখেছেন সেখানে ব্যঞ্জনার সূক্ষ্মতায় সুন্দর।

গল্পের পর্যালোচনা :

গল্পের নামকরণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ 'বোষ্টমী'। লক্ষ করতে হবে শব্দটি বৈষ্ণবী নয়, বোষ্টমী - অর্থাৎ যার বৈষ্ণবতা শাস্ত্রীয় নয়, প্রাকৃত। যে বৈষ্ণব ধর্মকে রবীন্দ্রনাথ বলেন folk religion তা সহজিয়া বৈষ্ণবধর্ম ছাড়া আর কী ? নিষ্টাবান গৃহী বৈষ্ণব পরিবারে বালিকা বয়সে আনন্দীর বিয়ে হয়েছিল তার শ্বশুরবংশ জাতিতে ব্রাহ্মণ নয় বটে, কিন্তু তাদের গুরুবংশ ব্রাহ্মণ। গুরুবংশেই তাঁআই প্রতিপালন করতেন। দুই বংশে পরম্পরাক্রমে ঘনিষ্ঠতা ছিল বলেই আনন্দীর আনন্দীর স্বামী বাল্যকালে তাঁর চেয়ে বয়সে কিছু কম গুরুঠাকুরের সঙ্গে খেলা করতেন, তখন থেকেই গুরুঠাকুরকে তিনি নিজের মনপ্রাণ সমর্পন করে দিয়েছিলেন। কিন্তু গুরুঠাকুর আনন্দীর স্বামীকে বোকা বলেই জানতেন। সেইজন্য তার উপর বিস্তর উপদ্রব করেছেন। অন্যসঙ্গীদের সঙ্গে মিলে পরিহাস করে তাঁকে যে কত নাকাল করেছেন তার সীমা নেই, আনন্দী যখন বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে এসেছে তখন অবশ্য গুরুঠাকুরকে সে দেখেনি। শিষ্যবংশের যে বাল্যসখাকে গুরুঠাকুর নিত্য অপমান করতেন তারই জোগানো খরচে গুরুঠাকুর কাশীতে অধ্যয়ন করতে

গিয়েছেন।

আনন্দীর স্বামী শুধু কুলধর্মে নয়, শীলধর্মেও একজন আদর্শ গৃহস্থ বৈষ্ণব। শান্ত, সংযত ও স্বল্পেই সন্তুষ্ট। যেটুকু তাঁর দরকার সেটুকু তিনি হিসেব করে চলতেন - তার চেয়ে বেশি যা তা তিনি বুঝতেন না বা জানতেও চাইতেন না। স্বামীর কথা বলতে গিয়ে আনন্দী রূপের মধ্যে স্বরূপকে দেখার দৃষ্টি অন্তর্ভেদী হয়ে উঠেছে ; তিনি বড়ো সাদা মানুষ ছিলেন, "কোনো কোনো লোকে মনে করত তাঁর বুঝবার শক্তি কম, কিন্তু বোষ্টমী জানে যে, সাদা করে যারা বুঝতে পারে তারাই মোটের উপর ঠিক বোঝে। পনেরো বছর বয়সে আনন্দীরএকটি ছেলে হয়েছিল। কিন্তু শরীরে সে মা হয়েছিল কিন্তু মানসিক মাতৃত্ব তখনো তার হয় নি। বয়সে কাঁচা ছিল বলে আনন্দী তার ছেলেকে যত্ন করতে শেখেনি, পাড়ার সই-সাথীদের সঙ্গে মেশবার জন্য তার মন ছুটত। ছেলের জন্য ঘরে আটকে থাকতে হয় বলে এক এক সময় তার রাগ হত ছেলের উপরে । গভীর অনুশোচনায় বোষ্টমী বলেছে, "আমার গোপাল" এসে দেখল, তখনো তার জন্য ননী তৈরি নেই, তাই সে রাগ করে চলে গেছে - 'আমি আজও মাঠে মাঠে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

ছেলে ছিল বাবার 'নয়নের মণি'। আনন্দী ছেলেকে যত্ন করতে শেখেনি বলে তার বাপ কষ্ট পেত ; কিন্তু তাঁর 'হৃদয় সে ছিল বোবা', 'আজ পর্যন্ত তাঁর দুঃখের কথা কাউকে বলতে পারেন নি। মায়ের মতোই তিনি ছেলের যত্ন করতেন রাত্রে ছেলে কাঁদলে আনন্দীর অল্পবয়সের গভীর ঘুম তিনি ভাঙাতে চাইতেন না, আনন্দী জানতেও পারেনি, কতদিন নিজে রাত্রে উঠে দুধ গরম করে খাইয়ে ছেলেকে কোলে নিয়ে তিনি ঘুম পাড়িয়েছেন। তাঁর সকল কাজই এমনি নিঃশব্দে । পূজাপার্বণে জমিদার বাড়িতে যখন যাত্রা বা পালাগান হত, তিনি রাত জাগতে না পারার ছুতোয় ছেলেকে নিয়ে থাকতেন যাতে আনন্দী যেতে পারে। ছেলেকে তার পাওনা মাতৃস্নেহ পিতাই পূর্ণ করে দিতেন, কিন্তু ছেলে তবুও মাকেই সকলের চেয়ে বেশি ভালোবাসত । সে যেন বুঝত, সুযোগ পেলেই মা তাকে ফেলে চলে যাবে, তাই সে যখন মায়ের কাছে থাকত তখনও ভয়ে ভয়ে থাকত। মাকে অল্প পেয়েছিল বলেই মাকে পাবার আকাঙ্ক্ষা তার কিছুতেই মিটতে চাইত না। মায়ের জন্য এই অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাই ছেলেটি মর্মান্তিক অপঘাত মৃত্যুর কারন।

একদিন শ্রাবণ মাসের দ্বিপ্রহর বেলাটাকে যখন ঘন কালো মেঘ একেবারে আগাগোড়া মুড়ে রেখেছে তখন রানীসাগর দিঘিতে আনন্দী স্নান করতে যাবার সময় মায়ের সঙ্গ নেবার জন্য ছেলে রোজকারমত কান্না জুড়ে দিল। কিন্তু দিঘির ঘাটে সঙ্গিনীদের সঙ্গে আনন্দীর মিলনের জায়গা, সেখানে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে তার খবরদারি করতে তার ভালো লাগত না। তাদের হেঁসেলের কাজ করত নিস্তারিনী -

টিপ্পনী

তাকেই ছেলের দায়িত্ব দিয়ে আনন্দী চলল ঘাটে একটা ডুব দিয়ে আসতে।

কিন্তু একটা ডুব দিয়ে চলে আসার কোন ইচ্ছাই তার ছিল না। ঠিক সেই সময়টিতে ঘাট জনশূন্য। সঙ্গিনীদের আসবার অপেক্ষায় আনন্দী সাঁতার দিতে লাগল - মেয়েদের মধ্যে কেবল সেই সাঁতার দিয়ে এই দিঘি ওপার - ওপার করতে পারত। বর্ষার সেই কূলভরা দিঘি যখন সে প্রায় অর্ধেকটা পার হয়ে গেছে, এমনি সময় পিছন থেকে সে ছেলের ডাক শুনতে পেল, ফিরে দেখল, ছেলে ঘাটের সিঁড়িতে নামতে নামতে তাকে ডাকছে। আনন্দী চিৎকার করে তাকে নিষেধ করল বলেই ছেলে হাসতে হাসতে সিড়ি দিয়ে আরো নামতে লাগল ভয়ে আনন্দীর হাত পায়ে যেন খিল ধরে এল - পার হতেই যেন সে আর পারছে না। তবু পার হয়ে এসে সেই মায়ে কোলের কাঙাল ছেলেকে' যখন সে 'জলের তলা থেকে তুলে কোলে নিল তার আগেই 'পিছল ঘাটে সেই দিঘির জলে' ছেলের হাসি চিরদিনের মতো থেমে গিয়েছে, থেমে গিয়েছে তার মা ডাক। নিস্তারিনী পারেনি ছেলের রক্ষণাবেক্ষণ করতে।

আনন্দীর স্বামীর বুকে যে কতটা বাজল সে কেবল অন্তর্যামীই জানেন। আনন্দীকে যদি তিনি গালি দিতেন তো ভালো হত, কিন্তু তিনি তো কেবল সহ্য করতে পারেন, কিছু বলতে পারেন না। এদিকে বেঁচে থাকতে যে-ছেলেকে আনন্দী বরাবর ফলে ফেলে গেছে, মৃত্যুর পর সেই ছেলেই দিনরাত তার মনকে আঁকড়ে ধরে রইল। এমনি করে আনন্দী যখন শুধু পুত্রশোকেই নয়, পুত্রের প্রতি অনাদরে অপরাধজনিত অন্তর্দাহে 'একরকম পাগল' হয়ে আছে, সেই সময় গুরুঠাকুর কাশী থেকে দেশে ফিরলেন। আনন্দীর বয়স তখন হয়তো আঠারো। ছোটবেলার খেলার সাথী দীর্ঘকাল বিচ্ছেদের পর যখন বিদ্যালাভ করে ফিরে এলেন তখন আনন্দীর স্বামীর হৃদয় বান্ধুর প্রতি ভক্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠল। তিনি গুরুঠাকুরের সামনে কোন কথাই বলতে পারতেন না।

আনন্দীর স্বামী গুরুঠাকুরকে অনুরোধ করলেন আনন্দীকে সান্ত্বনা দেবার জন্য। গুরু আনন্দীকে শাস্ত্র শোনাতে লাগলেন। কিন্তু শাস্ত্রের কথায় তার কাছে গুরুর মুখ নিঃসৃত বাণী বলেই 'সে-সব কথার যা কিছু মূল্য।' গুরুর প্রতি স্বামীর প্রবল ভক্তি তাদের সংসারকে সর্বত্র ভরে রেখেছিল 'মৌচাকের ভিতরকার মধুর মতো। গুরুর প্রতি এই মধুস্বাদী ভক্তিরসে নিমগ্ন হয়ে তবে আনন্দী স্বান্ত্বনা পেয়েছে। তাই তার 'গুরুর রূপেই সে দেখতে পেয়েছে দেবতাকে। গুরু এসে আহার করবেন তারপর তাঁর প্রসাদ পাবে - প্রতিদিন সকালে উঠে আনন্দীর এই কথাটি মনে পড়ত আর সে লেগে পড়ত তারই আয়োজনে ও তাঁর জন্য সে রান্না করতে পারত না ব্রাহ্মণ নয় বলে, তাতে আনন্দী খুবই দুঃখবোধ করত।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

গুরুভক্তির তলায় গুরুর প্রতি আনন্দীর এই আকর্ষণ ভক্তিভাবনায় অস্পষ্টভাবে চাপা পড়েছিল। কিন্তু আনন্দীর প্রতি গুরুর আকর্ষণ অনেক স্পষ্ট। আনন্দীর স্বামী যখন দেখতেন আনন্দীর কাছে 'শাস্ত্র ব্যাখ্যা' করবার জন্য গুরুর বিশেষ উৎসাহ তখন তিনি ভাবতেন, বুদ্ধিহীনতার জন্য গুরুর কাছে তিনি বরাবর অশ্রদ্ধা পেয়েছেন বটে, কিন্তু স্ত্রী এবার বুদ্ধির জোরে গুরুকে খুশি করতে পারল এই তাঁর সৌভাগ্য। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভক্তি এর ফলে আরো বেড়ে যেতে।

আনন্দীর স্বামীর এই ধারণা অবশ্যই ভুল। গুরু যে আনন্দীর কাছে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করতেই বিশেষ উৎসাহী তা যেমন ঠিক নয়, তেমনি আনন্দী যে তার বুদ্ধির জেরেই গুরুকে খুশি করতে পেরেছে সেটাও মিথ্যা। কিন্তু বোষ্টমীর কথনে স্বামীর অকপট এই নির্মল সারল্যই শাস্ত্রবিদ গুরুর মার্জিত ভন্ডামির তুলনায় অনেক বেশি মর্যাদা পেয়েছে।

বাসনাকে এইভাবে তলায় চাপা দিয়ে চার পাঁচ বছর কোথা দিয়ে যে কেমন করে কেটে গেল তা চোখে দেখতে পাওয়া গেল না। সমস্ত জীবনটাই এমনি করে কেটে যেতে পারত, কিন্তু 'গোপনে কোথায় একটা চুরি' চলছিল - সেটা আনন্দীর কাছে ধরা না পড়লে অন্তর্যামীর কাছে একদিন ধরা পড়ে গেল। আর তারপর একদিন একটি মুহূর্তে সমস্ত উলটপালট হয়ে যাওয়ার পালা।

সেদিন ফাল্গুনের সকালবেলায় স্নান সেরে 'ভিজাকাপড়ে' আনন্দী ঘরে ফিরছে। পথের একটি বাঁকে 'আমতলায়' গুরুঠাকুরের সঙ্গে তার দেখা হয়। কাঁধে একখানি গামছা নিয়ে সংস্কৃত মন্ত্র আওড়াতে তিনি স্নানে যাচ্ছেন। গুরুর সঙ্গে দেখা হওয়াতে আনন্দী একটু লজ্জাব পাশ কাটিয়ে চলে যাওযাবার চেষ্টা করেছে তখন গুরু তার নাম ধরে ডাকলেন। জড়োসড়ো হয়ে মাথা নিচু করে আনন্দী দাড়াঁয়, গুরু তার দিকে তাকিয়ে বলেন, "তোমার দেহখানি সুন্দর"। কেমন করে আনন্দী বাড়ি গেল কিছু জ্ঞান নেই। একেবারে সেই ভিজে কাপড়েই ঢুকল ঠাকুর ঘরে, কিন্তু চোখে যেন ঠাকুরকে দেখতে পেল না - ঠাকুরকে ডাকে সে, ঠাকুর তার দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সেদিন আহার করতে এসে গুরু আনন্দী খোঁজ করলেন। স্বামী ও তাকে খুঁজে বেড়ালেন, কোথাও দেখতে পেলেন না।

কেমন করে আনন্দীর দিন কাটল জানে না সে। রাত্রে স্বামীর সঙ্গে দেখা হবে তখন যে সমস্ত নীরব এবং অন্ধকার। কিন্তু নীরব সেই অন্ধকারেও কি কিছু লুকানো থাকবে ? গুরুভক্তিকে ঘিরে তাদের দাম্পত্য। সংসারের কাজ সেরে আনন্দীর আসতে দেরি হলেও স্বামী তার জন্য বিছানায় অপেক্ষা করেন - প্রায়ই তখন তাদের গুরুর বিষয়ে কোনো না কোনো কথা হয়। আজ কি আনন্দী স্বামীর সঙ্গে গুরুর কথা আর বলতে পারবে ?

স্বামীর মুখোমুখি যাতে না হতে হয় সেই অভিপ্রায়েই রাত্রির প্রায় তৃতীয় প্রহরে এসে আনন্দী দেখল স্বামী তার জন্য অপেক্ষা করতে করতে খাটে না শুয়ে নীচে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছেন। অতি সাবধানে শব্দ না করে আনন্দী শুয়ে পড়ল তাঁর 'পায়ের তলায়' অপরাধিনী নারী। ঘুমের ঘোরে স্বামী একবার পা ছুঁড়লেন। অজ্ঞানকৃত সেই পদাঘাত আনন্দী বুকের মধ্যে এসে লাগল। স্বামীর দেওয়া এই 'শেষদান'কে সম্বল করেই সে সংসার ত্যাগের সংকল্প নিয়েছেন।

টিপ্পনী

পরদিন ভোরে যখন স্বামীর ঘুম ভাঙল তখন আনন্দী স্বামীর পায়ের কাছে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করে তার সংসার ত্যাগের সংকল্প স্বামীর কাছে প্রকাশ করল ; তার মাথার দিব্য, স্বামী যেন অন্য স্ত্রী বিবাহ করেন - সে বিদায় নিল।

আনন্দী সংসার ত্যাগ করল কেন ? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে গল্পের শেষে স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথনটি একবার ভালো করে দেখে নেওয়া দরকার -

স্বামী : তুমি একী বলিতেছ। তোমাকে সংসার ছাড়িতে কে বলিল ?

আনন্দী : গুরুঠাকুর।

স্বামী : গুরুঠাকুর ! এমন কথা তিনি কখন বলিলেন।

আনন্দী : আজ। সকালে যখন স্নান করিয়া ফিরিতেছিলাম। তার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। তখনি বলিলেন।

স্বামী : এমন আদেশ কেন করিলেন।

আনন্দী : জানি না। তাঁকে জিজ্ঞাসা করিয়ো, পারেন তো তিনি বুঝাইয়া দিবেন।

আনন্দী : হয়তো গুরু বুঝিতে পারেন, কিন্তু আমার মন বুঝিবে না। আমার সংসার করা আজ হইতে ঘুচিল।

স্বামী : চলো না, দুজনে একবার তাঁর কাছেই যাই।

আনন্দী : তাঁর সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না।

এই সংলাপ থেকে বোঝা যায় আনন্দীর কথায় পালিয়ে নিজেকে বাঁচানোর কাপুরুষতার বদলে কঠিন বিদ্রূপে গুরুকে প্রত্যাখ্যান করবার বলিষ্ঠতাই নির্ভীকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষত গুরু কেন তাকে সংসার ছাড়বার আদেশ করলেন - স্বামীর এই প্রশ্নের উত্তরে আনন্দী যখন তীব্র শ্লেষে বলে যে, তাকেই জিগেস কোরো, পারেন তো তিনিই বুঝিয়ে দেবেন, তখন নির্ভীক আনন্দীর দীপ্তি টের পাওয়া যায়। গুরুর মুখদর্শন করতে সে আর চায় না পাছে আর তিক্ত অনীহা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

শাস্ত্রবিদ্ গুরুর মধ্যে নিহিত এই অশুচিতায় সমস্ত শাস্ত্রধর্ম সম্বন্ধেই আনন্দীর আস্থা টলে গিয়েছে।

তাহলে আনন্দী সংসার ত্যাগ করল কেন ? স্বামীর প্রতি সত্য নিষ্ঠায় সে যে মুহূর্তের জন্যেও গুরুর বাসনায় চঞ্চল হয়েছিল তা আর কেউ জানলেও তার মন জানে। মনের মধ্যে এই কালিমা নিয়ে সে কি করে ওই সাদা মনের মানুষটিকে ঠকাবে। স্বামীর ব্যাকুল অনুনয় তাকে বারবার সংসারে ফেরাবার চেষ্টা এ সবের মধ্যে দিয়ে মিতবাক মানুষটির নির্ভরতা, ভালোবাসা সবই প্রকাশ পেয়েছে। আনন্দী জানে স্বামী তার মনকে একরকম করে দেখে নিলেন। আনন্দী স্বামীকে ছেড়েই স্বামীর প্রতি তার ভালোবাসাকে সবচেয়ে সত্য মূল্য দিয়ে গেল।

টিপ্পনী

গল্পের শেষে বোষ্টমী বলেছে সে সত্যকে খুঁজছে, আর ফাঁকি নয়। এরপর সে গড় হয়ে রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করেছে। কিন্তু এ প্রণাম ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে নয়, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে, তার নিজের মধ্যে এবং সমস্ত মানুষের মধ্যে যিনি মানুষের মানুষ তাঁকে প্রণাম। কেন সে নিজের ভ্রষ্টতার এই কাহিনী লেখককে শোনাল ? রবীন্দ্রনাথের ভিতরের মানুষটি যেন সাক্ষী থাকেন যে, বোষ্টমী তার নিজের ভিতরের মানুষটির সঙ্গে একদিন মিথ্যাচার করেছিল বটে, কিন্তু সেই মিথ্যাচারের প্রায়শ্চিত করে সে তার সত্যনিষ্ঠার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। বোষ্টমীর প্রণাম শুধু বোষ্টমীকে নয় রবীন্দ্রনাথকে নয় সমস্ত মানুষের অন্তর্যামীকেই সম্মানিত করেছে।

নিশীথে :

১৩০১ সালে মাঘ মাসে নিশীথে প্রকাশ পায়। শব্দ সংখ্যা আনুমানিক তিন হাজার আটশত। পরিচ্ছেদে বিভক্ত নয়। কাহিনী মোটামুটি দাম্পত্য প্রেমের। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেমের বন্ধন সুস্পষ্ট, তবে পত্নীর ভালোবাসা যত গভীর, পতির ভালবাসা ততটা নয়। কাহিনীর মধ্য দিয়ে পরস্পরের ভালোবাসার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে। শেষে স্ত্রী নিদারুণ অসুস্থ হয়ে পড়ায় স্বামীর অনুরাগ শিথিল হয়ে পড়ে। তখন ট্রাজেডির বীজ অঙ্কুরিত হয়। অজ্ঞানকৃত আত্ম অপরাধবোধের প্রাবল্যে তীব্র মানসিক আঘাত পেয়ে স্বামীর মস্তিস্ক কিছু বিকৃত হয়ে যায়। কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে ভৌতিক আবাওয়ায়।

গল্পের আরম্ভ যেমন চমৎকার তেমনি তাৎপর্যপূর্ণ -

ডাক্তার ! ডাক্তার !

জ্বালাতন করিল। এই অর্ধেক রাত্রে - চোখ মেলিয়া দেখি আমাদের জমিদার দক্ষিণাচরণবাবু। ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পিঠভাঙা চৌকিটা টানিয়া আনিয়া

তাঁহাকে বসিতে দিলাম এবং উৎবিগ্নভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। ঘড়িতে দেখি, তখন রাত্রি আড়াইটা।

দক্ষিণাচরণবাবু বিবর্ণমুখে বিস্ফারিত নেত্রে কহিলেন, 'আজ রাত্রে আবার সেইরূপ উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে - তোমার ঔষধ কোনো কাজে লাগিল না।

নিশিথে গল্পটির মূলে ছিল অতি-প্রাকৃতিক ব্যঞ্জনা, এখানে বাস্তব অনুভাবেরই অতি-প্রাকৃত ফলশ্রুতি। ঐ নিতান্ত মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতিকে একটু অতিরিক্ত টেনে, রহস্য-দোলায়িত পরিবেশের সৃষ্টি করে দক্ষিণাবাবুর মধ্যে লেখক এক অস্বাভাবিক উচ্ছন্নতার সৃষ্টি করেছেন। রাত্রির আবছায়ায় যার জন্ম; দিনের স্পষ্ট আলোকে তার কল্পনামাত্র লজ্জিত ও ক্রুদ্ধ করে। অথচ এর স্বাভাবিকতা অস্বীকার করাও সম্ভব নয় - এই গল্পটি গূঢ় মনস্তত্ত্বের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। গল্পের নায়ক জমিদার দক্ষিণাচরণবাবু একসময় স্ত্রীর প্রাণপন সেবায় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু তার স্ত্রী যখন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছে তখন তার সেবাযত্ন স্ত্রী সহজে মেনে নিতে পারেনি। সেবাযত্নের ব্যাপারে একশোভাগ উৎসাহ দক্ষিণাচরণবাবুর ছিল কিনা সন্দেহ, কারণ স্ত্রীর কাছে অবিমিশ্র গৃহিণীপনা দেখে তিনি হাপিয়ে উঠেছিলেন। এরপরেই দক্ষিণাচরণবাবুর জীবনে এসে যায় হারাণ ডাক্তারের মেয়ে মনোরমা। সে কথা তার স্ত্রী কিছুটা হলেও বুঝতে পেরেছিল। তাই যেদিন সে মনোরমাকে দেখেছিল সেদিন চমকে উঠেছিল। বলে উঠেছিল - ওকে ! ওকে! ওকে, ওকে গো কিন্তু ব্যাপারটা পরে বুঝে নিয়ে সম্ভবত ইচ্ছে করেই ভুল ওষুধ খেয়ে নিজের জীবন শেষ করে দেয়।

মনোরমার সঙ্গে দক্ষিণাচরনের বিবাহ হয়ে যায়। স্ত্রী চলে গেল কিন্তু মনের মধ্যে যে অপরাধবোধ ছিল, তা কিন্তু দক্ষিণাচরণকে ছায়ার মত অনুসরণ করে ফিরতে লাগল। পরপর এমন কতকগুলি ঘটনা গেল যা দক্ষিণাচরণকে বিপর্যস্ত করে দিল।

প্রথম ঘটনা ঘটেছিল বকুলতলায় যেখানে স্ত্রী রোগশীর্ণ হাত তুলে নিয়ে একদিন তিনি বলেছিলেন, 'তোমার ভালোবাসা আমি কোনওকালে ভুলিব না।' সেখানেই তিনি মনোরমার হাত নিজের হাতে নিয়ে ওই একই কথা বলেছেন মনোরমাকে এবং -

> "সেই মুহূতে বকুলগাছের শাখায় উপর দিয়া, ঝাউগাছের মাথার উপর কৃষ্ণপক্ষের পীতবর্ণ ভাঙা চাঁদের নিচে দিয়া গঙ্গার পূর্বপার হইতে গঙ্গার সূদূর পশ্চিম পাড় পর্যন্ত হাহা - হাহা - হাহা করিয়া দ্রুতবেগে একটা হাসি বহিয়া গেল।"

টিপ্পনী

টিপ্পনী

ব্যাপারটা যে আসলে কিছুই নয়, মনোরমা সে কথা বুঝিয়ে বলেছে -

> "সার বাঁধিয়া দীর্ঘ একঝাঁক পাখি উড়িয়া গেল, তাহাদের পাখার শব্দ শুনিয়াছিলআম।

এরপরের ঘটনা ঘটেছিল পদ্মার চরে। শুক্লপক্ষের নির্মল চন্দ্রালোকে সেই জনহীন পদ্মাচরের সান্ধ্য অবকাশে রোমান্টিক হয়ে পড়েছিলেন দক্ষিণাচরণ, মনোরমার মুখ কাছে টেনে এনে একটি চুম্বন দান করেছিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সেই নিঃসঙ্গ চরে তিনবার ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল - 'ওকে ? ওকে ? ও কে ? পরে অবশ্য বোঝা গিয়েছে ওটা জলচর পাখির ডাক। তবু অস্থির চিত্তে তাড়াতাড়ি বোটে ফিরে এসেছিল, কিন্তু এসেও শান্তি নেই -

> অন্ধকারে কে একজন আমার মশারির কাছে দাঁড়াইয়া সুষুপ্ত মনোরমার দিকে একটি মাত্র শীর্ণ অস্থিসার অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া যেন আমার কানে কানে অত্যন্ত চুপি চুপি অস্পষ্ট কণ্ঠে কেবলই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, 'ও কে? ও কে ? ওকে গো ?'
>
> তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেশলাই জ্বালাইয়া বাতি ধরাইলাম । সেই মুহূর্তেই ছায়ামূর্তি মিলাইয়া গিয়া, আমার মশারি কাঁপাইয়া বোট দুলাইয়া, আমার সমস্ত ঘর্মাক্ত শরীরের রক্ত হিম করিয়া দিয়া হাহা - হাহা - হাহা করিয়া একটা হাসি অন্ধকার রাত্রির ভিতর দিয়া বহিয়া চলিয়া গেল।"

প্রেম ও প্রেমাভিনয়ের সুপ্ত অপরাধবোধের, সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল এই অতিপ্রাকৃত গল্পটি বাংলা সাহিত্যের সম্পদ।

প্রকৃতির খুব বড় ভূমিকা আছে এ গল্পে। দক্ষিণাচরণের প্রথমা স্ত্রী স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করে তার স্বামীকে দ্বিতীবার বিবাহের পথ সুগম করে দিয়েছিল। কিন্তু তার মুখ থেকে যে "ও কে, ও কে, ও কে গো" শব্দ উচ্চারিত হয়েছিল তা আকাশে বাতাসে পরিব্যপ্ত হয়ে রইল এবং অন্ধকার রাত্রির নিস্তব্ধতা মথিত করে " ওকে, ওকে, ও কে গো" এই ধ্বনি মুখর হয়ে উঠত। গঙ্গার পারে কৃষ্ণপক্ষের পীতবর্ণ ভাঙা চাঁদের নীচে এক ঝাঁক পাখির পাখার শব্দে জোৎস্না প্লাবিত নির্জল বালুচরে জলচর পাখির ডাকে এই বাণী ধ্বনিত হতে থাকত। এ গল্পে লেখক অতিপ্রাকৃতের দেহহীন অলৌকিকতা সৃষ্টি করেছেন । 'ওকে ওকে গো" এই বাক্যটি একটি রূপহীন ধ্বনিমাত্র। তমসাচ্ছন্ন বা জোৎস্নালোকিত নিঃস্তব্ধতার মধ্যে এটা মিশে গেছে, এর প্রাণ নেই, এর কোন বিশিষ্ট রূপ নেই, মনে হয় পাখির সঞ্চরণে ঘড়ির টিক টিক শব্দে তা বিলীন হয়ে রয়েছে। দিনের আলোকে এই মোহ কোথায় উড়ে যায় তার ঠিকানা

থাকে না। রাত্রিতে যে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে থাকত, দিনে আলোকে সে নিজেই লজ্জিত বোধ করত, সমস্ত জিনিসটা তার কাছে অলীক মনে হত।

গল্পের প্রেক্ষাপট ও পর্যালোচনা :

টিপ্পনী

১২৯০ বঙ্গাব্দে চৈত্রের ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত 'অচৈতন্য' নামের গদ্যস্তবকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'আমারা যতখানি অচেতন, ততখানি সচেতন নহি ইহা নিশ্চয়ই। ... আমাদের মনে যে কি আছে তাহা অতি যৎসামান্য পরিমাণে আমরা জানি মাত্র, যাহা জানি না তাহাই অগাধ। কিন্তু যাহা জানি না তাহাও যে আছে, ইহা অনেকেই বিশ্বাস করিতে চাহেন না।" এই যৎসামান্য পরিমাণে জানা বেশিটাই অজানা এই অগাধ অচৈতন্যই আমাদের সত্তার নিশাভাগ। অন্ধকারে আবৃত থাকে বলেই অচেতন অংশটি গুপ্ত এবং সেই কারণেই তা 'নিশীথ' এর সঙ্গে উপমিত।

খ্রিষ্ট্রীয় ধর্মশাস্ত্রের পরিভাষায় প্রথম রাত্রিটি যদি হয় Night of the soul তাহলে দ্বিতয় রাত্রিটিকে বলা যায় Night of the senses নিশীথে' গল্পের আদি আর অন্ত্য, ভিতর আর বাহিরকে প্লাবিত করে থাকা নিশীথরাত্রি এই দুই রাত্রি থেকেই গুণগতভাবে পৃথক । এই নিশীথ আত্মিক নয় । জৈবিকও নয়, একান্তভাবেই মনস্তাত্ত্বিক।

নিশীথে রবীন্দ্রনাথের 'অতিপ্রাকৃত' গল্পের পরিচিত শিল্পরূপই বিন্যস্ত হয়েছে। অর্থাৎ এই গল্প প্রথম পুরুষে লিখিত হয় নি, ডাক্তারের কাছে দক্ষিণাচরণের মুখে বিবৃত হয়েছে । সময়ের মাপে গল্পটিতে ঘটনার বিস্তার প্রায় চার বছর । দক্ষিণাচরণের গল্পকথনের সূত্রকে বারবার ছিন্ন করে দিয়ে ছিন্ন সূত্র সংযোজনের সময় মধ্যবর্তী অপ্রয়োজনীয় অংশ বর্জিত হবেছে। ফলে চার বছরের প্রলম্বিত কালসীমার মধ্যেই সৃষ্ট হয়েছে ছোটগল্পের পক্ষে অত্যাবশ্যক গাঢ়বদ্ধ কালসংহতি। গল্পের সূত্র সবসুদ্ধ তিনবার ছিন্ন করা হয়েছে । প্রথমবার অসুস্থ প্রথমপক্ষের স্ত্রীকে নিয়ে বায়ুপরিবর্তনের উদ্দেশ্যে দক্ষিণাচরণের এলাহাবাদে যাওয়ার পরে ; দ্বিতীয়বার, দক্ষিণাচরণের প্রথমপক্ষের স্ত্রীকে হারাণ ডাক্তারের কণ্যা মনোরমার দেখতে আসার আগে এবং তৃতীয়বার দক্ষিণাচরণের প্রথম পক্ষে স্ত্রীর মৃত্যুর পর। কিন্তু এ ফলে গল্পের একমুখীনতা যে নষ্ট হয়েছে তেমনটা বলা যাবে না। কারণ এইসব অংশে গল্প থেমে গেলেও সমস্ত আলো এসে পড়েছে গল্পবক্তা দক্ষিণাচরণের বিবেকজর্জর অন্তর্লোকের নানা বহিঃপ্রকাশে।

লক্ষ করার বিষয়, ডাক্তার কাছে দক্ষিণাচরণের গল্পকথনের সময় রাত্রি আড়াইটে। শুধু তাই নয়, গল্পের মধ্যেকার ঘটনাগুলিও ঘটেছে সন্ধ্যা ও রাত্রিবেলায়। অর্থাৎ বাচার্থ্য ও গূঢ়ার্থ দুইদিক দিয়েই নিশীথে নামকরণটি সার্থক হয়ে উঠেছে।

টিপ্পনী

‘নিশীথের সঙ্গে মিল পাওয়া যায় ‘মধ্যবর্তিনী’ গল্পের। প্রথম স্ত্রী দীর্ঘদিন অসুস্থতার ছিদ্রপথে দুর্বল চিত্ত স্বামীর জীবনে দ্বিতীয় নারীর অনুপ্রবেশ লাভের যে থিম রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে বার বার ফিরে এসেছে, মধ্যবর্তিনী গল্প তার আদিমতম নিদর্শন। দ্বিতীয় নিদর্শন নিশীথে।

‘নিশীথে’ গল্পে পরপর তিনটি ঋতুর উল্লেখ আছে - বসন্ত, শরৎ, হেমন্ত। গল্পের শুরু চৈত্রে, শেষ অগ্রহায়নে। বসন্তে যখন গল্প শুরু, তখন দক্ষিণাচরণ প্রথম স্ত্রীর কল্যাণময়ী প্রেমকে চিনতে পারেনি, তার হৃদয় তখন বসন্তের চঞ্চল আবেগে আন্দোলিত। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর দক্ষিণাচরণ যখন মনোরমাকে বিয়ে করল তখন শরৎকাল। মনোরমা নামটির তাৎপর্য লক্ষণীয়। মনকে যে রমিত বা আনন্দিত করে সেই মনোরমা। কিন্তু দক্ষিণাচরণ ও মনোরমার নবদাম্পত্যের মধ্যে দক্ষিণাচরণের সদ্যঃকৃত অপরাধের স্মৃতিজনিত বিচ্ছেদ। আর শেষে যখন এল হেমন্তকাল তখন গভীর এক ভালোবাসাকে প্রবঞ্চিত করার পাপবোধে দক্ষিণাচরন সম্পূর্ণভাবে ভূতগ্রস্থ।

দক্ষিণাচরণ বলেছেন - “আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর মতো এমন গৃহিণী অতি দুর্লভ ছিল।” কিন্তু তখন দক্ষিণাচরণের বয়স কম, মনের চাঞ্চল্য, তার উপর কাব্যশাস্ত্র পড়ে তার মন স্ত্রীর ‘অবিমিশ্র গৃহিণীপনায়’ বিরক্ত বোধ করত। দক্ষিণাচরনের দৃষ্টিতে তার স্ত্রী গৃহিণী মাত্র। লক্ষ্য করার বিষয় গৃহিণীর কোনো নাম নেই। শুধুই ‘গৃহিণী’ প্রণয়সম্ভাষণ করতে গেলে তিনি হেসে উড়িয়ে দিত, দক্ষিণাচরণ বলেছেন, “তাঁহার হাসিবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল।” গল্পের অতিপ্রাকৃত উপসংহারে এই হাস্যধ্বনির বিভ্রমে গড়ে উঠেছে।

দক্ষিণাচরণ এরপর সাংঘাতিক রোগে পড়লেন। ওষ্ঠব্রণ থেকে জ্বরবিকার হয়ে তাঁর মরবার অবস্থা হোল, ডাক্তার জবাব দিয়ে গেল। রোগের সময় তাঁর স্ত্রী অহর্নিশ এক মুহূর্তের জন্য বিশ্রাম করেন নি। একটি অবলা স্ত্রীলোক মানুষের সামান্য শক্তি নিয়ে প্রাণপণ ব্যাকুলতায় দ্বারে সমাগত যমদূতগুলির সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ করেছিলেন। গভীর অনুশোচনায় দক্ষিণাচরণ সেই দিনগুলির স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন -

> “তাঁহার সমস্ত প্রেম, সমস্ত হৃদয়, সমস্ত যত্ন দিয়া আমার এই অযোগ্য প্রাণটাকে যেন বক্ষের শিশুর মতো দুই ঝাঁপিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন।”

দক্ষিণাচরণ গৃহিণীর মধ্যে প্রণয়নীকে না পেয়ে অতৃপ্ত ছিলেন, অথচ গৃহিণী নিজের প্রাণকে তুচ্ছ করে স্বামীর প্রাণ রক্ষা করলেন। স্বামীকে তিনি সেবা করেছিলেন কিন্তু স্বামীর সেবা তিনি কিছুতেই গ্রহণ করতে চাইতেন না। এমনকি

তখনও স্বামীর যত্নের দিকেই তাঁর মনোযোগ ছিল অখন্ড। তাঁদের বরানগরের বাড়ির সামনের বাগান এবং বাগানের সামনেই গঙ্গা। প্রকান্ড একটা বকুলগাছের তলা সাদা মার্বেল পাথরে বাঁধানো ছিল। সুস্থ অবস্থায় দক্ষিণাচরণের গৃহিণী নিজে দুইবেলা পাথরে বাঁধানো জায়গাটি ধুয়ে সাফ করে রাতেন। দীর্ঘদিন শয্যাগত থাকার পর স্ত্রী একদিন সেই বাগানে যেতে চাইলেন। তখন বসন্তকাল। চৈত্রের শুক্লপক্ষ সন্ধ্যা। দক্ষিণাচরণ তাঁকে শয়ন করিয়ে দিলেন বকুলতলার প্রস্তর - বেদিকায় -

> "আমারই জানুর উপরে তাঁহার মাথাটি তুলিয়া রাখিতে পারিতাম কিন্তু জানি, সেটাকে তিনি অদ্ভুত আচরণ বলিয়া গণ্য করিবেন, তাই একটি বালিশ আনিয়া তাঁহার মাথার তলায় রাখিলাম।"

এখানে ঘনিষ্ট সান্নিধ্য লাভের বাসনা এবং সেই বাসনা সংহরণ। গৃহিণীর উত্তপ্ত ও শীর্ণ হাতটি হাতে তুলে নিয়ে তিনি বলে উঠলেন - "তোমার ভালোবাসা আমি কোনোকালে ভুলিব না।" বসন্তরাত্রিতে অন্যনিষ্ঠ প্রেমের শপথ ! সে যে বড় অচিরস্থায়ী। স্ত্রী হেসে উঠলেন -

> "সে হাসিতে লজ্জা ছিল, সুখ ছিল এবং কিঞ্চিৎ অইশ্বাস ছিল এবং উহার মধ্যে অনেকটা পরিমাণে প্রহাসের তীব্রতাও ছিল।"

তাঁর এই হাসি দিয়েই তিনি জানিয়ে দিলেন -

> " কোনো কালে ভুলিবে না, ইহা কখনো সম্ভব নহে এবং আমি তাহা প্রত্যাশাও করি না।"

হাসির উপর তর্ক চলে না। স্ত্রীর এই তীক্ষ্ণ হাসি দক্ষিণাচরণের প্রেমালাপের সাহস দমিয়ে দিত।

অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে বায়ু পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে দক্ষিণাচরণ এলাহাবাদে গেলেন। চিকিৎসা শুরু করলেন হারাণ ডাক্তার। অবশেষে অনেকদিন একভাবে কাটানোর পর ডাক্তারও বললেন আর তাঁর দুজনেই বুঝলেন যে, এ ব্যামো সারবার নয় - স্ত্রীকে চিররুগণ হয়েই কাটাতে হবে। আরোগ্য আশাহীন এই সেবাকার্যে দক্ষিণচরণ মনে মনে পরিশ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলেন - অবশ্য নিজের কাছেও তিনি কখনো এই সত্য স্পষ্টভাবে স্বীকার করেন নি। এ কাজে ভঙ্গ দেওয়ার কল্পনাও তাঁর মনে ছিল না, অথচ চিরজীবন এই চিররুগনকে নিয়ে যাপন করবার কল্পনাও তাঁর কাছে পীড়াদায়ক হয়েছিল। স্ত্রী বললেন -

> "যখন ব্যামোও সারিবে না এবং শীঘ্র আমার মরিবার আশাও নাই তখন আর কতদিন এই জীবনমৃতকে লইয়া কাটাইবে। তুমি আর

টিপ্পনী

টিপ্পনী

একটা বিবাহ করো।"

এই অনুরোধের মধ্যে শুধু কি সুযুক্তি ও সদ্‌বিবেচনাই ছিল ? স্বামীকে পরীক্ষা করার একটা সূক্ষ্ম চেষ্টাও কি ছিল না ? দক্ষিণাচরণ বলেছেন -

> "আমার সেবার মধ্যে সেই আন্তরিক শ্রান্তি নিশ্চয়ই তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন।"

তাই দক্ষিণাচরণ যখন একপত্নীব্রত ভালোবাসার কথা প্রচার করতেন তখন তাঁর স্ত্রী হেসে উঠতেন। দক্ষিণাচরণ বলেছেন -

> "আমার নিজের অগোচর অন্তরের কথাও অন্তর্যামীর ন্যায় তিনি সমস্তই জানিতেন, একথা মনে করিলে আজও লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে।"

দক্ষিণাচরণ হারাণ ডাক্তারের বাড়ীতে প্রায়ই নিমন্ত্রিত হতেন। এই নিমন্ত্রণ উপলক্ষে কিছুদিন যাতাযাতের পর হারাণ তাঁর অবিবাহিতা পঞ্চদশী কন্যার সঙ্গে দক্ষিণাচরণের পরিচয় করিয়ে দিলেন। মেয়েটির বিবাহ না হওয়ার কারন জনশ্রুতির ভাষায় 'কুলদোষ'। কিন্তু আর কোনো দোষ ছিল না। যেমন সুরূপ তেমনি সুশিক্ষা।" বোঝাই যাচ্ছে মেয়ের সঙ্গে দক্ষিণাচরণের ঘনিষ্ঠতাসাধনে হারাণ ডাক্তার নেপথ্যে থেকে সূত্রধরের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। মাঝে মাঝে এক একদিন মনোরমার সঙ্গে নানা কথার আলোচনায় দক্ষিণাচরণের বাড়ি ফিরতে রাত হত - স্ত্রীকে ওষুধ খাওয়াবার সময় পেরিয়ে যেত ; স্ত্রী সবই জানতেন, বুঝতেন, কিন্তু একদিনও কিছু জিজ্ঞাসা করেন নি, স্ত্রীর এই প্রশ্নহীন নীরবতার আভিজাত্য তাঁর চরিত্রকে মহনীয় করে তোলে। আর দক্ষিণাচরণের মনোভাব -

> "রোগীর ঘর আমার কাছে দ্বিগুন নিরানন্দ হইয়া উঠিল। তখন প্রায়ই শুশ্রুষা করিবার এবং ঔষধ খাওয়াইবার নিয়ম ভঙ্গ হইতে লাগিল।"

প্রাণদাত্রী পত্নীর ঘর তখন দক্ষিণাচরণের ভাষায় নিতান্তই 'রোগীর ঘর'।

এরপরেই গল্পের ভাষায় এসেছে জটিলতা, - এসেছে নানা জটিল ব্যাসকূট - "হারান ডাক্তার আমাকে প্রায় মাঝে মাঝে বলিতেন যাহাদের রোগ আরোগ্য হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই, তাহাদের পক্ষে মৃত্যুই ভালো ; কারণ বাঁচিয়া তাহাদের নিজেরও সুখ নাই, অন্যেরও অসুখ।"

হারাণ ডাক্তার কি Mercy- killing এর কথা বলেছেন ? আরোগ্য সম্ভাবনাহীন মানুষকে দুর্বহ অস্তিত্বের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়ার নিঃস্বার্থ

মানবিকতা ? দক্ষিণাচরণ স্বীকার করেছে -

> "কথাটা সাধারণভাবে বলিতে দোষ নাই, তথাপি আমার স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া এমন প্রসঙ্গ উত্থাপন করা তাহার উচিত হয় নাই। ..... কিন্তু মানুষের জীবনমৃত্যু সম্বন্ধে ডাক্তারের মন এমন অসাড় যে, তাহারা ঠিক আমাদের মনের অবস্থা বুঝিতে পারে না।"

তবে বিষবটা ততটা সরল নয়। অনেক বেশি জটিল -

> "হঠাৎ একদিন পাশের ঘর হইতে শুনিতে পাইলাম, আমার স্ত্রী হারাণ বাবুকে বলিতেছেন, 'ডাক্তার, কতকগুলো মিথ্যা ঔষধ গিলাইয়া ডাক্তারখানার দেনা বাড়াইতেছ কেন। আমার প্রাণটাই যখন একটা ব্যামো তখন এমন একটা ওষুধ দাও যাহাতে শীঘ্র এই প্রাণটা যায়।"

অভিমানিনী নারীর কণ্ঠে উচ্চারিত এই অসর্তক বাক্যটিকে যেন হারাণ ডাক্তারের হাতে তাঁর মৃত্যুবাণ তুলে দিল। স্ত্রীর মৃত্যু ঘটাবার জন্য হারাণ ডাক্তার প্রথমে দক্ষিণাচরণকে সূক্ষ্মভাবে প্ররোচিত করেছিলেন, এইবার ডাক্তারের পক্ষে রোগীকে হত্যা করবার সহজতম পন্থাটি যেন তাঁর চোখে পড়ে গেল।

হারাণ ডাক্তার চলে যাওয়ার পর নিজের কাছে অপরাধী স্বামী দুঃখিত চিত্তে স্ত্রীর 'শয্যাপ্রান্তে' বসে তাঁর কপালে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। স্ত্রী বললেন -

> "এ ঘর বড়ো গরম, তুমি বাহিরে যাও। তোমার বেড়াইতে যাইবার সময় হইয়াছে। খানিকটা না বেড়াইয়া আসিলে আবার রাত্রে তোমার ক্ষুধা হইবে না।"

মাত্র এই একবার নিষ্ঠাহীন, দুর্বল, দোলাচলচিত্ত স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অন্তরের সুগভীর অভিমান আর ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। দক্ষিণাচরণ নিজেই বলেছেন -

> "বেড়াইতে যাওয়ার অর্থ ডাক্তারের বাড়ি যাওয়া, আমি তাকে বুঝাইয়া ছিলাম, ক্ষুধাসঞ্চারের পক্ষে খানিকটা বেড়াইয়া আসা বিশেষ আবশ্যক। এখন নিশ্চয় বলিতে পারি, তিনি প্রতিদিনই আমার এই ছলনটুকু বুঝিতেন। আমি নির্বোধ, মনে করিতাম তিনি নির্বোধ।"

এখানেই আছে গহন জটিলতা। দক্ষিণাচরণ নিশ্চয় পত্নীহত্যা করেন নি, নিশ্চয় তাঁর স্ত্রী স্বেচ্ছায় স্বহস্তে বিষ খেয়ে আত্মহত্যাই করেছিলেন। কিন্তু তাহলে

দক্ষিণাচরণের এত পাপবোধ এত আত্মদাহ কেন ? তাঁর স্ত্রী আত্মহত্যাই করেছিলেন কিন্তু সেই আত্মহত্যার প্ররোচনা ও পরিবেশ তৈরি করতে সাহায্য করেছিলেন হারাণ আর দক্ষিণাচরণ। হারাণ জানতেন, দক্ষিণাচরণ একই সঙ্গে জানতেন এবং জানতেন না। যুগপৎ এই জানা আর না জানা, এই দিবস আর নিশীথের অনবরত টানাপোড়নে দক্ষিণাচরণ নিরন্তর ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন।

টিপ্পনী

দক্ষিণাচরণের স্ত্রী যে বিশেষ দিনটিতে আত্মঘাতী হলেন সেই দিনটির বর্ণনা সমগ্র গল্পগুচ্ছের ভাষাশিল্পে এক মূল্যবান সম্পদ । একদিন সন্ধ্যায় মনোরমা দক্ষিণাচরণের স্ত্রীকে দেখতে এল। অবশ্য এই দেখতে আসার প্রস্তাবে দক্ষিণাচরণের সানন্দ সম্মতি ছিল না, দক্ষিণাচরণ বলেছেন - "জানি না, কী কারণে তাঁর সে প্রস্তাব আমার ভালো লাগিল না , কিন্তু, প্রতিবাদ করিবার কোনো হেতু ছিল না।"

আসলে এই ভালো - না - লাগার হেতুটি জটিল । কী ভেবেছিলেন দক্ষিণাচরণ ? মনোরমাকে এদেখা মাত্রই স্বামীর পস্খলনের বিষয়টি স্ত্রী জেনে ফেলবেন ? কিন্তু স্ত্রী কি আগেই অনেকটা বুঝে ফেলেন নি ? অথবা স্ত্রী সম্পর্কে অন্যাসক্ত পুরুষের যে অস্বস্তিকর স্পর্শকাতার থাকে একি তাই ? দক্ষিণাচরন কি ভেবেছিলেন, অসুস্থ স্ত্রী যে স্বামীর কাছে অনাদৃতা মনোরমার স্ত্রীজনোচিত অন্তদৃষ্টিতে তা ধরা পড়বে এবং এর ফলে দক্ষিণাচরণের প্রতি মনোরমার আকর্ষণ হ্রাস পাবে ?

দক্ষিণাচরন বলেছেন, সেদিন তাঁর স্ত্রীর বেদনা অন্য দিনের চেয়ে কিছু বেড়ে উঠেছিল । যেদিন তাঁর ব্যাথা বাড়ে সেদিন তিনি অত্যন্ত স্থির হয়ে থাকেন । ঘরে সেদিন নিস্তব্ধ অন্ধকারে শোনা যায় স্ত্রীর গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস । রোগীর চোখে আলো লাগবে বলে কেরোসিনের আলোটা ছিল দরজার পাশে । অন্ধকার ঘরে স্বামী স্ত্রীকে দেখা যাচ্ছে না - সমস্ত আলো এসে পড়েছে ঘরের দরজায় । শয়নকক্ষের এই প্রবেশদ্বারে মনোরমা এসে দাঁড়াল । দুজনের দাম্পত্যে প্রবেশোদ্যত তৃতীয় ব্যক্তি । কেরোসিনের আলো বিপরীত দিক থেকে এসে মনোরমার মুখের উপর পড়ল । স্ত্রী চমকে উঠে স্বামীর হাত ধরে জিজ্ঞাসা করলেন - "ও কে ?" দুর্বল অবস্থায় হঠাৎ অচেনা লোক দেখে ভয় পেয়ে দু-তিনবার এই প্রশ্ন করলেন - "ও কে ! ও কে গো !" এই প্রশ্ন সঞ্চিত থাকল দক্ষিণাচরণের মন্নচৈতন্যে - পরে তাঁর বিশ্বের সর্বত্র থেকে এই প্রশ্ন ঠিকরে পড়বে তাঁরই দিকে । স্ত্রীর জিজ্ঞাসার জবাবে স্বামীর মধ্যে অপরাধী - মনস্তত্ত্বের অভিব্যক্তিটি চমকপ্রদ -

> "আমার কেমন দুর্বুদ্ধি হইল আমি প্রথমেই বলিয়া ফেলিলাম, 'আমি চিনি না ।' বলিবামাত্র কে যেন আমাকে কশাঘাত করিল । পরের মুহূর্তেই বলিলাম, "ওঃ আমাদের ডাক্তারবাবুর কন্যা।"

মনোরমার সঙ্গে রোগিনীর আলাপ চলাকালীন ডাক্তারবাবু এসে উপস্থিত। তিনি সঙ্গে এনেছিলেন দুই শিশি ওষুধ। একটি নীল শিশিতে মালিশের ওষুধ, খাবার ওষুধ অন্য শিশিতে। নীল শিশির ওষুধটি ভারি বিষ। সবসুদ্ধ তিনবার বিষের শিশি সম্বন্ধে স্বামী-স্ত্রীকে সাবধান করে দিলেন। দুবার স্ত্রীকে, একবার স্বামীকে। তারপর শয্যাপার্শ্ববর্তী টেবিলে ওষুধ দুটি রাখলেন। যাতে শায়িত অবস্থাতেই স্ত্রী শিশি দুটির নাগাল পেতে পারেন। আয়োজন সম্পূর্ণ হবার পর বিদায় নেবার পালা। বাপ মেয়েকে যখন ডাকলেন মেয়ে বলল, "বাবা, আমি থাকি না কেন। সঙ্গে স্ত্রীলোক কে নাই। ইহাঁকে সেবা করিবে কেহ ? কিন্তু স্ত্রী ব্যস্তভাবে অসম্মতি জানালেন। শুধু তাই নয়, ডাক্তার যখন মেয়েকে নিয়ে গমনোদ্যত তখন স্বামীকে উদ্দেশ্য করে স্ত্রী ডাক্তারকে বললেন -

> "ডাক্তারবাবু, ইনি এই বদ্ধঘরে অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন, ইহাকে একবার বাহিরে বেড়াইয়া লইয়া আসিতে পারেন ?"

ঈষৎ আপত্তি দেখানোর পর দক্ষিণাচরণও এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন 'অনতিবিলম্বে'। আত্মহননের উপকরণ এনে দিলেন ডাক্তার, স্বামী দিয়ে গেলেন সেই উপকরণ গ্রহণের সুযোগ। দক্ষিণাচরণ শুধু নদীর ধার হয়ে একবার বেড়িয়ে আসেননি; ডাক্তারের বাড়ি গিয়ে আআরও করেছেন। ফিরে আসতে রাত হয়েছে। তখন তীব্র বিষক্রিয়ায় স্ত্রীর কণ্ঠরোধ হয়েছে। সেই রাত্রেই ডাক্তারকে আবার ডেকে আনা হল। ডাক্তার অনেকক্ষণ কিছুই বুঝতে পারলেন না। তারপর নীল শিশিটি নিয়ে দেখলেন ফাঁকা। ডাক্তার পাম্প আনতে ছুটলেন, আর দক্ষিণাচরণ স্ত্রীর বিছানার উপর গিয়ে পড়লেন অর্ধমূর্ছিতের মতো। 'নিশীথে' গল্পে আত্মহত্যার প্ররোচনা অন্যেরা দিলেও দক্ষিণাচরণের স্ত্রী মৃত্যুকে গ্রহণ করেছেন নিজেরই হাতে। স্বামী সুখের জন্য তাঁর এই আত্মবিসর্জনই স্বামীর প্রতি তার ভালোবাসার মহত্তম দান।

পিতার সম্মতিক্রমে মনোরমা দক্ষিণাচরণকে বিবাহ করল। মনোরমার হয়ত অসম্মতি ছিল। তবে কুলের দোষ থাকায় পিতাকে কন্যাদায়মুক্ত করার জন্য অন্য কোন উপায় ছিল না। দক্ষিণাচরণ বলেছেন -

> "আমি যখন তাআকে আদরের কথা বলিতাম, প্রেমালাপ করিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করবার চেষ্টা করিতাম, সে হাসিত না, গম্ভীর হইয়া থাকিত। তাহার মনের কোথায় কোন্‌খানে কী খটকা লাগিয়া গিয়াছিল আমি কেমন করিয়া বুঝিব ?"

এ সময়ে দক্ষিণাচরণের মদের নেশা অত্যন্ত বেড়ে গেল।

দক্ষিণাচরণ একদিন সেই বরানগরের বাগানে মনোরমাকে নিয়ে বেড়াচ্ছেন।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

শ্রান্ত মনোরমা সেই বকুলতলার শুভ্র পাথরের বেদীর উপর এসে নিজের দুই বাহুর উপর মাথা রেখে শয়ন করল। কাছে এসে বসলেন দক্ষিণাচরণ। সেই জোৎস্না আর রাত্রির পরিবেশে তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন -

> "আমি আর থাকিতে পারিলাম না। কাছে আসিয়া দুই হাতে তাহার হাতটি তুলিয়া ধরিয়া কহিলাম, 'মনোরমা, তুই আমাকে বিশ্বাস কর না, কিন্তু তোমাকে আমি ভালোবাসি। তোমাকে আমি কোনকালে ভুলিতে পারিব না।" কথাটা বলিবামাত্র চমকিয়া উঠিলাম; মনে পড়িল, ঠিক এই কথাটা আর একদিন আর কাহাকেও বলিয়াছি!"

ঠিক সেই মুহূর্তেই বকুল গাছের শাখার উপর দিয়ে, ঝাউগাছের মাথার উপর দিয়ে, কৃষ্ণ পক্ষের পীতবর্ণ ভাঙা চাঁদের নীচ দিয়ে গঙ্গার পূর্ব থেকে পশ্চিম পার পর্যন্ত হাহা - হাহা করে একটা হাসি অতি দ্রুতবেগে বয়ে গেল। তখনই দক্ষিণাচরণ বকুললতলার পাথরের বেদীর উপর থেকে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন নীচে। দক্ষিণাচরণ বলেছেন -

> "দিনের বেলা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, পাখিরঝাঁক উড়িবার শব্দই বটে, এই সময়ে উত্তরদেশ হইতে হংসাশ্রেণী নদীর চরে চরিবার জন্য আসিতেছে। কিন্তু সন্ধ্যা হইলে সে বিশ্বাস রাখিতে পারিতাম না।"

তখন তাঁর মনে হত, চারিদিকে সমস্ত অন্ধকার ভবে জমা হয়ে রয়েছে ঘন হাসি - হঠাৎ আকাশ ভরে বিদীর্ণ করে ধ্বনিত হয়ে উঠবে। অবশেষে এমন হল যে সন্ধ্যার পর মনোরমার সঙ্গে একটা কথা বলতে তাঁর সাহস হত না।

খন্ডিত এই দাম্পত্যকে অভিশাপমুক্ত করার অভিপ্রায়ে দক্ষিণাচরণ তাঁর পূর্বস্মৃতিপীড়িত বরানগরের বাড়ি ছেড়ে মনোরমাকে নিয়ে বোটে করে বেড়াতে গেলেন। বোটে ফেরার পর রাত্রে দুজনের শয্যাগ্রহণ। শ্রান্ত শরীরে মনোরমা অবিলম্বে ঘুমিয়ে পড়লেও দক্ষিণাচরণ ঘুমাতে পারলেন না। অন্ধকারে 'কে একজন তাঁর মশারি কাছে দাঁড়িয়ে যেন তাঁর কানে কানে কেবলই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল ও কে ? ও কে ? ও কে গো ? তাড়াতাড়ি উঠে দেশলাই জ্বালবামাত্র ছায়ামূর্তি মিলিয়ে গেল। অবশেষে একান্ত অসহ্য হয়ে এল। তখন তিনি ভাবলেন আলো নিবিয়ে না দিলে ঘুমাতে পারবেন না ; যেমনি আলো নিবিয়ে শুলেন, অমনি মশারির পাশে ওকে শব্দ ভেসে উঠল। এমনি সময়ে রুদ্ধ কণ্ঠ দক্ষিণাচরণের মনে হল যে, তাঁর প্রত্যেক বক্ষস্পন্দনের সমান তালে ক্রমাগত এই প্রশ্ন ধ্বনিত হয়ে চলেছে, সেই গভীর রাত্রে নিস্তব্ধ বোটের মধ্যে তাঁর গোলাকার ঘড়িটাও সজীব হয়ে উঠে তার ঘন্টার কাঁটাটি মনোরমার দিকে প্রসারিত করে শেলফের উপর থেকে ওই একই প্রশ্ন করছে তালে

তালে। দক্ষিণাচরণ যতদিন বেঁচে থাকবেন, ততদিন তাঁর সময়ের ক্ষুদ্র অংশগুলি ওই একটিমাত্র প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই বৃত্তাকারে আবর্তিত হয়ে চলবে।

এমনি সময়ে কেরোসিনের শিখাটা দপ দপ করতে করতে নিভে গেল। হঠাৎ দেখতে পাওয়া গেল বাইরে আলো হয়েছে , কাক ডেকে উঠল, দোয়েল শিস দিতে লাগল। বাড়ির সম্মুখবর্তী পথে একটা মোষের গাড়ি ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে ভেঙে দিল সূচের ডগায় একটিমাত্র হাস্যধ্বনির একবিন্দু অখন্ডতা। নিশাবসানে দক্ষিণাচরণ তাঁর সত্তার নিশাভাগ থেকে প্রত্যাবতন করলেন তাঁর সত্তার দিবাভাগ। তাঁর মুখের ভাবে ভয়ের চিহ্ন কিছুমাত্র আর থাকল না। 'রাত্রির কুহকে, কাল্পনিক শঙ্কার মত্ততায়' ডাক্তারের কাছে 'এত কথা ' বলে ফেলেছেন - সেজন্য যেন 'অত্যন্ত লজ্জিত' হয়ে এবং ডাক্তারের উপর 'আন্তরিক ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে শিষ্ঠ সম্ভাষণমাত্র না করে অকস্মাৎ দ্রুতবেগে চলে গেলেন।

রবীন্দ্রনাথের অন্যসব 'অতিপ্রাকৃত' গল্পগুলিতে গল্পের অন্তভাগে 'ভিতরে বাইরে' আলো এসে পড়ে, রাত্রি প্রভাত হয়, বিজাতীয় শব্দোচ্চারণে কিংবা মেধাবী পরিহাসে ভেঙে যায় ভয়ের আবেশ। কিন্তু 'নিশীথে' গল্পে নিশাবশান হয়েছে গল্পের অন্ত্যভাগে নয়, উপান্ত্যভাগে। গল্পের অন্তিম পংক্তিতে 'সেইদিনই অর্ধরাত্রে' আবার ডাক্তারের দরজায় দক্ষিণাচরণের করাঘাত : 'ডাক্তার ! ডাক্তার !" অর্থাৎ একমাত্র 'নিশীথে গল্পই উপসংহারে শিলপরূপে রবীন্দ্রনাথের অন্যসব অতিপ্রাকৃত গল্পগুলি থেকে স্বতন্ত্র হয়ে আছে।

নষ্টনীড় :

নষ্টনীড় ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় বৈশাখ থেকে অগ্রাহয়ন ১৩০৮। শব্দসংখ্যা আনুমানিক চোদ্দ হাজার পরিচ্ছেদ সংখ্যা ২০ ।আকারে ছোট নয় তবে প্রকারে ছোটগল্প। এই কাহিনীতে রবীন্দ্রনাথ আমাদের বাঙালি গৃহে দেবর-বৌদির যে পারিবারিক সম্পর্ক নিয়ে নরনারীর মধ্যে বিবাদ ঘটার সম্ভাবনা থাকে তার জটিলতা অত্যন্ত সাবধানে নিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন । স্বামীর হৃদয়ে স্থান না পেয়ে চারুলতার চিত্ত যে নিজের অজ্ঞাতসারে অমলের প্রতি ধাবিত হচ্ছিল তা শুধুমাত্র দেবরপ্রীতি বা সৌভ্রাত্র্যসখ্য নয়। চারু সরলহৃদয়, অপাপবিদ্ধ; অমল কৌতুকপ্রবণ, নির্মলহৃদয়। অমলের ভ্রাতৃভক্তি ও কর্তব্যবোধ তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়েছে, ভূপতি চারুর মধ্যে যে স্নেহ ভক্তি তা সুকুমার ও মধুর। ভূপতির অসাংসারিক উদার আত্মসমাহিত চরিত্রের ট্রাজেডি টুকু সূক্ষ্ম কন্টকের মতো বড় বেদনাদায়ক।

নষ্টনীড় রবীন্দ্রনাথের এক শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প । নষ্ঠনীড় যেন চোখের বালির খসড়া। চোখের বালি বহু শাখা -প্রশাখায় জটিল, নষ্টনীড় আদর্শ ছোটগল্পের মত

টিপ্পনী

শরবৎ ঋজুগতিবিশিষ্ট।

রবীন্দ্রনাথ যতগুলি প্রেমের গল্প লিখেছেন তার মধ্যে নষ্টনীড় সবচেয়ে বিখ্যাত। এই গল্পটির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার মতো। চারু ও অমলের মধ্যে যে ভালোবাসার সঞ্চার হয়েছিল তা প্রথমত শুধু বন্ধুত্ব মাত্র ছিল। একজন আব্দার করত, আর একজন তা পালন করত। দুইজনে মিলে আকাশকুসুম কল্পনা করত, তারপর দুজনে মিলে সাহিত্য রচনা করত। একে অপরের সাথী একে নরনারীর প্রেম বলা যায় না, অথচ যৌন প্রেমের গোপনীয়তা এর মধ্যে ছিল। যেদিন সেই গোপনতা ভেঙে গেল, সেই দিনই চারুর মন ভাঙতে শুরু করল। তাদের গোপন ঐশ্বর্য্য অন্য কেউ কেড়ে নেবে এটা সে সহ্য করতে পারত না। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, পাপ মনে সে অমলকে চায় নি; বরং মন্দা অমলকে ভুলিয়ে রাখতে চেয়েছে - এই সন্দেহের কদর্য্যতায় তার মন তিক্ততায় ভরে গেছে। এই সন্দেহে মন্দাকে তাড়াবার অজুহাত মাত্র নয়, গোপনে এই কথা কল্পনা করে তার মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়েছে। এটা তার হৃদয়ের পবিত্রতা প্রমাণ করে। ভূপতির প্রতি তার মনে কোনো অবহেলার সঞ্চার হয় নি ; সে কায়মনোবাক্যে সতী স্ত্রী হতে চেষ্টা করেছে। ভূপতি যখন বাংলায় প্রবন্ধ লিখে তার হৃদয় জয় করতে চেয়েছে, তখন সেই ছেলেমানুষীতে সে লজ্জিত হয়েছে। তার একান্ত ইচ্ছা ছিল ভূপতি কোন অংশেই নিজেকে তার চেয়ে ছোট না করে। কিন্তু তার মনের কথা কেউই বুঝল না, অমলও না, ভূপতিও না, বাস্তব জগতে একটা স্থূলতা আছে। এটা কোন সূক্ষ্ম জিনিসের অস্তিত্ব সহ্য করতে পারে না। সব জিনিসই হাতে ধরে পায়ে দলে ফেলতে চায়। তাই নরনারীর সম্বন্ধ বুঝতে হলে তাকে যৌনসম্পৃক্তির পর্যায়ে নিয়ে ফেলে। চারু ভূপতিকে স্ত্রী হিসাবে সেবা করতে, ভালোবাসতে চেয়েছিল ; অমলকে নিয়ে একটা গোপন স্বর্গ তৈরি করতে চেয়েছিল, যেখানে তাদের মিলিত কল্পনা আকাশকুসুম সৃষ্টি করবে। মানুষের মনকে এইরকম দ্বিধাবিভক্ত করা যায় কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে ; চারু শেষ পর্যন্ত এই সম্বন্ধের শুচিতা রক্ষা করতে পারত কিনা, তাতে সন্দেহের অবকাশ আছে। কিন্তু চারু চেয়েছিল এটাই।

আর এই রহস্যকে কেই বুঝতে পারে নি বলেই গোল বেধে গেছে। অমল সাধারণ বাঙালী যুবক। তাকে চাকরী করে খেতে হবে, চারদিকে নাম জাহির করতে হবে। বাইরের জগতে থাকে বাঁচতে হবে, একজনের প্রীতি ও শ্রদ্ধা নিয়ে সে সন্তুষ্ট থাকবে কি করে ? সে চারুর মনের কথা বুঝতে পারল না। তাই মন্দার সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে চারুর আপত্তি যে কোথায় তা সে বুঝতে পারল না। যে স্বর্গ সে রচনা করেছিল, তার সাথীর কথা না বুঝে সে তাকে ভেঙে ফেলল। ভূপতি ও চারুর মনের কথা একেবারেই বুঝতে পারে নি। যখন বিদ্যুতের মতো অমল ও চারুর সম্পর্কের গোপন কথা তার মনে খেলে গেল তখন সে অনেক বুঝল আবার অনেক বুঝল না।

এতদিন চারুকে একেবারে তার নিজস্ব বলে বিশ্বাস করেছিল। আর এক মুহূর্তে তাকে একেবারে পরকীয়া বলে মনে করল। চারুর দুই জীবনের মধ্যে সে কোন স্বর্ণসেতু দেখতে পেল না। পত্রিকা সম্পাদক ভূপতির জগতের সমস্ত বাস্তব ঘটনার অন্তরালে চারুর হৃদয়ের নিগূঢ় রহস্য সঙ্গোপনে আত্মরক্ষা করল ; তাই তার হিসাবনিকাশ অসম্পূর্ণ রয়ে গেল।

নষ্টনীড় গল্পে হৃদয়বেগের চেয়ে মনোবিকলন, গতির চেয়ে বিবৃতি, চলমানতার চেয়ে বিশ্লেষণ বেশি। তথাকথিত সমাজ-বিগর্হিত ঘটনা চিত্রণের রবীন্দ্র-প্রয়াস এই গল্পে অভিনব নয়। নষ্টনীড়ের যা কিছু স্বকীয়তা, সে তার প্রকরণগত বৈশিষ্ট্য আর কবি মনোভাবের অপূর্বতায়। বিবাহিত নারীর প্রণয়বিস্তারের অপ্রত্যাশিত গতি এই গল্পের ভিত্তি হয়ে আছে। স্বামী-সঙ্গবাসিনী নারীর অন্যাসক্তি বাংলার সমাজ ও পরিবার চেতনার পক্ষে আজও ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হয়। এরকম ঘটনা এখনো প্রায় দুঃস্বপ্নেরও অতীত। অথচ, রবীন্দ্রনাথ যেভাবে এগল্পের বিস্তার ও পরিণতি ঘটিয়েছেন, তাতে সাধারণ অর্থে গল্পকে অপরাধ বা পাপচেতনাময় বলা চলে না। বস্তুত চারু, অমল ও ভূপতিকে নিয়ে গড়া জীবনভূমিতে এইসব গতানুগতিক শব্দ কেবল নিরর্থক নয়, অব্যবহার্যও, অথচ নষ্টনীড়ের চেয়ে বেশি সমাজ-সমস্যামূলক বাস্তবময় গল্পের কল্পনাকরাও কঠিন।

রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এমন অকল্পনীয় বাস্তব গল্পের সৃষ্টিও সম্ভব হয়েছিল কেবল তাঁর অবিচল কবি প্রত্যয়েরই প্রভাবে। রবীন্দ্রনাথের কবিমন নারী পুরুষের দাম্পত্যসম্পর্কের এক নব-গীতা রচনা করেছিলেন। গল্পগুচ্ছে অন্যত্র তিনি লিখেছে - "বিবাহটা চিরজীবনের পালাগান ; তার ধূয়ো একটামাত্র, কিন্তু সংগীতের বিস্তার প্রতি দিনের নব নব পর্যায়ে।" একথা নারী পুরুষ উভয়ের পক্ষে সমান সত্য। অভ্যাস আর অন্ধ আচরণের স্তর থেকে মুক্ত করে দাম্পত্যের মধ্যেও প্রেমকে চিরস্বাদু করে রাখতে গেলে, প্রতিদিনের ভরা মন দিয়ে নিত্য নূতন করে স্ত্রীকে আবিষ্কার করতে হয় স্বামীর, যে তা পারে না, তার জীবনে আচার আর প্রয়োজনে তলায় প্রাণের অপমৃত্যু ঘটে। সেখানে নির্জীব দাম্পত্যের গায়ে জড়িয়ে থাকে গতানুগতিকতার অবসাদ। যেখানে প্রাণ বেঁচে থেকেও বাঁচে না, সেখানে অন্তর্লীন অতৃপ্তিই কেবল সার হয়। কোথাও বা অশান্ত প্রাণ সমাজের দেগে দেওয়া সীমার বাইরে ভয়ঙ্কর পথে পরিক্রমা রতে বের হয় জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে। চারুর অপরাধ, ভূপতির উপেক্ষা ও অন্যমনস্ক ব্যস্ততার আখাতেও তার জীবনরসলিপ্সু নারী-প্রাণ মরে যায় নি - অবসন্নতার উর্ধ্বে আপন মুক্তির আকাশ খুঁজে ফিরেছে। এখানেই নষ্টনীড় গল্পের সামাজিক সমস্যা আর মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার শুরু।

হিন্দুশাস্ত্রের ভাষাতে স্ত্রী স্বামীর সহধর্মিনী। দাম্পত্যের প্রতিষ্ঠা সমান

টিপ্পনী

টিপ্পনী

মর্মিতার দৃঢ় ভিত্তিতে। অথচ আমাদের গতানুগতিক বিবাহ ব্যবস্থায় বালিকাবধূর সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয় পরিণত যুবকের। নষ্টনীড়ে জটিলতা তৈরি করেছিল ভূপতি ও চারুর অসমবয়স্কতা। চারুর প্রতি ভূপতির চিত্ত বিমুখ ছিল না। তাই বলে স্ত্রীর প্রতি তার আচরণকে সকৌতুক স্নেহ বা করুণার ওপরেও স্থান দেওয়া চলে না। ভূপতি চারুকে শ্রদ্ধা করে পারে নি অথচ ভালোবাসার এটাই নূন্যতম ভিত্তি বা আশ্রয়। চারুর বয়স, সাধ্য, সাহিত্য - প্রীতি সব কিছুকেই ভূপতি ছেলেমানুষি বলে করুণা বিগলিত কৌতুকে এড়িয়ে গেছে - বরং নিজেই অমল নামক আর একজন ছেলেমানুষকে জুটিয়ে এনেছে চারুর জীবন। জীবন খেলার সঙ্গী হিসাবে। অবশেষে এই খেলায় দুই সমবয়স্ক সমধর্মী নরনারী জীবনের দুরূহ জিজ্ঞাসার এক তুঙ্গশিখরে এসে পৌছেছে, যেখানে বাঙালির চিরকালের সমাজ চিন্তা এক সুবৃহৎ প্রশ্ন চিহ্নের মুখে হাঁ করে দাঁড়িয়েছে।

ভূপতির সর্বনাশের মধ্যে অমল যে অকথিত সমস্যার প্রলয় হঠাৎ আবিষ্কার করল আর অমলের অকস্মাৎ অন্তর্ধানের প্রেক্ষাপটে চারু যে আত্মআবিষ্কার করল তাকে শুধু নৈতিকতা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না। মানুষের মনবিচিত্র, জটিল, দুরবগাহ - মানুষের যুগযুগ সঞ্চিত আদর্শবাদ ও বিবেকবুদ্ধির সর্বস্ব দিয়েও তার অতলান্ততার পরিমাপ হয় না। সেই অন্তহীন জিজ্ঞাসার সম্মুখে স্তব্ধ হয়ে নম্রশিরে দাঁড়িয়ে পড়তে হয় - মানুষের জীবনের অনন্ত প্রাণকে প্রণাম করেই এই সমাপ্তিহীন রহস্যযাত্রা সাঙ্গ করতে হয়। ধাপে ধাপে সুকল্পিত বর্ণনা ও বিশ্লেষণের বিন্যসে জীবনের সেই সীমাহীন জিজ্ঞাসার প্রান্তরে বাংলা গল্পকে টেনে এনেছে নষ্টনীড়। এখান থেকেই মনোবিকলাশ্রিত আধুনিক বিজ্ঞান জীবন চিন্তার অগ্রসৃতি।

নষ্টনীড়-এ এই মনোবিকলন ও বিশ্লেষন সুচয়িত ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়ে এত বিস্তারিত এবং আমূল সম্পূর্ণ যে, এই গল্পের ছোটগল্পত্ব সম্বন্ধে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। বস্তূত বহু উৎকৃষ্ট ছোটগল্প জীবনাদর্শের সংঘাতময় পটভূমিতে জন্মলাভ করেছে - রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড় তাদের মধ্যে একটি। চোখের বালি উপন্যাস এবং নষ্টনীড় গল্পের রচনা ও প্রকাশকাল অভিন্ন। কাহিনী দুটির জীবনসমস্যার মূলগত স্বভাব ও প্রায় এক - পরিবারকেন্দ্রিক সমাজ মূল্যবোধের চিরাগত ভূমিকায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্রময়ী নবীনা নারীর আত্মবিকাশ ও প্রতিষ্ঠার সমস্যাই কাহিনী দুটির প্রাণ। এমন অবস্থায় উপন্যাসের কলাকৃতির বিচারে চোখের বালি যত পূর্ণাঙ্গ, ছোটগল্প হিসেবে নষ্টনীড় তার চেয়ে অনেক বেশি সার্থক। চোখের বালি সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ অভিযোগ - সুবিপুল গ্রন্থের অপার বিস্তৃতি ও জটিলতাকে রবীন্দ্রনাথ একমুহূর্তে হ্রস্ব ও সরল করে ফেলেছেন অকস্মাৎ। বিহারীর কণ্ঠে বিনোদিনীর স্বীকৃতির মুহূর্তে গল্প হঠাৎ এসে থেমে গেছে। উপন্যাসের ক্ষেত্রে কাহিনীর এই আকস্মিক স্তব্ধতা জীবনের আদিঅন্তে পরিপূর্ণ পরিচয় লাভের আকাঙ্খাকে আহত

করে। নরনারী জীবনমূল্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নির্দ্বন্দ্ব প্রত্যয় চরম পরিণতির মুখে গল্পের রাশ টেনে ধরেছে - উপন্যাসকে করেছে হঠাৎ সমাপ্ত।

অথচ কবি শিল্পীর অবিচল জীবন প্রত্যয়ই নষ্ঠনীড় এর ছোটগল্প রূপকে করেছে পূর্ণাঙ্গসুন্দর। ধনীর দুলাল ভূপতির অজান্তে কখন যে "বালিকা বধূ চারুলতা ধীরে ধীরে যৌবনে পদার্পন" করেছিল, যে খবর রাখবার উপায় ছিল না। অতএব - "ফলপরিণামহীন ফুলের মতো পরিপূর্ণ অনাবশ্যকতার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠাই তাহার চেষ্টাশূন্য দীর্ঘ দিনরাত্রির একমাত্র কাজ ছিল।"কিন্তু জগতে ফলকামনাই ফুলের স্বভাব ধর্ম - সেই পরম পরিণামের আকাঙ্খায় উপযুক্ত মধুপের আগমন পথে সে উন্মুখ হয়ে থাকে নিজের মর্মমূলে। চারুর জীবনে ভূপতির উপেক্ষার ভার লাঘব করতে এল দূর সম্পর্কের দেওর অমল - কিন্তু নারীর সেই মৌল আকাঙ্কার পথ বেয়ে ক্রমে সে এগিয়ে আসছিল চারুর হৃদয়ে গোপন গহনে ; দুজনের কেউই সে খবর রাখে নি। অথচ চারুর নারী চেতনার মর্মতলে অমল একছত্র হয়ে উঠেছিল - ভূপতি সেখানে কোথাও নেই। সে খবর প্রথম আবিষ্কার করল স্বয়ং ভুপতি - সর্বস্ব হারিয়ে, পেশাগত নানা সংকটে সে চারুর কাছে ফিরতে চেয়েছিল। কিন্তু সেই চরম মুহূর্তে তাকে আবিষ্কার করতে হল সেখানেও তার ভরাডুবি হয়েছে। ঘরে বাইরে জীবনের ভরাডুবির খবর নিয়ে আহত ভুপতি চারুর ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিল, ঠিক সেই সময় অমল ভূপতির চেহারা দেখে আঁতকে ওঠে। কিন্তু চারুর কাছে সে কথা পাড়তেই উপেক্ষাভাবে সে তা এড়িয়ে গেল। সেই মুহূর্তে অমল আবিষ্কার করল কি হতে চলেছে সে -

> একবার তীব্র দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চারুর মুখের দিকে চাহিল - কি বুঝিল, কী ভাবিল জানি না চকিত হইয়া পড়িল। পর্বত পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ এক সময়ে মেঘের কুয়াশা কাটিবামাত্র পথিক যেন চমকিয়া দেখিল, সে সহস্র হস্ত গভীর গহ্বরের মধ্যে পা বাড়াইতে যাইতেছিল। অমল কোন থা না বলিয়া একেবারে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

এ চমক কেবল অমলের নয়। এ যেন গল্পের স্রষ্টারও। নারীর কল্যাণমূর্তিকে একান্ত প্রত্যয়ান্বিত কবি অমল ও চারুর জীবন পরিণতিতে আরো দূরে টেনে নিতে পারেন নি - স্তব্ধ করে দিয়েছেন চারুর আত্মদর্শনের অভিভূত অসহয়তার ব্যঞ্জনার মধ্যে। গল্পের পরিসমাপ্তিতে চারুর কণ্ঠে "না থাক" - এই একটি মাত্র উক্তি নাটকীয় সংক্ষিপ্ত ও সংহতির গভীর ফলকে এক বিড়ম্বিত নারী জীবনের আমূল জটিল রূপকে ব্যঞ্জিত করে তুলেছে।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

স্ত্রীর পত্র :

'স্ত্রীর পত্র' গল্পটির সঙ্গে পলাতকা কাব্যের 'মুক্তি' কবিতাটির আন্তরিক মিল আছে। মৃণাল স্বামীকে লিখেছে -

> "আমি তোমাদের মেজোবউ। আজ পনেরো বছরের পরে এই সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে জানতে পেরেছি আমার জগৎ এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও আছে। তাই আজ সাহস করে এই চিঠি লিখছি, এ তোমাদের মেজোবউয়ে চিঠি নয়।"

এ যেন স্বামীর কাছে স্ত্রীর পত্র নয়, পুরুষের আছে নারীর পত্র। গল্পটির নাম নারীর পত্রও হতে পারত।

পনেরো বছরের পত্নী জীবনের অভিজ্ঞতায়, অনেক গ্লানি স্বীকার করে, অনেক দুঃখকষ্ট দেখে মৃণাল বুঝেছে যে, মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ পত্নীত্বে নয়, নারীত্বে। পত্নীত্ব নারীত্বের অংশ মাত্র, পূর্ণতা নয় আর পূর্ণতার সাধনাই জীবনের লক্ষ্য। মৃণালের সবল ব্যক্তিত্ব বৃথা বংশমর্যাদা ও ক্ষুদ্র পারিবারিক গন্ডী বিদীর্ণ করে নারীত্ববোধের মুক্ত আকাশে আপন ব্যক্তিত্বের শতদলটি বিকশিত করতে চেয়েছে। সন্তানহীন, স্নেহশীল, বড়পরিবারের এক বধূ মৃণাল মাতৃপিতৃহীন অনাথ লাঞ্ছিত অসুন্দরী বালিকাকে স্নেহ করে এবং তার ভক্তি ও প্রীতি পেয়ে ধন্য হয়েছিল। সংসারের নির্মম উদাসীনতার মধ্যে বিন্দুকে আশহরয় দিয়ে এবং ভালোবেসে মেজ বৌ সংসারের ক্লিষ্ট ও ক্লিন পরিধির বাইরে নিজের স্বরূপ মহিমা উপলব্ধি করল। নিজের লাঞ্ছিত জীবন থেকে মুক্তি পাবার জন্য এবং তার ভালোবাসার একামাত্র মানুষ মেজো বৌকে শান্তি দেবার জন্য বিন্দু যেদিন আত্মঘাতিনী হল সেদিন মেজ বৌয়ের শিথিল গৃহবন্ধন আপনিই খসে পড়ল -

> সেই মৃত্যুর বাঁশি এই বালিকার ভাঙা হৃদয়ের ভিতর দিয়ে আমার জীবনের যমুনাপারে যেদিন বাজল সেদিন প্রথমটা আমার বুকের মধ্যে যেন বাণ বিঁধল। বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করলুম, এ জগতের মধ্যে যা কিছু সবচেয়ে তুচ্ছ তাই সবচেয়ে কঠিন কেন? এই গলির মধ্যেকার চারিদিকে প্রাচীর তোলা নিরানন্দের অতি সামান্য বুদবুদটা এমন ভয়ঙ্কর বাধা কেন?

মৃত্যু অনন্ত, মৃত্যুকে বিন্দু কেবল আর সাধারণ ঘরের মেয়ে নয়, কেবল খুড়তুতো জায়ের বোন নয়, কেবল অপরিচিত পাগল-স্বামীর প্রবঞ্চিতা স্ত্রী নয়। মৃত্যুর অসীমতা যে মুক্তির সন্ধান দিল, তাকে সে আরও বেশি করে উপলব্ধি করল কলকাতার বাইরে পুরীর মুক্ত অনন্তআকাশের সংস্পর্শে এসে। সে স্বামীকে লিখেছে -

"তোমাদের গলিকে আর আমি ভয় করিনে আমার সম্মুখে আজ নীল সমুদ্র। আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ।"

বিদ্রোহের সুর তীব্র হয়ে আছে স্ত্রীর পত্র তে। সাতাশ নম্বর মাখন বড়াল লেনের মেজবৌ মৃণাল পনেরো বছরের দাম্পত্য জীবনের অন্ধকূপ থেকে পালিয়ে এসে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে প্রথম জানতে পেরেছে - 'আমার জগৎ এবং জগদ্বীশ্বরের সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও আছে।" মাখন বড়াল লেনের ডিমের খোলস বিদীর্ণ করে তাই মৃণালের নতুন অভিযান অনন্তের পথে, যেখানে সে জেনেছে -

"মীরাবাঈও তো আমারই মতো মেয়ে মানুষ ছিল - তার শিকলও তো কম ভারি ছিল না, তাকে তো বাঁচাবার জন্য মরতে হয় নি। ....আমিও বাঁচব। আমি বাঁচলুম।"

একটি অতি নির্মম গল্পের সঙ্গে এই বিদ্যুৎগর্ভ বাণীভঙ্গি সমগ্র গল্পটিতে এমন এক শিল্পরূপ দান করেছে যা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিভান্ডারেও খুব বেশি খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিষয়বস্তু বাস্তবের প্রতি অতি নিষ্ঠ, অথচ তা বর্ণনায় আগাগোড়া একটা কাব্যিক রীতি রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করে গিয়েছেন, ফলে গল্পে ব্যঙ্গগুলি তীক্ষ্ণ হয়ে বিদ্ধ করেছে পাঠককে।

১৩২১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যা 'সবুজপত্রে' গল্পটি প্রকাশের পরই পাঠকসমাজে এই নিয়ে প্রচুর আলোড়ন ওঠে। অনেকে এটিকে সমসাময়িক একটি ঘটনার প্রতিফলন মনে করে - কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতাকে অব্যাহতি দেবার জন্য স্নেহলতা নামে একটি বালিকা গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গল্পের সুর যে তা থেকে অনেকখানি আলাদা একথা বুঝে তখনকার রক্ষণশীল পাঠকসমাজ রবীন্দ্রনাথের নারীপ্রগতির বাড়াবাড়িকে নিন্দা করেছেন।

তবে একথা ভুললে চলবে না নারীপ্রগতি বা নারীব্যক্তিত্বের চিন্তা রবীন্দ্রনাথের মাথায় আগেও ছিল, তখনও ছিল, পরেও মুছে যায় নি। বহু আগে চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যে চিত্রাঙ্গদা নহি দেবী, নহি সামান্যা নারী।/ পূজা করি মোরে রাখিবে উর্ধ্বে সে নহি নহি ? হেলা করি মোরে রাখিব পিছে সে নহি সে নহি /। স্ত্রীর পত্র গল্পের সঙ্গে মুক্তি কবিতার মিলের কথা আগেই বলা হয়েছে। কবিতার নায়িকা অবশ্য পনেরো নয়, সংসারে নিষ্পেষিত হয়েছিল বাইশ বছর।

রাধার পরে খাওয়া, আবার খাওয়ার পরে রাধা

বাইশ বছর এক চাকাতেই বাঁধা।

বহুদিন পরে' মহুয়া' কাব্যগ্রন্থে সবলা কবিতায় কবির প্রায় একই বাণী শোনা

টিপ্পনী

যায় -

নারীকে আপনভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা ?
পথপ্রান্তে কেন রব জাগি
ক্লান্তধৈর্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি
দৈবাগত দিনে।

স্ত্রীরপত্র অভিনব আঙ্গিকে লেখা, চিঠির বয়ানে। এক রক্ষণশীল পরিবারের মেজ বৌ মৃণাল সাতাশ নম্বর মাখন বড়াল লেনের গলি থেকে মুক্তি পেয়ে আদিগন্ত নীল সমুদ্রের সামনে বসে এই চিঠি লিখেছে স্বামীকে। রবীন্দ্রনাথ এই রীতির সুবিধা ও অসুবিধা সম্বন্ধে আগাগোড়া সতর্ক ছিলেন। ফলে মৃণালের জানা সম্ভব নয়, এমন কোনো ঘটনা যেমন এই চিঠিতে স্থান পায়নি, অন্যদিকে লেখার ভাষাও আদ্যন্ত হয়ে উঠেছে একটি কল্পনাপ্রবণ ও কবিস্বভাবের মেয়ের ভাষা। এ প্রশ্ন হয়তো উঠতে পারে কোনো মধ্যবিত্ত পরিবারের বধূর পক্ষে এই রকম একটি সাহিত্যিক পত্র রচনা করা সম্ভব কিনা। কুশলী ও সচেতন শিল্পী গল্পের মধ্যে তার উত্তর দিয়ে রেখেছেন -

> "আমি লুকিয়ে কবিতা লিখতুম। সে ছাইপাশ যাই হোক না, সেখানে তোমাদের অন্দরমহলে পাঁচিল ওঠেনি। সেইখানে আমার মুক্তি ; সেইখানে আমি আমি ..... আমি যে করি, সে এই পনেরো বছরেও তোমাদের কাছে ধরা পড়ে নি।"

স্ত্রীর পত্রে গল্পের ভাষাই আসলে এর এক বিরাট সম্পদ। 'পঞ্চভূত' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাধ স্রোতস্বিনীর মুখ দিয়ে যা বলিয়েছেন তা নির্মম সত্য। এ গল্পের আখ্যানাংশ অতি নির্মম, মেয়েরা সংসারে যে কত অসহায়, প্রতটি ঘটনায় তা বীভৎসভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এমন অবস্থা মেয়েদের যে মৃণালের বড় জা-এর বোন বিন্দু তার খুড়তুতো ভাইয়ের অত্যাচারে এ সংসারে এসে পড়লে দিদির সেটুকুও অধিকার নেই যে তাকে আশ্রয় দেবে। বড় জা-এর প্রসঙ্গে মৃণাল বলেছে -

যখন দেখলেন স্বামীর অনিচ্ছা তখন এমনিভাবে করতে লাগলেন, যেন এ তাঁর এক বিষম বালাই, যেন একে দূর করতে পারলেই তিনি বাঁচবেন।

এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে মৃণাল। বিন্দুর গায়ে দু-একটি লাল দাগ দেখে সবাই যখন ওকে বসন্ত সন্দেহে হাসপাতালে পাঠাবার জন্য চাপ দিচ্ছে মৃণাল

টিপ্পনী

তখন নিঃসন্দেহে না হওয়ার্ন্যন্ত তাকে নিজের কাছে রেখেছে। মৃণালের বাজুবন্ধ যখন চুরি যাব সেটা যে বিন্দু চুরি করেছে এতে কারো সন্দেহ থাকে না, কারণ ও যে বিন্দু। স্বদেশী হাঙ্গামার জন্য বাড়িতে তল্লাসি হলে সকলের ধারণা হয়ে যায় বিন্দু পুলিশের পোষা মেয়ে চর।

অবশেষে এই বিন্দুরও বিয়ে হয়। কেন বিন্দুর মতো মেয়েরও বিয়ে দেবার জন বাড়ির পুরুষরা ক্লেশ স্বীকার করে মৃণাল বুঝতে পারে না প্রথমে, বোঝে পরে যখন বিন্দু পালিয়ে আসে তার কাছে - 'বিন্দুর স্বামী পাগল'। সকলে বিন্দুকে শ্বশুর বাড়িতে ফিরিয়ে দেবার জন্য অস্থির, একমাত্র মৃণালই চরম প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে ফিরিয়ে দেবার জন্য অস্থির, একমাত্র মৃণালই চরম প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছিল। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বিন্দু আবার পালায়, তবে তার খুড়তুতো ভাইয়ের বাড়ি। তারা তুমুল কান্ড করে তাকে আবার পাঠিয়ে দেয় শ্বশুরবাড়ি। মৃণাল কলেজে পড়া ভাই শরৎকে নিযুক্ত করে বিন্দুর খবর নেবার জন্য এবং শরৎকে বলে পুরীর গাড়িতে কোনরকমে বিন্দুকে তুলে দিতে। কারন মৃণাল অনেক বায়না করে পুরী যাবার অনুমতি আদায় করেছে। শরৎ যাবার দিন খবর দেয় বিন্দু কাপড়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। মৃণাল এই দুঃখে বিধ্বস্থ হয়ে পড়েছে, তবে পুরী আসা বন্ধ করেনি। কারণ এখানে এসে সে চিঠি লিখেছে যে আর সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে কখনো ফিরবো না।

স্ত্রীর পত্র গল্পের একটা ব্যাপক প্রেক্ষিত আছে - রক্ষণশীল পরিবার স্ত্রীদের দাবিয়ে রাখা, পুরুষের আধিপত্য, স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার প্রভৃতি। এতো বড়ো প্রেক্ষাপটে সংক্ষেপে উপস্থিত করা যথেষ্ট কষ্ঠসাধ্য ছিল। বস্তুত পরাধীনতার বেড়ি সংসারের সর্বত্র মেয়েদের কেমন করে আকড়ে ধরেছে অত্যন্ত সংযমের সঙ্গে দেখিয়েছেন গল্পকার। পরের অংশে প্রতিবাদ ও মুক্তির স্বরূপ ব্যাখা। সমগ্র গল্পটি এক অখন্ড সমগ্রতার স্বাদ পৌঁছে দিতে পেরেছে এবং প্রায় নির্দোষ শিল্পরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে।

ল্যাববেটরি :

১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত পার্সোনালিটি বইয়ের 'ওম্যান' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "with the growth of man's spiritual life, own worship has become the worship of love". এই 'growth of ..... siritual life' কে বলা যেতে পারে চিত্তশক্তির সম্প্রসারণ। এই চিত্তশক্তির সম্পদ শুধু পুরুষের নয়, নারীরও বটে, নারী আর পুরুষ মিলিয়ে যে সামগ্রিক মানুষ, তারই ধর্মকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন মানুষের ধর্ম। অথচ ঠিক এর উলটো কথাই বহুযুগ ধরে আপ্তবাক্যের মর্যাদা

টিপ্পনী

টিপ্পনী

পেয়েছে : চিত্তশক্তির সম্পদ পুরুষের আর নারী প্রাণশক্তির প্রতিমা। কিন্তু পুরুষের সঙ্গে চিত্তশক্তির আর নারীর সঙ্গে প্রাণশক্তির এই সমীকরণটি রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই চূড়ান্তভাবে স্বীকার করেন নি। মানব সত্তার ভিন্ন উপকরণে চরিত্রায়িত করে যকন তেরি হল পাঞ্চভৌতিক সভা তখন নারীচরিত্র দীপ্তির মধ্যেই শানিত হয়ে উঠল চিন্তাশক্তির প্রাখর্য। সবুজপত্র পর্ব থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত নারিচরিত্রে চিত্রশক্তির এই প্রাখর্যই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে । নারীপুরুষের সম্পর্কের নবরূপায়ন রবীন্দ্রনাথের পরিণত জীবনের সাহিত্যেই সুস্পষ্ট হয়েছে । কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যৌবনে রচিত আট্যকাব্য চিত্রাঙ্গদায় যেন এর পূর্বাভাস পাওয়া যায়। মদন আর বসন্তের দেওয়া রূপযৌবনের ফাঁদ পেতে চিত্রাঙ্গদা অর্জুনের ব্রম্ভচর্যব্রত ভঙ্গ করেছিলেন। কিন্তু প্রাণশক্তি আর চিত্তশক্তির দ্বন্দ্বে চিত্রাঙ্গদার অন্তর্লোকে শেষ পর্যন্ত চিত্তশক্তিই জয়ী হয়েছে। দৈবী মায়ার আবরণ উন্মোচণ করে স্বরূপে আত্মস্থ চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে বলেন - যদি পার্শ্বে রাখ / মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার / যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর / কঠিন ব্রতের তব সহা হইতে, / যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,/ আমার পাইবে তবে পরিচয় ।" পুরুষের 'কঠিন ব্রতের সহায়' হওয়ার জন্য নারীর বলিষ্ঠ এই আত্মঘোষনার মধ্যেই চিত্রাঙ্গদা সোহিনীর পূর্বভূমিকা রচনা করেছে। সোহিনী আর লীলা - মা আর মেয়ের মধ্যে যেন দ্বিখন্ডিত হবে আছে চিত্রাঙ্গদার দ্বৈতসত্তা । নীলা রেবতীর তপোভঙ্গ করেছে, আর নন্দকিশোর বিজ্ঞানতপসভার সাধনক্ষেত্র ল্যাবরেটরিকে অনিবার্য ধ্বংস থেকে রক্ষা করেছে নন্দকিশোরের অনুব্রতা সোহিনী।

সবুজপত্রপর্ব থেকেই গল্পগুচ্ছের গল্পে জীবনের বস্তুসত্যের চেয়ে ভাবসত্য প্রায় সর্বত্র বেশি গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। তিনসঙ্গীর তিনটি গল্পও এর ব্যাতিক্রম নয়। নরনারীর সম্পর্ক নিয়ে রবীন্দ্রনাথ শেষজীবনে যা যা ভেবেছেন কিছু ঘটনা আর চরিত্রকে বানিয়ে তুলে তারই মধ্যে দিয়ে এই ভাবনাগুলিকে এখানে গল্পরূপ দেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে Whipcrack ending কদাচিৎ লক্ষ করা যায়। 'ল্যাবরেটরি' গল্পে মর্মে মার লাগানো সেই চমকপ্রদ উপসংহার।

ল্যাবরেটরি গল্পের নীলিমা নিজের নাম বদলে করেছে নীলা। এই স্বনির্বাচিত নামগলি অনেকসময়েই চরিত্রগুলির ধাতুপ্রকৃতির শব্দসংকেত। নীলিমা আর নীলা দুইতেই নীলরঙের আভাস ; কিন্তু নীল যেমন আকাশের রঙ তেমনি বিষের রঙও বটে । শনিগ্রহের পাথর সর্বনাশা নীলা ল্যাবরেটরির ধ্বংসসাধিনী শক্তি । পুরাণে বলরামর স্ত্রীর নাম রেবতী। স্ত্রীনামে পুরুষকে ডাকার ফলে তার পৌরুষহীন দুর্বলতাই সূচিত হচ্ছে। রেবতীর নাম বিকৃত করে অধ্যাপক চৌধুরী বলেছেন, 'রেবি রবি' - রেবতীর অপরিণত শিশুমনস্কতাকে এইভাবে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন। তাছাড়া জ্যোতিষ মতে রেবতী নক্ষত্রের জাতক জিতেন্দ্রিয় হয়, রেবতীর নাম এখানে রেবতীর চরিত্রকে

নিয়ে মস্করা জুড়েছে। কিন্তু তিনসঙ্গীর সবচেয়ে আশ্চর্যসুন্দর নাম সোহিনী। সংস্কৃত 'শোভিনী' হিন্দিতে 'সোহিনী। সোহিনী পশ্চিমভারতের মেয়ে। 'সোহিনী' নামের অন্য অর্থ 'মনোমোহিনী', 'মনোহারিণী'। অধ্যাপক চৌধুরী সোহিনীকে বলেছেন, -

> "তোমার ঐ সোহিনী নামটির সঙ্গে আর একটি শব্দের মিল আছে, বড়ো ঘাঁটি তার অর্থ।"

মিলওয়ালা সেই শব্দটি - বলাই বাহুল্য - মোহিনী, মোহিনী মূর্তিতে পুরুষের মনোহরণ করতে তার সংস্কারের কোন বাধা নেই। 'সোহিনী' আবার অর্ধান্তরে 'সোহাগিনী'ও বটে। কায়িক সতীত্বে নয়, স্বামীর অনুব্রতা বলেই সোহিনী স্বামীসোহাগিনী। কিন্তু এতো বাহ্য। 'সোহোনী' একটি রাগের নাম। নামকরণের সময় এই রাগ - কল্পনাটি যে রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় ছিল তার পরোক্ষ একটি প্রমাণ আছে। সোহিনী অধ্যাপককে বলেছে -

> "ডাকুন আমায় সোহিনী বলে, সুহি বললে আমার কানে জুড়িয়ে যাবে।"

সুহি বা সুইই - এটিও একটি রাগের নাম। রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীশাচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত 'পদ্মরত্নাবলীর সপ্তম পদটি সুইই রাগে নিবদ্ধ। সোহিনীর পূর্বজীবন নিবিড় অন্ধকারে কালিমালিপ্ত। অথচ নিশান্তের এই অন্ধকারে ভেদ করে উৎসারিত হয়ছে উষ্ঠার শুচিস্মিত দীপ্তি।

সোহিনী নন্দকিশোরের অনুব্রতা। অর্থাৎ নন্দকিশোরের ব্রতই সোহিনীর ব্রত। নন্দকিশোরের ব্রত ছিল বিজ্ঞানসাধনা। জীবনব্যাপী এই অনন্যনিষ্ঠ সাধনারই প্রতীক ল্যাবরেটরি। সেই সাধনার কাছে নিজের প্রাণও তুচ্ছ। তাই দুঃসাহসিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার অপঘাতে' এই ল্যাবরেটরিতেই নন্দকিশোরের মৃত্যু। নন্দকিশোর বলতেন -

> "মানুষ প্রাণপণে প্রাণ বাঁচাতে চায় কিন্তু প্রাণ তো বাঁচে না। সেইজন্য বাঁচাবার শখ মেটাবার জন্য এমন কিছুকে সে খুঁজে বেড়ায় যা প্রাণের চেয়ে অনেক বেশি।

সেই 'দুর্লভ' জিনিসকে তিনি পেয়েছিলেন এই ল্যাবরেটরিতে। অর্থাৎ ল্যাবরেটরির মধ্যেই নন্দকিশোর যশঃশরীরে মৃত্যুঞ্জয়। ল্যাবরেটরিতে সোহিনীর প্রতিষ্ঠিত নন্দকিশোরের মূর্তিটি এরই প্রতীক। এই কারণে ল্যাবরেটরিই সোহিনীর 'পুজোর দেবতা', আর ল্যাবরেটরির টাকা তার 'দেবতার ভান্ডার' তিনসঙ্গীর প্রথম দুটি গল্পের নাম ব্যঞ্জনাময়। 'ল্যাবরেটরি' নামটিও এর ব্যাতিক্রম নয়।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

পাঞ্জাবের ছত্রির মেয়ে সোহিনীকে নন্দকিশোর যে দশা থেকে নিয়ে এসেছিলেন 'সেটা খুব নির্মল নয় এবং নিভৃত নয়'। 'খুব নির্মল নয়'বলতে যা বোঝাবার ঠিক তাই বোঝচ্ছে, আর 'নিভৃত নয়' বলতে বোঝাচ্ছে যে, সোহিনী শুধু পতিতাই ছিল না বহু পরিচর্যাকারিণীও ছিল। উপরন্তু 'খুব নির্মল নয়' আর 'নিভৃত নয়' এর মাঝখানে ওই 'এবং' টি সোহিনীর নির্মলতার অভাবকে এহো বাহ্য করে তার নিভৃতির অভাবকেই আরো নগ্ন করে তুলেছে কিন্তু স্ত্রীরত্নং 'দুষ্কুলাদপি'। সোহিনীর সঙ্গে প্রথম আলাপেই নন্দকিশোরের মনের কষ্ঠিপাথরের 'একটা দামী ধাতুর' দাগ পড়েছিল । তিনি দেখতে পেয়েছিলেন মেয়েটির ভিতরে ঝক্‌ঝক্‌ করছে ক্যারেকটরের তেজ ।' পরে অধ্যাপকও সোহিনীকে বলেছেন 'ছদ্মবেশী সোনার ঢেলা।' সোহিনীর আইমার কাছ থেকে নন্দকিশোর তাকে কিনে নিয়েছিলেন সাত হাজার টাকায়। নিজের ব্রতে দীক্ষা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "ওকে নন্দকিশোরি করতে হবে, সেটা যে-সে মেয়ের কাজ নয়।" শাস্ত্রীয় মতে বিবাহ হয়নি বলেই সোহিনীকে বলা হয়েছে নন্দকিশোরের 'সঙ্গিনী'। কিন্তু পতির অনুব্রতা ; এই নতুন অর্থেই সোহিনী পতিব্রতা। 'পতিব্রতা স্ত্রী চাও যদি, আগে ব্রতের মিল করাও " - নন্দকিশোরের এই কথাটাকেই বলা যেতে পারে 'ল্যাবরেটরি' গল্পের মর্মকথা।

এ গল্পে রবীন্দ্রনাথ যে কতদূর এগিয়ে গিয়েছেন সেকথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। বস্তুত যৌনতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রচন্ড দুঃসাহস যেন 'ল্যাবরেটরি' গল্পের প্রায় প্রত্যেক পংক্তিতেই মূর্ত হয়ে উঠেছে । নীলার সঙ্গে তার বিদূষী গৃহশিক্ষয়িত্রির সম্পর্কের মধ্যে নারীর সমকামিতার একটা ইশারা লুকিয়ে রয়েছে - 'নীলার যৌবনের আঁচ লাগাত তাও মনে, তুলত তাকে তাতিয়ে অনির্দেশ্য কামনার তপ্তবাষ্পে।'

রেবতির মুখের বেড়াটা ছিল মেয়েলি ধাঁচের মোলায়েম - তার মুখের এই 'দুর্বল মাধুর্য' পুরুষ বালকদের মনে মোহ আনতে পারত'। ছেলেবেলাকার বন্ধুদের ওর উপরে ছিল 'কান্নাকাটি - জড়ানো সেন্টিমেন্টাল ভালোবাসা'। রেবতী নিজে উভকামী কিনা বলা শক্ত, কিন্তু অন্তত বয়ঃসন্ধির সময়ে সে যে পুরুষ সমকামীদের আকৃষ্ট করত - সেকথা রবীন্দ্রনাথ বেশ খোলাখুলিভাবেই জানিয়ে দিয়েছেন। 'শেষ কথা'য় অচিরা বলেছিল, 'দীর্ঘকালের প্রয়াসে মানুষ চিত্তশক্তিতে নিজের আদর্শকে গড়ে তোলে প্রাণশক্তি অন্ধতা তাকে ভাঙে।" কিন্তু 'ল্যাবরেটরি' গল্পে সোহিনী চরিত্রে ইচ্ছাশক্তি আর প্রাণশক্তির এই গড়ে তোলা আর ভেঙে ফেলার পরস্পর বিরুদ্ধ সম্পর্ক আশ্চর্য এক অনায়াস সহাবস্থানে নবরূপ পেবেছে। চিত্তধর্মে সোহিনী সেখানে নন্দকিশোরের অনুব্রতা, সেখানে তার নিষ্ঠা অবিচলিত, কিন্তু প্রাণধর্মে যে স্বচ্ছন্দ-স্বৈরিনী। সে শাস্ত্র মিলিয়ে পতিব্রতাগিরি' করতে বসেনি। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর যে যে অব্যভিচারী নিষ্ঠার ভিত্তিতে সামাজিক সতীত্বের সুপ্রাচীন সংস্কার গড়ে উঠেছে সোহিনী তার ভিত্তিমূলে আগাত করেছে। অলজ্জ অসংকোচে সোহিনী বলেছে -

"আজন্ম তপস্বিনী নই আমারা । ভড়ং করতে করতে প্রাণ বেরিয়ে গেল মেয়েদের। দ্রৌপদীকুন্ডীদের সেজে বসতে হয় সীতা-সাবিত্রী।"

সজ্জিত এই কৃত্রিমতা থেকে সোহিনী সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। নন্দকিশোর যে তা জানতেন, নীলার জন্মবৃত্তান্ত খোলসা করে রেজিস্ট্রি করে যাওয়া তাঁর দলিলই তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ। নন্দকিশোর সম্পর্কে সোহিনী বলেছে -

টিপ্পনী

"যেখানে আমি ছিলাম ছোটো সেখানে আমি তাঁর চোখে পড়িনি, যেখানে আমি ছিলুম বড়ো সেখানে তিনি আমাকে পুরো সম্মান দিয়েছেন।"

অর্থাৎ জীবনসত্তার স্বভাবধর্মের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই সোহিনীর সঙ্গে নন্দকিশোরের ব্রতের মিল সুম্পন্ন হয়েছে।

কিন্তু নিজের প্রাণধর্মের এই অনিয়ন্ত্রিত বহুচারিতাকেও সোহিনী শেষ পর্যন্ত জয় করেছে । সোহিনীর জীবনে নন্দকিশোরের মৃত্যুরই এই দান । সোহিনী অধ্যাপককে বলেছে -

" তিনি যাবার পথে তাঁর চিতার আগুনে আমার আসক্তিতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন, জমা পাপ একে একে জ্বলে যাচ্ছে । এই ল্যাবরেটরিতেই জ্বলছে সেই হোমের আগুন।"

হোমহুতাসনে সোহিনীর নবজন্ম হয়েছে বলেই শুধু ল্যাবরেটরির স্বার্থে 'নারীর মোহজাল বিস্তার' করতে সোহিনীর কোন সংকোচ নেই । নন্দকিশোরের মৃত্যুর পর ল্যাবরেটরির স্বত্ব নিয়ে মামলার বিপক্ষে পক্ষের আর্টিকেল্ড্ ক্লার্কের সঙ্গে সোহিনীর আচরণই এর একটা নিদর্শন । সোহিনী নিজেই বলেছে - "যে করে জিতেছে সেটা বলবার নয়।" মকদ্দমায় জিতে সোহিনী তো সরে পড়ল, সে লোকটা গলায় দড়ি দিয়ে মরতে যায় আর কি ? অধ্যাপককেও যে সোহিনী বশ করবার উদ্যেগ করেছে তারও মূলে রয়েছে অধ্যাপকের মারফত তাঁর বিজ্ঞানী ছাত্র রেবতী ভট্টাচার্যকে ল্যাবরেটরির জন্য পাওয়ার অভিপ্রায়। এমন কি, জাগানী ক্লাবের গ্রাম থেকে ল্যাবরেটরিকে মুক্ত করবার জন্য সোহিনী সকলের সামনে নীলার জন্মবৃত্তান্ত উদ্‌ঘাটন করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি। এখনেই নীলার সঙ্গে সোহিনীর স্বরূপগত পার্থক্য । 'ভাঙন ধরানো' মেয়ে নীলা ল্যাবরেটরিকে ধ্বংস করবার জন্যই তার উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবকে কাজে লাগায় ; তার সঙ্গে যে কালান্তর, পিঙ্গলকেশা নীলার অকালবৈধব্যের মধ্যেও হয়তো তারই ইঙ্গিত। পক্ষান্তরে ল্যাবরেটরিকে রক্ষা করার বৃত্তিই সোহিনীর মজ্জাগত। মোটরের তলায় পড়ে পা ভাঙা, রোয়া-ওঠা, হাড় বের

টিপ্পনী

করা একটা কুকুর যখন সোহিনীর সেবাযত্নে মরতে মরতে সেরে ওঠে কিংবা বায়োলজির ল্যাবরেটরির কানা - খোঁড়া কুকুর - খরগোশগুলোর জন্য যখন সোহিনী একটা হাসপাতাল বানাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে তখন বোঝা যায় যে, রক্ষা করবার মনোবৃত্তিই সোহিনীর স্বাভাবিক বৃত্তি । এইখানেই নন্দকিশোর আর সোহিনীর জীবনদর্শে আশ্চর্য সাদৃশ্য । নন্দকিশোর ল্যবরেটরির গড়ার জন্যই 'নিষ্কাম লোভে' রেলওয়ে কোম্পানীর টাকা চুরি করেছিলেন ; সোহিনীরও ল্যাবরেটরি রক্ষার জন্যই নিজের নারীত্বকে অনাসক্তভাবে ব্যবহার করেছে । দুটি ক্ষেত্রেই "End justified the means"

ল্যাবটরি গল্প রচনাকালে রবীন্দ্রাথের বয়স উনআশি অতিক্রম করেছে । রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন -

> শরীর রীতিমত ভাঙিয়া পড়িয়াছে এবং দ্রুত ভাঙিতেছে। দৃষ্টিশক্তি এখন অতি ক্ষীণ, শ্রবণশক্তি ততোধিক দুর্বল ; হাঁটিতে চলিতে অসম্ভব কষ্ঠ হয় । ..... শরীরের এই অবস্থাতে লিখিতে খুবই কষ্ঠ হয় - কিন্তু না লিখিয়াও পারে না।"

পুনশ্চ রবীন্দ্রজীবনীকার লিখেছেন -

> "ইতিমধ্যে আনন্দবাজার পত্রিকার পূজাসংখ্যার জন্য নূতন গল্পের তাগিদ আসিয়াছে, টাকাও অগ্রিম আসিয়া গিয়াছে, লিখিতেই হইবে।"

১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ সেপ্টেম্বর অমিয় চক্রবর্ত্তীর একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

> "দায়ে পড়ে একটা গল্প লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন বহুকষ্টে লিখে নিষ্কৃতি নিয়েছি । আনন্দবাজার পূজার সংখ্যায় যাবে - কি রকম হয়েছে কী জানি লিখতে আর প্রবৃত্তি নেই।"

'ল্যাবরেটরি গল্পের ভাষায় ও নির্মাণশিল্পে কোথাও কোথাও বার্ধক্যের দৌর্বল্য ও অবসাদজনিত ভূলভ্রান্তি লক্ষ না করে পারা যায় না।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
200

প্রথম পরিচ্ছেদে সোহিনীর সঙ্গে নন্দকিশোরের প্রথম সাক্ষাতের পরবর্তী অংশে নন্দকিশোরে সম্পর্কিত ক্রিয়াপদের সংগতি অনেক ক্ষেত্রে বিঘ্নিত হয়েছে । বললে ও বললেন, বলত ও বলতেন, গেল, পেলেন ও লাগল পাশাপাশি প্রযুক্ত হয়েছে। অধ্যাপকের প্রতি সোহিনীর সংলাপে মধ্যম পুরুষ সর্বনাম পদ ও ক্রিয়াপদে সর্বত্র সম্মানসূচকতা রক্ষিত হয়েছে । ব্যাতিক্রম নবম পরিচ্ছেদে রেবতি - প্রসঙ্গে

অধ্যাপকের উদ্দেশ্যে সোহিনীর উক্তি "... তুমি যাকে মেট্রিয়ার্কি বল সে রাজ্যের ও ঘোর অনাড়ি।" এখানে তুমি ও বল স্পষ্টতই ভুল। রেবতীকে অধ্যাপক বলেছেন - "খুকুর মতো বসে বসে দুধ খাচ্ছিস ঢকে ঢকে -ইডিয়মের ত্রুটি। একবার বলা হয়েছে, 'হাইয়র স্টাড়ি মুভমেন্ট, একবার 'হাইহর স্টাডি সার্কল।' পঞ্চম ষষ্ঠ ও সপ্তম পরিচ্ছেদে ঘটনা ঘটেছে পরপর তিনদিন। পঞ্চম পরিচ্ছেদে রেবতী সোহিনীকে পরের দিন সকালে ল্যাবরেটরিতে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। অর্থাৎ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদেই ল্যাবরেটরিতে রেবতির প্রথম আগমন প্রত্যাশিত। কিন্তু আসলে তা ঘটেছে দুদিন পরে সপ্তম পরিচ্ছেদে। বলা বাহুল্য, এটি সময় বিন্যাসের ত্রুটি।

টিপ্পনী

তাছাড়া ছোটগল্পে প্রত্যাশিত দৃঢ়পিনদ্ধতাও যেন এই গল্পের সর্বত্র বজায় থাকে নি। যেমন, তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদের আদ্যন্ত পরপর দুদিন ধরে সোহিনী ও অধ্যাপকের উক্তি প্রত্যুক্তি। এই কথাবার্তা সহজেই একটি দিনে একটি পরিচ্ছেদে সংহত হতে পারত। বস্তুত সংলাপমুখ্য এই গল্পের সিংহভাগ জুড়ে থাকা অধ্যাপক ও সোহিনীর কথোপকথনের চিত্তাকর্ষক বাক্‌শিল্প অনেক সময়ই যে বাক্ প্রগলভতায় পর্যবসিত হয়েছে, একথা মনে না হয়ে পারে না।

গল্পের প্রথম দুটি পরিচ্ছেদে নন্দকিশোর, সোহিনী ও নীলার পূর্বকথা। প্রথম পরিচ্ছেদে বিবৃতি আর সংলাপ সমমর্যাদা পেয়েছে। সমস্ত গল্পে একমাত্র দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটিই প্রায় বিবৃতসর্বস্ব। তৃতীয় পরিচ্ছেদ থেকে মূল গল্প শুরু। - এইমূল গল্পটি সংলাপে গ্রথিত, গঠনে নাট্যধর্মী। এই নাট্যধর্মের একটি লক্ষণ হচ্ছে, পাত্রপাত্রীর সংলাপের মাঝখানে জনান্তিকে গল্পকারের নেপথ্যভাষ্য। এই নেপথ্যভাষ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অম্লরসাক্ত। ফলে বক্রোক্তির সঙ্গে ব্যঙ্গের ঘনিষ্ঠ সহাবস্থানে গল্পের গতি তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে। যেমন, নীলার সৌন্দর্য্যের প্রতি রেবতীকে উৎসুক করে তোলার জন্য সোহিনীর পূর্বপরিকল্পিত কৌশলের প্রথম ধাপে সোহিনী রেবতীকে বলেছে যে, নন্দকিশোরের -

> "একটা অন্ধবিশ্বাস ছিল, ফলে ফুলে প্রকৃতির মধ্যে যা কিছু আছে সুন্দর, মেয়েরা বিশেষ অবস্থায় তার দিকে একান্ত করে যদি মন রাখে তাহলে সন্তানরা সুন্দর হয়ে জন্মাবেই।"

পরমুহূর্তে গল্পকারের টিপ্পনী : "বলাবাহুল্য এটা নন্দকিশোরের মত নয়।" নীলার হাতর ডালিতে সাজানো খাদ্যদ্রব্য নিয়ে রেবতীকে অভ্যর্থনা করে সোহিনী বলেছে -

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
201

> "এ সমস্তই তৈরি নীলার নিজের হাতে।" সঙ্গে সঙ্গে গল্পকার আলতো করে জানিয়ে দেন, - "ফরমাশে তৈরি বড়বাজারের এক চেনা দোকানে।" তৃতীয় থেকে দশম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত সংলাপের

টিপ্পনী

মালা গেঁথেই গল্প এগিয়েছে। এই আটটি পরিচ্ছেদের মধ্যে তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ ও নবম মোট চারটি পরিচ্ছেদ সমগ্রভাবে এবং অষ্টম পরিচ্ছেদের আংশিকভাবে সোহিনী আর অধ্যাপকের সংলাপ। সপ্তম পরিচ্ছেদে সোহিনী আর অধ্যাপকের দ্বিরালাপে রেবতী ও অংশগ্রহণ করেছে। পঞ্চম পরিচ্ছেদে আলাপ চলেছে সোহিনীর সঙ্গে রেবতীর - এখানে নীলা উপস্থিত থাকলেও সম্পূর্ণ নীরব। এরপর নীলাকে সোহিনীর সঙ্গে প্রথম কথা বলতে শোনা গেল অষ্টম পরিচ্ছেদের দ্বিতীয়ার্ধে। দশম পরিচ্ছেদে সোহিনীর বিদায় - সে যাবে আম্বালায়। দুই মুখ্য চরিত্রের বিদায়গ্রহণের হেতুর মধ্যেও স্থূল একটি সাদৃশ্য সহজেই লক্ষগোচর হয়। অধ্যাপকের সতীর্থের মৃত্যু এবং সোহিনীর আইমার মৃত্যুসম্ভাবনা। স্পষ্টতই নীলাকে নির্বাধ স্বেচ্ছাচারের অবসর করে দেওয়ার জন্যই রবীন্দ্রনাথ এখানে গল্পকে বানিয়ে তুলেছেন। সারস্বত প্রতীতি তৈরি হয়নি বলেই এই অংশটি 'ল্যাবরেটরি' গল্পের দুর্বলতম গ্রন্থি। সোহিনী চলে গিয়েছে দশম পরিচ্ছেদে , ফিরে এসেছে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে দ্বিতীয়ার্ধে। সোহিনীর বিদায়গ্রহণের প্রাক্কালে গল্পকথক বলেছেন, "বিধাতা তাঁর গল্প ধীরে ধীরে পড়েন, গল্প ভাঙেন এক ঘায়ে।" সৌহিনী চলে যাওয়ার পরেও গল্পকথক বলেছেন, 'পরিনামটা দ্রুতবেগে ঘনিয়ে আসতে লাগল।' ল্যাবরেটরির উপসংহারে গল্পবিধাতার সেই দ্রুতবেগে এক ঘায়ে ভাঙার শিল্পকৌশলটি চমকপ্রদ হলেও সোহিনীর অনুপস্থিতিতে সম্পূর্ণ একাদশ আর দ্বাদশ পরিচ্ছেদ আর ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের প্রথমার্ধে গল্পের গতি বিলম্বিত ও অনাবশ্যক পৃথুল। নীলা এই গল্পে সোহিনীর প্রতিমুখ শক্তি হলেও তার কান্ডকারখানার বিস্তারিত উপস্থাপনে যদি তাকে সোহিনীর সমান গুরুত্ব দেওয়া হয় তবে ছোটগল্পের একৈকমুখিতা বিচলিত হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

কিন্তু এইসব ত্রুটিবিচ্যুতি বাদ দিলে 'ল্যাবরেটরি' প্রতীকের শিল্পরূপে অনবদ্য। সমস্ত মানবমনই আসল একটি ল্যাবরেটরি। অধ্যাপকের উক্তিতে এই প্রতিকটির আবরণ উন্মোইত হয় যখন তিনি বলেন - "ল্যাবরেটরি ভিতরেই আছে, ম্যাগনেজিয়ম নিয়ে কাজ চলছেই ....।" এই ম্যাগনেটিজম বা চৌম্বকবিদ্যা হচ্ছে নারীপুরুষের পারস্পারিক যৌন আকর্ষণে প্রতীক। জড়বিশ্বে নিয়তই চলেছে এই টানাটানির খেলা। সোহিনী বলেছে - 'গ্রহগুলো টান মেনে চলে আবার টান এড়িয়ে চলে এটা একটা শিখে নেবার তত্ত্ব বই কি।"

মানসবিশ্বে নারীর প্রতি টান মেনে চলার পাশাপাশি টান এড়িয়ে চলার তত্ত্ব যে - পুরুষের অধিগত তারই মধ্যে আছে 'পৌরুষে ম্যাগনেটিজম'- নারীর চৌম্বক শক্তির আকর্ষন সে নিরুপায় আত্মসমর্পন করে না, বরং নিজস্ব চৌম্বকশক্তির প্রতিমুখী টানের ফলে তৈরি হওয়া ভারসাম্যে সে আত্মরক্ষায় সমর্থ হয় । কিন্তু অধ্যাপক মনোবিজ্ঞানের সাক্ষ্য উদ্ধার করে বলেছেন, "বাংলাদেশের মেট্রিয়ার্কি বাইরে নেই, আছে নাড়িতে" - রেবতী সেই মেট্রিয়ার্কি নিয়ন্ত্রিত বাঙালি পুরুষের প্রতিনিধি, পিসিমার হাতে তার পৌরুষ ছাতু হয়ে গিয়েছে বলেই অধ্যাপকের ভাষায় রেবতী "এক মালাজপকারিনীর হাতে মালার গুটি"। বোটানিকালে সোহিনী যে শুধুই নীলার সুসজ্জিত রূপযৌবনের প্রলোভনে রেবতীকে আকৃষ্ট করতে চেয়েছে তা নয় - এ হল অর্ধসত্য। আসলে রেবতীর তপোভঙ্গ - চেষ্টার মধ্যে দিয়েই সোহিনী রেবতীর অবিচলিত তপঃশক্তির যাচাই করে নিয়েছে। অর্থাৎ টান মেনে চলে টান এড়িয়ে চলের ক্ষমতারই এই পরীক্ষা। 'ল্যাবরেটরি'র বোটানিকাল গর্ডেন যেন 'শেষ কথা'র আরনণ্যক প্রাণশক্তিরই ক্ষুদ্র একটি সংস্করণ । আরো পরে, দ্বাদশ পরিচ্ছেদে জাগানীসভা শেষ হবার পর নীলা যখন রেবতী 'শিরার মধ্যে' ঢেলে দিল 'জ্বালাময় মদ তখনও পটভূমিকায় 'লতাবিতানের মধ্যে সবুজ প্রদোষের অন্ধকার।' এমনকি রেকবতী প্রথমদিন ল্যাবরেটরিতে উপস্থিত হয়েই ভেবেছে যে, সেদিনও বুঝি নীলার সান্নিধ্যে 'সেই বোটানিকালের পুনরাবৃত্তি' হবে। রেবতীকে পরীক্ষা করে সোহিনী বুঝেছে যে,'হাতে হাতে ফল পাবার আশা আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকবে না' অর্থাৎ নীলার আকর্ষনে রেবতী অনায়াসে ধরা দেবে বটে , কিন্তু সেই আকর্ষনকে এড়িয়ে বিজ্ঞানসাধনায় নিষ্কম্প নিষ্ঠা সে রক্ষা করতে পারবে না। সেই কারণেই সোহিনী রেবতীর সঙ্গে নীলার বিবাহের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেছে। স্থির হয়েছে ল্যাবরেটরি হবে জনগনের সম্পত্তি, আর রেবতী হবে ট্রাস্ট সম্পত্তির প্রেসিডেন্ট। কিন্তু সাবধানী এই সতর্কতা সত্ত্বেও সোহিনী শেষ পযফন্ত নীলার মৃত্যুটান থেকে রেবতীকে রক্ষা করতে পারেনি। সোহিনী চলে যাওয়ার পর ল্যাবরেটরির মধ্যেই নীলার নিশাভিসারে রেবতী সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত হয়েছে। বিজ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানীর এই প্রাভব তাৎপর্যপূর্ণ। রেবতীর জীবনে দুই ভিন্ন দিক থেকে দুটি প্রস্তাব আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে প্রস্তাবের মোহজালে আত্মসমর্পন করেছে তখনই ল্যাবরেটরির চৌম্বকবিদ্যার পরীক্ষায় তার চরম ব্যর্থতা প্রমাণিত হয়েছে। প্রথম সাক্ষাতে রেবতীর পায়ে মাথা রেখে সোহিনী প্রণাম করেছিল। ল্যাবরেটরির বিজ্ঞানব্রতী ব্রাহ্মণকেএই এই প্রণাম। এইগল্পের শেষ পরিচ্ছেদে -

> "সোফায় পা দুটো তুলে কুশলে হেলান দিয়ে নীলা, মেঝের উপরে নীলার পায়ের কাছে ঠেস দিয়ে বসে আছে রেবতী।"

সমস্ত গল্পে পুনরাবৃত্ত একটি প্রতীক হচ্ছে 'গোরু'। পিসিমা সঙ্গে রেবতীর

টিপ্পনী

টিপ্পনী

সম্পর্ক নিয়ে অধ্যাপক ঠাট্টা করে বলেছেন, "মা মা শব্দে হাম্বাধ্বনি আর কোনো দেশের পুরুষমহলে শুনেছ কি ? বলেছেন, মেট্রিয়ার্কি রক্তের মধ্যে হাম্বাধনি জাগিয়ে তোলে, হতবুদ্ধি হয়ে যায় বৎসরা," আবার নীলার 'জাদু'তে রেবতীর মুগ্ধতা লক্ষ করা 'বিদ্যাসাধনার বেড়া দেওয়া খেত' যে গোরুর চরবার খেত নয়' - সোহিনীর এই ধারণা বিচলিত হয়েছে। রেবতির পৌরুষহীনতায় আশাহত সোহিনীকে অধ্যাপক প্রশ্ন করেছেন, "তুমি কি রেবতির হাতের বদলে খুর দেখতে পেয়েছ নাকি।" গল্পের যবনিকা পতনের পূর্বমুহূর্তে সোহিনী বলেছে -

> "এইবার আমার মেয়ে আমার ল্যাবরেটরিকে বাঁচিয়েছে, আমি লোক চিনতে পারিনি; কিন্তু আমার মেয়ে ঠিক বুঝেছিল যে ল্যাবরেটরিতে গোয়ালঘর বসিয়ে দিয়েছিলুম গোবরের কুন্ডে আর একটু হলেই ডুবন্ত জিনিসটা।"

রেবতীকে উদ্দেশ্য করে অধ্যাপক নীলাকে বলেছেন -

> - 'মা, তুমি এই জীবটিকে আবিষ্কার করেছ যখন, তখন এই গোষ্ঠবিহারীর ভার তোমাকেই নিতে হবে।"

পঞ্চভূত বইটিতে ভুতনাথবাবু ওরফে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন -

আমাদের দেশে পুরুষরা গৃহপালিত, মাতৃপালিত, পত্নীচালিত । নিশ্চয়ই 'গৃহপালিত' বলেই গোরুর উপমা । আর 'পত্নীচালিত' বাঙালি পুরুষের সাহাস্য একটি রূপকল্প য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়েরী বইতে এর আগেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল -

> "অনতিদূরে একটি ছোটোবালিকা একটা প্রখরশৃঙ্গ প্রকান্ড গোরুর গলায় দড়িটি ধরে নিশ্চিন্ত মনে চরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তার থেকে আমাদের বাংলাদেশের নবদম্পতির চিত্র মনে পড়ল।"

একটি রেবতী 'একটা প্রখরশৃঙ্গ প্রকান্ড গোরুও যেন পুরোপুরি নয় - রবীন্দ্রনাথ রেবতীরপুরুষত্বকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে শেষপর্যন্ত তাকে একটি গোবৎস রূপান্তরিত করেছেন। -

> "হঠাৎ আর একটা ছায়া পড়ল দেয়ালে। পিসিমা এসে দাঁড়ালেন। বললেন, বেবি, চলে আয় সুড় সুড় করে রেবতি পিসিমার পিছন পিছন চলে গেল, একবার ফিরে ও তাকাল না।"

অপ্রত্যাশিতের আঘাতে এই উপসংহার চমকপ্রদ। তবে চমক অতিচমকে পরিণত হয়ে গল্পসমাপ্তির শিল্পকৃতিকে অকারণে ত্বরান্বিত করেছে কিনা তা ভেবে দেখার বিষয়।

ল্যাবরেটরির ঋতিক নির্বাচনে সোহিনী ভুল করেছিল । কিন্তু সর্বনাশের আগেই ভুল সংশোধিত হয়েছে এবং সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করে সোহিনী ল্যাবরেটরি রক্ষা করতে পেরেছে। ল্যাবরেটরি গল্প তেরোটি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। নীলার ড্রয়িংরুম আর নামজাদা রেস্তোরায় জাগানী ক্লাবের সান্ধ্যভোজের দৃশ্য দুটুকরো হয়ে থাকা তেরো নম্বর পরিচ্ছেদটি অনায়াসে স্বতন্ত্র দুটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত হতে পারত। কিন্তু চোদ্দ নয়, রবীন্দ্রনাথ তেরোই রেখেছেন। বিদেশের আনলাকি থারটিন নয়, এদেশের সর্বসিদ্ধা ত্রয়োদশী।

টিপ্পনী

সে :

'সে' ১৩৪৪ সনের বৈশাখ মাসে প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত । নবপর্যায় সন্দেশ পত্রিকায় ১৩৩৮ সালে আশ্বিনে, কার্তিকে এবং অগ্রহায়ণে এই গ্রন্থের প্রথম, দ্বিতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ের কোন কোন অংশের পূর্বতন পাঠ প্রকাশিত হয় । রংমশাল পত্রিকায় প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় যা মুদ্রিত হয় প্রায় তাই সে গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে সংকলিত হয়।

সে কেবল ছোটগল্পের সমষ্টি নয়, বিশেষভাবে ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য লিখিত বটে। তৎসত্ত্বে এতে বয়স্কদের উপভোগের সামগ্রী যথেষ্ট আছে, এমন কি বয়স্কদের উপভোগের সামগ্রীই বেশি । বস্তুত শিশুদের জগতের সঙ্গে বড়দের জগতের অনির্বচনীয় রাখিবন্ধন হয়ে গিয়েছিল 'সে' গল্প গ্রন্থেই। শিশুর জগৎ কোনো অবাস্তবে ঘেরা নয় - বরং তার সকল অবাস্তব অসম্ভব কল্পনার উৎস এক অতন্দ্রীয় রহস্যলোকের প্রতি অনির্বাণ কৌতূহলে। সেই অজানা দেশের মূল সন্ধানে শিশুর কৌতুকদৃষ্টি সদাকৌতূহলী । অতীন্দ্রীয় জগতের কাছে শিশুর একমাত্র চাহিদা আনন্দের রসদ - বড়রা তার থেকে দাবি করে বাস্তবিকতার সন্ধানসুত্র, দার্শনিক জ্ঞানের ইঙ্গিত। তাই শিশুর কাছে যা আনন্দ-সংকেত, বড়োদের কাছে তাই অনেক সময় সাংকেতিকতা। আনন্দ এবং উপলব্ধি, সংকেত এবং সাংকেতিকতা, সত্য এবং তত্ত্বকে আপন ব্যাক্তি প্রাণের অন্তিম অনুরাগে অপরূপ রঙে রাঙিয়ে তুলেছেন শিল্পী। তাই 'গল্পসল্প' শিশুর জন্য হয়েও এরা হাত ফস্কে বড়দের আসরে চলে যায়। আবার শিশুর গল্প 'সে' শিশুলোক থেকে ফস্কে না গিয়েও বড়র হাতে, যথার্থ বয়ঃ প্রবীন এবং জ্ঞানপ্রবীন অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'করযুগল তলে' আশ্চর্য দীপ্তি মহিমায় জল জল করতে থাকে - সেটিও সংকেতের সঙ্গে সাংকেতিকতার অকল্পনীয় পরিণয় বন্ধনে -

> নাৎসীর ফরমাণে কিছুদিন থেকে লেগেছি মানুষ গড়ার কাজে ;
> নিছক খেলার মানুষ সত্য মিথ্যের কোনো জবাবদিহি নেই। গল্প যে

টিপ্পনী

শুনেছে, তার বয়স ন বছর আর যে শোনাচ্ছে সে সত্তর পেরিয়ে গেছে। কাজটা একলা শুরু করেছিলুম। কিন্তু মালমশলা এতই হালকা ওজনের যে নির্বিচারে পুপুও (রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রতিমা দেবীর পালিত কন্যা নন্দিনী) দিল যোগ। ..... আমি আরম্ভ করে দিলুম এক যে আছে মানুষ। ...এই যে আমাদের এক যে আছে মানুষ, এর একটা নাম নিশ্চয় আছে। সে কেবল আমরা দুজনেই জানি আর কাউকে বলা বারণ। এইখানটাতেই গল্পের মজা। .... এই যে আমাদের মানুষটি - একে আমরা শুধু বলি সে। বাইরের লোক কেউ নাম জিগেস করলে আমরা দুজনে মুখ চাওয়া চাওয়ি করে হাসি।"

'সে' ছোটগল্পের সমষ্টি মনে না করলেও চলে, এর অনুচ্ছেদগুলির মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা বর্তমান। কাহিনীর ধারাবাহিকতা নয়, নায়ক নায়িকার ধারাবাহিকতা। 'সে' গ্রন্থের প্রধান নায়িকা তিনজন - আমি (গল্পকথক), তুমি (গল্পের শ্রোতা এবং পুপুদিদি), আর সে। এ তিনজন ছাড়াও আরো লোক আছে, তবে তারা গৌণ, কেবল শেষাঞ্চলের সুকুমারের কিছু গৌরব আছে।

সে গ্রন্থটি কিম্ভূত রসাশ্রিত একটি কাহিনীর ধারা। 'সে' মানুষটি মিকম্ভূত রসাশ্রিত একটি ব্যাক্তি। তার চরিত্রের কিম্ভূতরসের সম্ভাবনাকে অবলম্বন করে গল্পগুলি গঠিত বলেই সেগুলি বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে।

কবি বলেছেন যে, এতদিন রাজপুত্র, কোটালপুত্র, সদাগরপুত্রকে আশ্রয় করে গল্প জমে উঠেছে, এবারে সেই সর্বমানবের যুগে একটি অতিশয় সাধারণ মানুষকে অবলম্বন করে রূপকথা লিখতে বাধা কি ? তার একমাত্র পরিচয় সে মানুষের পুত্র তার অধিক আর কিছু নয়, তার অধিক আর কী-ই বা হতে পারে ?

সে গ্রন্থটি বুঝবার জন্য রবীন্দ্রনাথের ছবি ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বিশ্বপরিচয় মনের মধ্যে জাগ্রত রাখা প্রয়োজন। ছবির সঙ্গে 'সে'র সম্বন্ধটা স্পষ্টতর। রবীন্দ্রনাথের ছবির মতোই 'সে' কিম্ভূত রসাশ্রিত শিল্প। সাধারণত ছবি বলতে যা বুঝি তা রূপের রূপ , রবীন্দ্রনাথের ছবি অরূপের রূপ। রবীন্দ্রনাথ কাব্যে রূপ থেকে অরূপে গিয়েছেন, আর ছবির বেলায় অরূপ থেকে রূপে নেমেছেন। এইমূল কথাটা না বুঝলে রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও চিত্র দুই-ই দুর্বোধ্য হয়ে থাকতে বাধ্য। এমন অরূপ আমাদের কাছে অস্পষ্ট, কাজেই তার ছবিও কতক অস্পষ্ট থাকতে বাধ্য। ঐ অস্পষ্টতার আলো - আঁধারেই কিম্ভূতের লীলাভূমি। সেই লীলাভুমি থেকে কবি ছবিগুলিকে বের করে এনেছেন, সেখান থেকেই 'সে' কে ও বের করেছেন।

বৈজ্ঞানিক সত্যকে আশ্রয় রে বালকের উপভোগ্য কাহিনী রচনার প্রচেষ্টা

এই প্রথম নয়, আগে ও আছে ; এই শেষ নয়, পরেও আছে গল্পসল্প গ্রন্থে।

অনির্বচনীয় নিয়ে বচনের খেলা, - স্রষ্টাকে নিয়ে সৃষ্টির লীলায় মেতে ওঠা এই আনন্দেই তো স্পন্দিত হয়ে আছে শিশু থেকে আবালবৃদ্ধবনিতা পর্যন্ত বিশ্বজীবনের ধারা। অন্তিম জীবনুরাগের সূত্রে গল্পের শরীরে ব্যক্তিআত্মাকে ছাড়িয়ে তার দেহলগ্ন ব্যক্তিক কলাকৌশলের আশ্চর্য সংহরণ প্রভাবে রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা ছোটগল্পের আধুনিক কলাসচেতনাও আধুনিকতম রূপ পরিগ্রহ করেছে।

টিপ্পনী

সুকুমার বালকটির মধ্যে তিন সঙ্গী গ্রন্থের অভীককুমারের পূর্বগামিনী ছায়া নিক্ষিপ্ত হয়েছে মনে হয়। দুজনেই ছিল চিত্রকর। আর অবশেষে ইঞ্জিনিয়ার হবার উদ্দেশ্যে দুজনেই বিলেত রওনা হয়ে গেছে। অভীককুমার বাল্যকালে হয়তো বা সুকুমারের মতোই ছিল।

'সে' - এমনভাবে হাজির হয়েছে তার দেহ ও ব্যাক্তিত্ব যেন অনেকটা বাস্তব হয়েও কল্পার জগতের। একাদশ অণুচ্ছেদ পর্যন্ত 'সে' একরকম চলেছে, হঠাৎ দ্বাদশ অনুচ্ছেদে এসে 'সে'র এক অভূতপূর্ব পরবর্তন হয়েছে। সুর-বেসুরের যুদ্ধকে অবলোম্বন করে বিশ্বসৃষ্টির যে ইতিহাস সে বর্ণনা করেছে, অপরূপ কবিত্বে ও ভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করেছে তা পূর্বতন সে-র পক্ষে অনেকটা অসম্ভব বলে মনে হয়।

'সে' গ্রন্থের সর্বত্রই ভাষার ভঙ্গীতে ও Fancy র লীলায় রবীন্দ্রনাথের হস্তচিহ্ন বর্তমান। তবে গ্রন্থটি অল্পবয়স্কের সম্পূর্ণ উপভোগ্য বলে মনে হয় না। তবে এর বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য এত বেশি যে ছেলে মেয়েরা তাদের মতো গ্রহণ করবে আর পরিণত মনের মানুষ তাদের মতো গ্রহণ করবে। তবু সব ফুরাবে না। মহৎ লেখকের অকিঞ্চিৎকর রচনার এটি একটি বৈশিষ্ট্য।

ধ্বংস :

'গল্পস্বল্প' গ্রন্থের অন্তর্গত রচনা 'ধ্বংস'। 'সে' এবং 'গল্পস্বল্প' এই দুটি গ্রন্থেই রচনা শিল্পের এক ভিন্নতর পরীক্ষা। 'সে' তে পুপেদিদি এবং 'গল্পস্বল্পে' কুসমি নামে নাতনিকে বলা কধার মালা যা কনো কখনো গল্পের আভাস তৈরি করে। উভয়তই গল্প বলার মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সমকালকে ছুঁয়ে যান। 'সে' রচনাগুলির সময় ১৯৩৭। 'গল্পস্বল্পের' র উৎসর্গপত্রের তারিখ ১২ মার্চ ১৯৪১। সময়টা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল। 'ধ্বংস' রচনায় সেই যুদ্ধের ভয়ংকরতা আঁকা আছে।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী
207

প্রসঙ্গত বলা যায়, 'সে' গল্পমালার প্রকাশকাল 'গল্পস্বল্প'র আট বছর আগে। 'সে'র গল্পগুলির 'পুপে আসলে রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীর পালিতা কন্যা নন্দিনী। আর 'গল্পস্বল্প'র কুসুমি হচ্ছে দৌহিত্রী মীরু দেবীর কন্যা নন্দিতা।'গল্পস্বল্পে'

তে সংযোজন সহ গল্পের সংখ্যা ১৭ টি। প্রতিটি গল্পের শেষে সেই গল্পের ভাববস্তুর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটি করে কবিতা বা ছড়া সংযুক্ত। 'ধ্বংস' রচনাটি 'গল্পস্বল্প' র ১৪ সংখ্যক রচনা।

সারাজীবন গল্পে - কবিতায় - নাটকে - প্রবন্ধে - আত্মকথায় - গানে - চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর যাবতীয় বলার কথাই বলেছেন নানাভাবে। জীবনের শেষ প্রান্তে ছড়ানো ছিতানো। আরো কিছু স্মৃতি, কিছু অনুভব, কিছু কৌতুক সংকলিত হল 'সে' এবং 'গল্পস্বল্প'তে। নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন -

> "যা কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে ইতঃস্তত পড়েছিল। তাই নিয়ে শিল্পীর খেলা চলল। কিন্তু পাথরের টুকরোর ভেতরেও এখানে-ওআনে দু-চারটি হীরে -মানিক ছিল -গল্পস্বল্পের পাতায় পাতায় তারাই ঝিকমিক করে উঠেছে।"

রবীন্দ্রনাথ মানবতাবাদী সাহিত্যিক। আজীবন ইনি থেকেছেন মানুষের পক্ষে। ভারতবর্ষ শুধু নয়, সমগ্র বিশ্বেই মানবতার উপর সেখানে নেমে এসেছে পীড়ন, সেখানেই তিনি উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সামাজ্যবাদী শক্তি ইংরেজের দমন পীড়ন রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে তিনি সত্যোচ্চারন করেছেন নির্ভীক কণ্ঠে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ - দুই ধ্বংসকামী লালসার চিত্রই দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবৎকালে। ধর্মের নামে, জাতিপ্রেমের নামে, জাতীয়তাবাদের মানবিকতার অপমান তিনি দেখেছেন বারংবার, তিনিই তীক্ষ্মদৃষ্টি সমাজতাত্ত্বিকের মতো দেখেছেন ধনবাদী সভ্যতার যান্ত্রিকতার মধ্যেই লুকিয়ে আছে লড়াইয়ের মূল, পুঁজিবাদী সভ্যতার সেই স্বার্থ সংঘাতই অনিবার্য যুদ্ধরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে - একথা তিনি সঠিকভাবেই বুঝেছিলেন। বিভিন্ন রচনার - গল্পে, উপন্যাসে, কবিতায়, গানে, নাটকে, প্রবন্ধে তবু তিনি উচ্চারণ করেছেন আশাবাদ - শক্তির দম্ভ একদিন বিচূর্ণ হবে, মানতার জয় অবশ্যম্ভাবী।

গল্পস্বল্প বস্তুত লঘু মেজাজের রচনা। নাতনী কুসমির গল্প শোনার অতীব আগ্রহকে তৃপ্ত করতে দাদামশাই বলেছেন নানা বিচিত্র বিষয় নিয়ে গল্প কথা। গল্পগুলির মধ্যে কোথাও আছে রবীন্দ্রনাথের শৈশব স্মৃতি, ও কোথাও বা বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার অতিরেক মিশ্রিত হয়েছে গল্পগুলিতে তার ফলে অনেক সময় এসেছে রূপকথার মেজাজ। 'সত্য' রবীন্দ্রনাথ যেমন এখানে স্বীকার করেছেন, তেমনি স্বীকার করেছেন 'আরো সত্যকে। আরো সত্য দেখার দৃষ্টি তার ছিল।

'গল্পস্বল্পে'র রচনাগুলিতে আছে জীবনাশ্রয়ী কিছু রূপকথা, কিন্তু শৈশবস্মৃতি কল্পনার রঙিন ঐশ্বর্য। কিন্তু মানবতার সপক্ষে যে রবীন্দ্রনাথ, তিনি কি করে বিস্মৃত হবেন সাম্প্রতিক সময়কে। মনে রাখতে হবে গল্পস্বল্পের রচনাকাল ১৯৪১। ১৯৩৯

টিপ্পনী

শুরু হয়ে গেছে দ্বিতীয় মহাসময়ের ধ্বংসযজ্ঞ । ১৯৪১ - এ সেই ধ্বংসলীলা অব্যাহত । সাম্রাজ্যবাদী পশুশক্তি মানুষের সভ্যতা সংস্কৃতির মর্মস্থলে কামড় বসিয়েছে । সর্বাপেক্ষা পাশবিক শক্তি নিয়ে জেগে উঠেছে হিটলারের জার্মানী । সোভিয়েতের সমাজতন্ত্রী মনোভাবকে সমূলে বিনষ্ঠ করতে ইংলন্ড ও ফ্রান্সের জার্মানী তোষণ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে গেছে । শেষ পর্যন্ত স্টালিনের দূরদৃষ্টি ও কূটনৈতিক বুদ্ধিতে দুই পরস্পর বিরোধী শিবির জার্মানী- সোভিয়েত চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে এবং জার্মানী আক্রমণ করেছে ফ্রান্সের উপর । শিল্প এবং সৃজনকললার মহাতীর্থ ফ্রান্স। ফ্রান্সের মর্মস্থল প্যারিস। সেই প্যারিসের পটভূমিতে দাদামশাই হাল আমলের গল্প শুনিয়েছেন কুসমিকে । রোমান্টিকতা, রূপকথাধর্মিতা, নস্টালজিয়ার মাঝখানে তাই ধ্বংস রচনাটি বিশেষ অভিনিবেশের দাবী রাখে।

প্যারিসের শহরতলিতে ছোট্ট বাসা পিয়ের শোপ্যাঁর। কন্যা ক্যামিলকে নিয়ে তাঁর শান্তীনীড়। শোপ্যাঁর ও ক্যামিল উভয়েই এক অভিনব সৃষ্টির নেশায় মশগুল। সেই সৃজন সৌন্দর্যময় । গাছের সঙ্গে গাছের জোড়, রেণু মিলিয়ে বনতুন রঙের, নতুন স্বাদের নতুন নতুন ফুল ও ফল সৃষ্টি করাই তাঁদের অপূর্ব নেশা।

এই সৃষ্টির বৈপরীত্যেই বেজেছে ধ্বংসের মহাদামামা । জার্মানী ফ্রান্স আক্রমণ করায় পিয়ের শোপ্যাঁ এবং ক্যামিলেদর ভাবী স্বামী জ্যাকের ডাক পড়েছে যুদ্ধে । যারা ছিল সৃষ্টির উপাসক তাদের বাধ্য করা হয়েছে ধ্বংস যজ্ঞের রক্তময় ভূমিতে। আরো বেদনাময় সংবাদ এই যে, পিয়ের শোপ্যাঁকে সেনানায়কের তকমা দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। তাঁকে সাজানো হয়েছে ধ্বংসযজ্ঞের প্রধানতম ঋত্বিক। আর এরই মধ্যে ঘটে গেছে এক মর্মান্তিক ঘটনা। পঁচিশ মাইলক দূর থেকে নিক্ষিপ্ত গোলায় ধ্বংস হয়ে গেছে সেই সৃজন ভূমি বানগানটি তার ওরক্ষাকর্ত্রী ক্যামিলম সমেত। আন্তর্জাতিক রাজনীতির, আধুনিক ব্রমরাস্ত্রের ভয়াবহ ও নগ্নরূপকে এঁকেই এখানে ক্ষান্ত হননি রবীন্দ্রনাথ, দেখিয়েছেন সভ্যতার এই উন্মার্গগামিতার লক্ষ্যই হল মানবিকতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সভ্যতা - শিল্প - সংস্কৃতির যা কিছু সদর্থক আলোকিত দিক, তাকে আদিম অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত নির্বাপিত করে দেওয়া। নির্লীপ্ত ভঙ্গিতে উচ্চারিত কথাগুলি আধুনিক সমরাস্ত্র - সজ্জিত সভ্যতাকেই যেন ব্যঙ্গ করেছে, দেখিয়েছে তার আদিমমূর্তি -

> "সকলের আশ্চর্য লেগেছিল সভ্যতার জোর হিসাব করে। লম্বা দৌড়ের কামানের গোলা এসে পড়েছিল পঁচিশ মাইল তফাত থেকে। একে কালের উন্নতি।"

ছোট নাতনিকে বলা গল্পে এই সমকালকে চিনিয়ে দেবার ইচ্ছাই গল্পটির বিশিষ্টতা। কল্পনার দোলায় দোল খাওয়ানো নয়, রূঢ় বাস্তবকে চিনিয়ে দেওয়াটাই

দাদামশায়ের কাছে জরুরী হয়ে পড়েছে। গল্পটা তাই আসলে গল্প নয়, মর্মান্তিক এক সংবাদ, রচনাটির সূচনাতেও সেই কথাই বলেছেন দাদামশাই - "দিদি তোমাকে একটা হালের খবর বলি," গল্পের মধ্য দিয়ে যে প্রতীকী ছবিটি আঁকা হয়েছে তার আরো একটি নিদর্শন তুলে ধরা হয়েছে চীনের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আক্রমণের সংবাদ শুনিয়ে -

টিপ্পনী

> "পিকিন শহরে ছিল আশ্চর্য এক রাজবাড়ি । তার মধ্যে ছিল বহুকালের জড়ো করা মনমাতানো শিল্পের কাজ মানুষের হাতের তেমন গুণপনা আর কখনো হব নি, হবে না। যুদ্ধে চীনের হার হল; হার হবার কথা, কেননা যারজযমের কারদানিতে সভ্যতার অদ্ভুত বাহাদুরি । কিন্তু হায় রে আশ্চর্য শিল্প, অনেক কালের গুণীদের ধ্যানের ধন, সভ্যতার অপকালের আঁচড়ে কামড়ে ছিঁড়ে মিড়ে গেল কোথায়।"

রবীন্দ্রনাথ দেখেছে যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি লোভরিপু চরিতার্থতার জন্য কেবল ধ্বংসই করে। যা কিছু সুন্দর, সৃষ্টিশীল তাকে ধ্বংসসাধন ছাড়া যুদ্ধ আর কিছুই দেয় না। তাই জীবনের অন্তিম লগ্নে দাঁড়িয়ে তিনি শিশুঘাতী নারীঘাতী যুদ্ধের বীভৎসতাকে অভিসল্লাত দিয়েছেন। গল্পস্বল্পেদর ধ্বংস রচনাটি একটিজ সংক্ষিপ্ত - প্রায় স্কেচধর্মী গল্পের মধ্যে যুদ্ধের সেই নির্মম ধ্বংসকামী রূপকেই ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

'গল্পস্বল্প'র রচনা বলে পাঠক যাতে ধ্বংস গল্পটি সম্পর্কে অমনোযোগী না হয়, সেজন্য এর সংযোজন রাখা হয়েছে একটি কবিতা। যাতে নির্মম যুদ্ধের স্বরূপ প্রকাশ করা হয়েছে -

> "আজ তিনি নবরূপী দানবের বংশে
>
> মানুষ লাগিয়েছেন মানুষের ধ্বংসে।"

সভ্যতার নামে কমানজবতাকে হত্যা করে যে জঘন্য দানববৃত্তি বিশ্বজুড়ে প্রকটিত হচ্ছে তার প্রতিবাদ। কবি প্রতিবাদের ভাষা আরো তীব্র হয়েছে এ কবিতায়। গল্পকথা সেখানে পৌঁছতে পারে না কাব্য কবিতার তির্যক ভঙ্গি সেখানে অনায়াসে পৌঁছে যায়। মানবতার কথা উচ্চারিত হয়েছে এ কবিতায়। মানবতার বোধ পাঠকের মনে জাগিয়ে তুলতেই কবি সচেতনভাবে গল্পটির সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন কবিতা।ক যুদ্ধনবিরোধী রবীন্দ্রনাথ আসলে গল্পকথার কমধ্যে যুদ্ধে বিরত থাকার আবেদন করেছেন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেদর কাছে।

সহায়ক গ্রন্থাবলী :

১। বাংলা ছোটগল্প - শিশিরকুমার দাশ

২। বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার - শ্রীভূদেব চৌধুরী

৩। গল্পগুচ্ছ - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প - প্রমথনাথ বিশি

৫। কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ - নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়

৬। গল্পমগুচ্ছ : জীবনের মেঘও রৌদ্র - মীনাক্ষী সিংহ

৭। কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ - বুদ্ধদেব বসু।

সহায়ক প্রশ্নাবলী :

১। 'বোষ্টমী' গল্পের মূলভাবটি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দাও।

২। ছোটগল্প হিসাবে 'বোষ্টমী'র সার্থকতা বিচার কর।

৩। 'নিশীথে' গল্পের নামকরণের যৌক্তিকতা বিচার কর।

৪। 'নিশীথে' কি ধরনের গল্প বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দাও।

৫। 'নষ্টনীড়' কে ছোটগল্প বলা কতদূর সঙ্গত বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দাও।

৬। নষ্টনীড় গল্পের উপসংহার কাহিনীর পক্ষে যথাযথ কিনা বিচার কর।

৭। 'ল্যাবরেটরী' গল্পের সোহিনী চরিত্রে লেখকের কোন মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে ?

৮। 'ল্যাবরেটরী' গল্পের নামকরণের সার্থকতা বিচার কর।

৯। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটির আঙ্গিকের বিশিষ্ঠতা আলোচনা কর।

১০। 'স্ত্রীর পত্র'র মৃখণালের চিঠির ভাষায় নারীমুক্তির যে ভাবনা ফুটে উঠেছে তা লেখ।

১১। 'সে' গল্পের নামকরণ কতদূর সঙ্গত বিচার কর।

১২। ' সে' গল্প কি শিশুদের জন্য লেখা গল্প - ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দাও।

১৩। ;ধ্বংস' গল্পের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যুদ্ধবিরোধী মনোভাব কিভাবে প্রকাশ পেয়েছে বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দাও।

টিপ্পনী

NOTES